বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

মুন্সিগঞ্জ

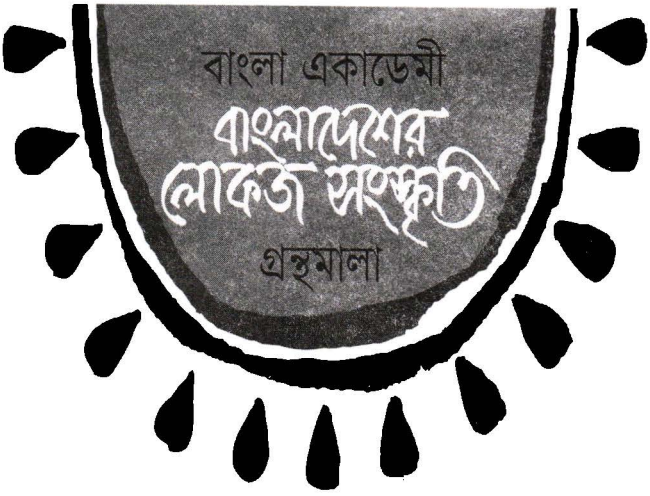

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

মুন্সিগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক

মো. আলতাফ হেসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মো. শাহজাহান মিয়া

তথ্য সংগ্রাহক

মো. সামছুল হক হাওলাদার

তৌহিদ হোসেন খান

মিথুন ব্যানার্জী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
মুন্সিগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯/ জানুয়ারি ২০১৪

বা/এ ৫১৬৩

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ শীর্ষক কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
১৭৫.০০ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : MUNSHIGONJ (Present State of Folklore in Munshigonj District). Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Executive Editor : Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore). Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : January 2014. Price Tk. : 175.00 only. US$: 8.50.

ISBN-984-07-5182-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্যে সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয় নি তা চিহ্নিত করার জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায় নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয় নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তাহলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হল এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্যে ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্যে মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও

www.pathagar.com

উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটে নি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্যে দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে

www.pathagar.com

রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥মৃত্তিকার ধরন ॥প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥নারী-পুরুষের হার ॥তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥শিল্প-কারখানা ॥ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি) জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব

www.pathagar.com

(চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালীদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিককুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহর্‌রমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুনিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

www.pathagar.com

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :
১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শ্লুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না
১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)
ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth) ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুঁথিসাহিত্য ও পুঁথিপাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)
ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk Song) ও গাথা (ballad)
ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)
ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকখাদ্য (folk food)
১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।
সপ্তম অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, খ. লোকনৃত্য।
অষ্টম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।
নবম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি।
দশম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।
একাদশ অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)
দ্বাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)
ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)
চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয় নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয় নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে মুন্সিগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মুন্সিগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই সংকলন গ্রন্থটি লোকজ সংস্কৃতানুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the District) ২৩-৪৫

ক. নামকরণ ২৩
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৫
গ. জলবায়ু ২৫
ঘ. ভূমির আকৃতি ও আয়তন ২৬
ঙ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৬
চ. জনবসতির পরিচয় ২৭
ছ. নদ-নদী ও খাল-বিল ২৭
জ. হাটবাজার ৩০
ঝ. উল্লেখযোগ্য ফসল ও রপ্তানিদ্রব্য ৩১
ঞ. উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার ৩১
ট. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৩৩
ঠ. মুক্তিযুদ্ধ ৩৯
ড. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ৪১
ঢ. বিশিষ্ট গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের পরিচয় ৪২
ণ. প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্ন সম্পদ ৪৪

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৪৬-৭৮

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা ৪৬
খ. কিংবদন্তি ৫৫
গ. লোকপুরাণ ৫৬
ঘ. লোকছড়া ৬২
ঙ. লোক কবিতা ৭৫

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৭৯-৮৩

লোকশিল্প ৭৯
বাঁশ বেত শিল্প ৭৯
মৃৎশিল্প ৮৩
পাটি শিল্প ৮৩
কাঁথা শিল্প ৮৩
তাঁত শিল্প ৮৩

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ৮৪-৮৫

লোকখাদ্য (folk food) ৮৬

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ৮৭-৮৮

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad) ৮৯-১০১

ক. লোকসংগীত ৮৯

১. মরমি ও দেহতত্ত্ব গান ৮৯
২. মুর্শিদী গান ৯০
৩. বিচ্ছেদী গান ৯০
৪. মারফতি ও শরিয়তি গান ৯০
৫. বিয়ের গান ৯১
৬. বেহারার গান ৯২
৭. বেদের গান ৯৩
৮. সাধক গণি মুন্সীর গান ৯৩
৯. শাচাই শাহের গান ৯৫
১০. মোয়াজ্জেম খাঁর গান ৯৬
১১. আনোয়ার হোসেন নিদারের গান ৯৭
১২. জীতেন চন্দ্র বর্মনের গান ৯৮
১৩. খালেক বয়াতীর গান ১০০
১৪. কাঙাল রশিদের গান ১০১
১৫. দেশাত্মবোধক গান ১০১

লোকউৎসব (folk festival) ১০২-১১০

১. বৈশাখী উৎসব ও মেলা ১০২
২. পৌষ-পার্বণ ১০৩
৩. হালখাতা ১০৩
৪. চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ১০৪
৫. কালী গাছতলা ১০৫
৬. দমের মাদার ১০৫
৭. আশুরা ১০৭
৮. খোদাই শিরনি ও নবান্ন ১০৮
৯. পাতিল সাধুর ওরস ও মেলা ১০৮
১০. কদম মস্তানের মেলা ১০৯
১১. চাঁন মস্তানের মেলা ১০৯
১২. শাচাই ফকিরের মেলা ১০৯
১৩. শেখরনগর ও কয়কীর্তনের কালীপূজার মেলা ১০৯
১৪. দোসরপাড়া লালন শাহের মেলা ১১০

আচার-অনুষ্ঠান (ritual) ১১১-১১৪

১. কালের ব্রত ১১১
২. মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা ১১২

www.pathagar.com

৩. মাঘমণ্ডলের ব্রত ১১৬
৪. থুয়া ব্রত ১১৭
৫. তুষ তুষালি ১১৮
৬. তারাব্রত ১১৮
৭. যমপুকুরের ব্রত ১১৯
৮. নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ১২০
৯. মনসা ব্রত ১২০
১০. ত্রিভুবন চতুর্থী ১২০
১১. কাঁটা খেলা ১২০
১২. গারু হারকাইন ১২২
১৩. কুলামানত ১২৩
১৪. বেরা বা ভেলা ভাসানি ১২৩

লোকনৃত্য (folk dance) ১২৫-১২৬

লোকক্রীড়া (folk games) ১২৭-১৪১

১. তিনগুটি ১২৭
২. ইচিং বিচিং ১২৭
৩. পাতা পাতা সাত পাতা ১২৮
৪. ফুল টোক্কা ১২৮
৫. দাপ্পা খেলা ১২৯
৬. টিলু-এস্পারাইট ১২৯
৭. বরফ পানি ১২৯
৮. অভি অভি ১৩০
৯. হা-ডু-ডু ১৩০
১০. গোল্লাছুট ১৩১
১১. বৌছি ১৩২
১২. দাড়িয়াবান্ধা ১৩৩
১৩. কুতকুত ১৩৪
১৪. কানামাছি ১৩৫
১৫. দড়িলাফ ১৩৬
১৬. ষোলগুটি ১৩৬
১৭. নলডুব বা হৌলডুবানি ১৩৭
১৮. লাটিম খেলা ১৩৭
১৯. মার্বেল খেলা ১৩৮
২০. ঘুড়ি ওড়ানো ১৩৮
২১. কুমির-কুমির খেলা ১৩৮
২২. পুতুল বিয়ে ১৩৯
২৩. সাতচারা মেলা ১৩৯

www.pathagar.com

২৪. বলি খেলা ১৩৯
২৫. নৌকা বাইচ ১৪০
২৬. গরুর দৌড় ১৪০
২৭. গাইয়া গুছিং ১৪০
২৮. ডাংগুলি ১৪০
২৯. রুমাল চুরি ১৪১

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ১৪২-১৪৬
বেদে সম্প্রদায় ১৪২
ঋষি বা মুনী সম্প্রদায় ১৪৩
বারুজীবী সম্প্রদায় ১৪৪
বেরুয়া সম্প্রদায় ১৪৫

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ১৪৭-১৫১
ক. ঝাড়, ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া-তাবিজ ১৪৭
খ. গ্রাম্য চোটকা চিকিৎসা ১৫১

ধাঁধা (riddle) ১৫২-১৫৫

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ১৫৬-১৬৪

লোকবিশ্বাস (folk Belief) ও লোকসংস্কার (folk Superstition) ১৬৫-১৬৬
ক. লোক বিশ্বাস
খ. লোক সংস্কার

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ১৬৭-১৭৪
নৌ শিল্প ১৬৭
গৃহসামগ্রী ১৬৯
ছাইন্দা জাল ১৭০
হাইংলা জাল ১৭১
খইরকা ১৭২
পলো ১৭২
ভেসাল ও ধর্মজাল ১৭৪

লোকভাষা (folk language) ১৭৫-১৭৮

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

মুন্সিগঞ্জের প্রাচীন নাম বিক্রমপুর। বিক্রমপুর নাম নিয়ে নানা কিংবদন্তি রয়েছে। রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণকালে সমতট প্রদেশের সাগর তীরবর্তী এই স্থানটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এইখানে রাজ্য স্থাপন করে নাম দেন বিক্রমপুর। আবার অনেকে মনে করেন, সেন বংশের রাজা বিক্রম সেনের নামানুসারে এলাকাটির নাম হয় বিক্রমপুর। মোঘল আমলে বিক্রমপুর এলাকার নাম ছিল ইদ্রাকপুর। মোঘল ফৌজদার ইদ্রাকের নাম অনুসারে এর নাম ইদ্রাকপুর রাখা হয়েছিল। মুন্সিগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে এখনও ইদ্রাকপুর নামের একটি গ্রাম রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ইদ্রাকপুর নাম পরিবর্তিত হয়ে মুন্সিগঞ্জ নাম ধারণ করে। রামপালের কাজি কসবা গ্রামের মুন্সী এনায়েত আলী তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ইদ্রাকপুর এলাকায় একটি গঞ্জ বা হাট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাটটির নাম দেন মুন্সিগঞ্জ। অনেকের বিশ্বাস মুন্সি এনায়েত আলী প্রতিষ্ঠিত মুন্সিগঞ্জ অধিক খ্যাত হয়ে উঠলে ইদ্রাকপুর নামটি পরিবর্তিত হয়ে মুন্সিগঞ্জ নাম ধারণ করে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, মোঘল ফৌজদার মুন্সি হায়দার আলীর নামানুসারে এলাকার নাম হয় মুন্সিগঞ্জ। কারো মতে, ষোলঘর ও বজ্রযোগিনী এলাকায় মুন্সি পদবিধারী হিন্দু জমিদারগণের নামানুসারে এলাকার নাম হয় মুন্সিগঞ্জ।[১]

এবার এই জেলার ৬টি থানার নামকরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হলো :

টঙ্গিবাড়ি উপজেলার নামকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এলাকার গণ্যমান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই অত্র এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান নিচু। আগে প্রায় সারা বছরই অধিকাংশ স্থানে পানি থাকতো, তখন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নৌপথ। নিচু এলাকায় লোকজন মাটি কেটে ক্ষুদ্রাকার দ্বীপের মত বানিয়ে বাড়ি নির্মাণ করত। অনেকটা টং দোকানের মত। টং সদৃশ স্থানে বাড়ি নির্মিত হওয়ায় কালক্রমে স্থানের নামকরণ হয় টঙ্গিবাড়ি।

এলাকার জনশ্রুতি, ঔপনিবেশিক যুগে গজারিয়া ছিল চর অঞ্চল। পর্তুগিজ নাবিকরা এখানে পাখি শিকারের জন্য আসত। মাঝে-মধ্যে এ এলাকার জমিদারদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটত। এমনি এক যুদ্ধের পর একজন ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন ও তাঁর কিছু অনুচর পাখি শিকারের জন্য নদীর পাড় দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন; এমন সময় তাদের নজরে পড়ে ভাসমান এক মৃত হাতির উপর এক বিরাট পাখি যা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। গজ শব্দের অর্থ হাতি এবং রিয়া শব্দের অর্থ পাখি। হাতির উপর থাকা পাখি দেখে ক্যাপ্টেন ও তাঁর অনুচরগণ এলাকাটির নামকরণ করেছিলেন 'গজারিয়া'। অপর একটি জনশ্রুতি যে, গজারিয়া এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গজারিয়ার পশ্চিম দিকে বিশাল মেঘনা নদী প্রবাহিত। মেঘনার বিশালত্ব দেখে ত্রিপুরা রাজাদের হস্তিবাহিনী

www.pathagar.com

আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে সাহস পেত না। তাদের নিকট মেঘনা নদী ছিল অরি সদৃশ। 'গজ' আর 'অরি' শব্দ দুটি একত্র হয়ে এলাকাটির নাম হয় 'গজেরঅরি' তার থেকে হয় গজারিয়া।

মুন্সিগঞ্জ জেলার মানচিত্র

ঐতিহ্যদীপ্ত শ্রীনগরের প্রাচীন নাম রায়েসবর। নবাব মীর কাসিম কর্তৃক নিযুক্ত বাংলা বিহার উড়িশ্যার গভর্নর লালা কীর্তিনারায়ণ বসু রায়েসবরের শ্রীবৃদ্ধি করে এর নামকরণ করেন শ্রীনগর। তিনি শ্রীনগর তথা বিক্রমপুরে একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন যা শ্রীনগর পাইলট স্কুল ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হত, বর্তমানে সেটি বিলুপ্ত।

লৌহজং-এ একসময়ে কলকাতা হতে নৌপথে লৌহসামগ্রী আমদানি হতো। এখানে লৌহজাত সামগ্রীর ব্যবসা এতই প্রসার লাভ করেছিল যে, এই অঞ্চল 'লোহালক্কড় ব্যবসা জংশনে' পরিণত হয়েছিল বলে জানা যায়। লৌহ ও জংশন শব্দ দুটির সংযোগে লৌহজং শব্দটির উৎপত্তি বলে অধিকাংশের ধারণা।

সিরাজদিখান নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত আছে। কথিত আছে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর পিতাকে নেয়ার জন্য পাথরঘাটা (সিরাজদিখান) এলাকা দিয়ে বিক্রমপুর এসেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে সিরাজদিখান নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

সিরাজদিখান এর পাশের রাজদিয়া গ্রামে খান বংশের আদি পুরুষ সুজাত আলী খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাহি ফরমান অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে আরাকানি জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নিযুক্ত থাকাকালে ইছামতি নদীর দক্ষিণে রাজদিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই খান বংশের ৪র্থ পুরুষ সিরাজ উদ্দীন খান ছিলেন স্বাধীনচেতা ও খোদাভক্ত মানুষ। একসময় তিনি বিবাগী হয়ে দেশত্যাগ করেন এবং ত্রিশ বছর পরে ইছামতি নদীর তীরে জঙ্গলে ৪জন সঙ্গী নিয়ে আস্তানা গড়ে তুলে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এই সাধক পুরুষের মৃত্যুর পরে এলাকাটির নাম রাখা হয় সিরাজদিখান। সিরাজউদ্দীন খান ও তাঁর ৪ জন সঙ্গীর সমাধিস্থলটি এখন ৫ পীরের মাজার নামে পরিচিত।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মুন্সিগঞ্জ একটি মহকুমা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৮৪ সালে এটি জেলায় পরিণত হয়। রাজধানী ঢাকার ৩০ কি. মি. দক্ষিণে ৩৮১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মুন্সিগঞ্জ জেলা অবস্থিত। এ জেলার রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ, থানা ৬টি, পৌরসভা ২টি, ইউনিয়ন ৬৯টি ও গ্রাম ৭৮৬টি। জেলার জমির পরিমাণ মোট ২,৪৪,০৩৬ একর।[২] জলবায়ুর দিক থেকে নাতিশীতোষ্ণ, উর্বর মাটির কারণে কৃষি উপযোগী এবং নদী বেষ্টিত হওয়ায় মৎস্য এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ এ জেলা।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীনকাল থেকেই মুন্সিগঞ্জ ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত সুরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। পূর্বে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক সীমা ছিল ৯০০ বর্গমাইল তবে পদ্মার ভাঙনে এর আয়তন হয়েছে ৩৬০ বর্গমাইলের মত।

মুন্সিগঞ্জ জেলার পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা। পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাও পদ্মা নদী দ্বারা বিভাজিত। উত্তরে ঢাকার কেরানিগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী এবং তার পাড়ে শরিয়তপুর জেলা।

গ. জলবায়ু

মুন্সিগঞ্জ এলাকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তবে আর্দ্র ও দূষণযুক্ত এলাকার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত ঋতু বিশেষে পরিবর্তনশীল। শীতকালে শীতের তীব্রতা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো খুব বেশি প্রবল নয়। মুন্সিগঞ্জ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভুক্ত। এই জেলাভুক্ত উপজেলাসমূহের আয়তন, অবস্থান ও সীমানার বিবরণ প্রদান করা হলো :

সদর উপজেলা : ১৬০.৭৯ বর্গ কিমি। অবস্থান : ২৩°২৩ থেকে ২৩°৩৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৮ থেকে ৯০°৩৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা : উত্তরে নারায়ণগঞ্জ সদর, বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) ও সোনারগাঁও উপজেলা, দক্ষিণে ভেদরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে গজারিয়া ও মতলব উপজেলা, পশ্চিমে টঙ্গিবাড়ি ও নড়িয়া উপজেলা।

www.pathagar.com

টঙ্গিবাড়ি উপজেলা : ১৪৯.৯৬ বর্গ কিমি। অবস্থান : ২৩°২৩´ থেকে ২৩°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৪´ থেকে ৯০°৩১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। উত্তরে নারায়ণগঞ্জ সদর, পূর্বে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলা, পশ্চিমে লৌহজং ও সিরাজদিখান উপজেলা।

গজারিয়া উপজেলা : ১৩০.৯২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে সোনারগাঁ ও হোমনা উপজেলা, দক্ষিণে মতলব উপজেলা, পূর্বে দাউদকান্দি উপজেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী ও মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা।

শ্রীনগর উপজেলা : ২০২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে নবাবগঞ্জ ও সিরাজদিখান উপজেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদী ও লৌহজং উপজেলা, পূর্বে সিরাজদিখান উপজেলা, পশ্চিমে দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা।

লৌহজং উপজেলা : ৮৮ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে টঙ্গিবাড়ি উপজেলা, পশ্চিমে পদ্মা নদী ও শ্রীনগর উপজেলা।

সিরাজদিখান উপজেলা : আয়তন ১৮০.১৯ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে লৌহজং ও টঙ্গিবাড়ি উপজেলা, পশ্চিমে শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে ধলেশ্বরী ও নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা।

ঘ. ভূমির আকৃতি ও আয়তন

মুন্সিগঞ্জ প্রায় সমতল। এ জেলায় কোনো টিলা পাহাড় নেই। মুন্সিগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়। ৯৫৪.৯৬ বর্গ কি.মি.। অবস্থান : ২৩°২৩´ থেকে ২৩°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১০´ থেকে ৯০°৪৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

ঙ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কালের বিবর্তন, পদ্মার ভাঙন আর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে প্রাচীন বিক্রমপুরের সর্বশেষ পরিণতি আজকের মুন্সিগঞ্জ। ১৮৮৪ সালে প্রথম মুন্সিগঞ্জ ও শ্রীনগর থানা নিয়ে গঠিত হয় মুন্সিগঞ্জ মহকুমা। পরবর্তীকালে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ৫ টি থানায় উন্নীত হয়। সংযোজিত থানাসমূহ: টঙ্গিবাড়ি, সিরাজদিখান এবং লৌহজং। তখন পর্যন্ত গজারিয়া ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। পরে গজারিয়া কুমিল্লা জেলার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। সবশেষে গজারিয়া থানা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার সাথে অন্তর্ভুক্ত হলে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ৬টি থানায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে ১লা মার্চ মুন্সিগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার ঘোষণা করা হলে জেলার নাম বিক্রমপুর করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু শেষাবধি জেলার নামকরণ করা হয় মুন্সিগঞ্জ।

মুন্সিগঞ্জ থানা গঠিত হয় ১৯০১ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। টঙ্গিবাড়ি থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

গজারিয়া থানা সৃষ্টি হয় ১৯৫৪ সালে এবং থানাকে উপজেলাতে রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। শ্রীনগর থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৩ সালে লৌহজং থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

১৮৪৫ সালে মুন্সিগঞ্জ ও শ্রীনগর এই দুইটি থানা নিয়ে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। তখন সিরাজদিখান এলাকা শ্রীনগর থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের পর সিরাজদিখান বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৭২ সালে সমগ্র ঢাকা জেলায় মাত্র ১৯টি থানা ছিল। ১৯২১ সালের জরিপে দেখা যায় ঢাকা জেলায় থানা ছিল ৩৫টি। এই ৩৫টির মধ্যে সিরাজদিখান ছিল অন্যতম। ১৯১৪ সালে সিরাজদিখান থানা ও সিরাজদিখান সাব-রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে সিরাজদিখানকে উন্নীত থানা ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৩ সালে সিরাজদিখান থানা উপজেলা হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

চ. জনবসতির পরিচয়

জনসংখ্যা ১২৯৩৯৭২; পুরুষ ৬৫৫৫৮৫ জন, মহিলা ৬৩৮৩৮৭ জন। মুসলিম ১১৮১০১২, হিন্দু ১১০৮০৪, বৌদ্ধ ১৯২২, খ্রিস্টান ১০৩ এবং অন্যান্য ৩০৮ জন[৩]।

জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস : কৃষি ৩৮.৬৪%, অকৃষি শ্রমিক ৩.১৭%, শিল্প ১.৬৯%, ব্যবসা ২৩.১৭%, পরিবহন ও যোগাযোগ ৩.৭৫%, নির্মাণ ১.২৭%, ধর্মীয় সেবা ০.১৯%, চাকরি ১০.৮৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৫.৯৫% এবং অন্যান্য ১০.৩০%।

ছ. নদ-নদী, খাল-বিল

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, ইছামতি নদী, আড়িয়ল বিল উল্লেখযোগ্য। মুন্সিগঞ্জ জেলার তিন দিকের সীমানা নির্ধারণকারী নদী পদ্মা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকে এ ভূ-খণ্ডটি নৌবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এ জেলার দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে ধলেশ্বরী এবং পূর্বে মেঘনা নদী প্রবাহিত। মুন্সিগঞ্জ জেলার অপর উল্লেখযোগ্য নদী ইছামতি। নিচে নদীগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

ধলেশ্বরী : ধলেশ্বরী যমুনার একটি শাখা নদী। নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লার নিকটে এসে বুড়িগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবিবাজার, মিরকাদিম, আব্দুল্লাপুর, তালতলা প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রগুলো ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জ জেলা শহরের কাছে ধলেশ্বরীর সাথে শীতলক্ষা নদীর স্রোত মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত কলাগাছিয়া নামক স্থানে মেঘনার সাথে মিশে যায়। এই তিনটি নদীর সঙ্গম স্থল অত্যন্ত বিশাল। বর্তমানে এই নদীর উপরে কুচিয়ামোড়া নামক স্থানে ধলেশ্বরী এক নম্বর ও দুই নম্বর সেতু এবং মুক্তারপুরে বৃহৎ সেতু তৈরি হয়েছে।

মেঘনা : ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনার পূর্ব তীরে গজারিয়া এখন মুন্সিগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের নৌ-যোগাযোগের জন্য মেঘনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

www.pathagar.com

পদ্মা : পদ্মার অপর নাম কীর্তিনাশা।[৪] এক সময়ে পদ্মা এ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাকেরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হত। ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় পদ্মার গতিপথ পরিবর্তিত হলে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং, টঙ্গিবাড়ি ও সদর উপজেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে চাঁদপুরের কাছে এসে মেঘনার কাছে মিশে যায়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন, "পদ্মার গতি পরিবর্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোনও স্টিমার সপ্তাহকাল পূর্বে সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে যে স্থান ক্ষীণ-তোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মা-পুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবী ভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে।"

ইছামতি : ধলেশ্বরীর একটি স্রোত তালতলা বন্দর হতে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ফুরসাইল, বয়রাগাদি, বাহেরঘাটা, সিরাজদিখান বাজার, চোরমর্দ্দন, রাঙ্গামিলা, বাসাইল, ইমামগঞ্জ, নিমতলী প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষীণ শাখা পুনরায় ধলেশ্বরীতে ও অপর একটি শাখা চূড়াইনের মধ্যদিয়ে আড়িয়ল বিলে গিয়ে পতিত হয়েছে। এই শাখাটি চূড়াইন খাল নামেও খ্যাত। এই ছোট্ট ইছামতি নদীটি মুন্সিগঞ্জ জেলার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাল : মুন্সিগঞ্জ জেলার বিখ্যাত খালগুলি ধলেশ্বরী হতে উৎপন্ন হয়ে পদ্মায় পতিত হয়েছে। এজন্য এই খালগুলি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। এইগুলিকে পদ্মা, ধলেশ্বরীর সংযোগ খালও বলা যেতে পারে। এই সমস্ত খালে জোয়ার ভাটার সময় জল কমে ও বাড়ে। জোয়ারের সময় মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করতে পারে। এতে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বর্তমানে বর্ষার মৌসুম ছাড়া খালগুলি চলাচলের উপযোগী আর নেই। যেমন: মিরকাদিমের খাল, তালতলার খাল, হলদিয়া-শ্রীনগরের খাল ইত্যাদি। নিম্নে খালগুলির বিবরণ দেওয়া হলো :

মিরকাদিমের খাল : বর্তমান রিকাবিবাজারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী হতে উৎপন্ন হয়ে টঙ্গিবাড়ি উপজেলার মধ্যে দিয়ে মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটি খালে মিশে পদ্মা নদীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই খালের উপর তিন খিলানযুক্ত একটি প্রকাণ্ড ইটের পুল আছে। জনপ্রবাদ, পুলটি রাজা বল্লাল সেনের নির্মিত। পাইকপাড়া ও আব্দুল্লাপুর গ্রামের উভয় সীমায় পুলটি অবস্থিত।

তালতলার খাল : মিরকাদিমের খালের প্রায় চার কিলোমিটার পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে অবস্থিত তালতলার খাল। এই খালের তীরে সুবচনি, বালিগাঁও, বড়মোকাম, ডহরী প্রভৃতি হাটবাজার অবস্থিত। বালিগাঁও হাট মুন্সিগঞ্জ জেলার বিখ্যাত কাঠব্যবসা কেন্দ্র। বর্ষায় এই খাল দিয়ে রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের মালবাহী নৌকা ও ট্রলার যাতায়াত করে। রাজধানী ঢাকার সাথে নৌ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই খালটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

www.pathagar.com

হলদিয়া-শ্রীনগরের খাল : ধলেশ্বরী হতে উৎপন্ন হয়ে চিত্রকোট, শেখরনগর, আলমপুর, ষোলঘর, শ্রীনগর, গয়ালিমান্দ্রা, হলদিয়া হয়ে খালটি পদ্মা নদীতে মিশেছে। পদ্মা বাহিত পলি জমে এই গুরুত্বপূর্ণ খালটি ভরাট হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে অল্প কিছু দিনের জন্য নৌ চলাচলের উপযোগী থাকে। এককালে এই খালটি পশ্চিম বিক্রমপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে হলদিয়া গ্রামের উত্তরপার্শ্ব স্পর্শ করে এই খালের একটি অপ্রশস্ত জলধারা পূর্বগামী হয়ে নাগেরহাট, দক্ষিণ চারিগাঁও, নওপাড়া, ভবানীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তালতলা খালের সাথে মিশেছে। এই খালটি 'পোড়াগঙ্গা' নামে পরিচিত। এক সময়ে হলদিয়া বন্দর হতে নৌকা যোগে মালবহনে সুবিধাজনক খাল ছিল এটি।

এসব বড় বড় খাল হতে অসংখ্য 'ঝোরাখালের' উৎপত্তি হয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার নিম্ন ভূমির সাথে সংযোগ রক্ষা করেছে। যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই খালগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

বিল : মুন্সিগঞ্জ জেলার বিলগুলির মধ্যে আড়িয়ল বিল বিশেষ প্রসিদ্ধ। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের মতে 'অনেকে অনুমান করেন যে, সম্ভবত রাজশাহীর চলনবিল এবং ঢাকার আড়িয়ল বিলেই অতি প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে আড়িয়ল বিল চূড়াইন বিল নামে পরিচিত ছিল। আড়িয়ল বিলের দক্ষিণে মাইজপাড়া, গাদিঘাট, কোলাপাড়া, রাঢ়িখাল; উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারুইখালি, শেখরনগর; পশ্চিমে নারিশা, পূর্বে ষোলঘর, হাসাড়া, দয়হাটা প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। আড়িয়ল বিল মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে। এই বিলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বালাসুর গ্রামে বিখ্যাত জমিদার যদুনাথ রায়ের বাড়ি অবস্থিত। এই বাড়িতে 'অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন' নামে ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সমাজসেবামূলক একটি সংগঠনের উদ্যোগে বিক্রমপুর জাদুঘর ও সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আড়িয়ল বিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই মাছের জন্য বিখ্যাত। বলা যায় মুন্সিগঞ্জ জেলার একমাত্র মৎস্যভাণ্ডার এই বিল। অবশ্য এ অঞ্চলে বেশ কিছু বিখ্যাত দিঘি ও পুকুর রয়েছে। যেমন : বল্লাল দিঘি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘি, কোদালধোয়া দিঘি, সুখবাসপুরের দিঘি, ধামদহ দিঘি, মামাসার দিঘি, নইয়ের দিঘি, সুয়াপাড়া দিঘি, টঙ্গিবাড়ি দিঘি, মঘা দিঘি, মালপদিয়ার দিঘি, জৈনসারের দিঘি, ধামারণের দিঘি, কনকসারের দিঘি, ষোলঘরের হেমসাগর, ভুঁইচিত্রের জোড় দিঘি, হাসারার দিঘি, শ্রীনগরের ব্রজের ও বাউলপাড়া দিঘি ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আড়িয়ল বিলের মধ্যেও কতগুলি দিঘি আছে। যেমন : বোসের আওলা, ঘোড়া পাউট্টা, বীর সাগর, গলাচিপা, রাঙ্গা মাইট্যা, মুগ্‌দাডাঙ্গা, বালিবুনিয়া, পরশুরাম, তালগাছিয়া, ভেন্নির দিঘি, লাল দিঘি ইত্যাদি।

সামসার দিঘি, সাকুইসার দিঘি, ধামাইপুনি দিঘি, মধ্যপাড়া দিঘি, চিকনাইসার দিঘি, কৈবর্তসার দিঘি, পাটানন্দীর দিঘি, ভাতলা দিঘি, মগ-পুকুর, মালপদিয়ার দিঘি, পৈট্টাসার দিঘি, বদ্দিসার দিঘি, নুরাইতলি, সিদ্ধেশ্বরীতলা, তিন্নাতলা, পঞ্চবটীতলা, চণ্ডিতলা, ধর্মঠাকুরতলা, দোসরপাড়ার বটতলা।

www.pathagar.com

জ. হাট-বাজার

জেলার প্রতিটি হাট-বাজারেই বহু লোকের সমাগম ঘটে। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের প্রধান আড্ডা বা মিলনস্থল হলো হাট-বাজার। ফলে হাট-বাজারের মাধ্যমে গ্রামের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মতো মুন্সিগঞ্জেও অসংখ্য হাট-বাজার রয়েছে। এসব হাট-বাজার শুধু নিত্যদিনকার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র বেচাকেনার স্থান নয় বরং সংস্কৃতি চর্চার স্থানও বটে। হাট-বাজারের নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে নানা বয়সের লোকেরা মিলিত হয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করে থাকে। কোন এলাকায় কী ধরনের জীবনাচার প্রচলিত মোটের উপর তার ধারণা আমরা হাট-বাজার দেখে অনুমান করতে পারি। বাজার যেমন প্রতিদিন বসে হাট তেমনি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় এমন অনেক হাট-বাজার রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের বেশিরভাগ হাট-বাজার বসে নদী বা খালের পাড়ে। সাধারণত পণ্য ও যাতায়াতের সুবিধার কথা বিবেচনা করে হাট-বাজারের স্থান নির্ধারণ করা হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এখনও হাট-বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মুন্সিগঞ্জ সদরের উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের মধ্যে মুন্সিরহাট, চিতলিয়া হাট, মিরকাদিম হাট, মাকহাটি হাট, মুন্সিগঞ্জ বাজার, কাটাখালি বাজার, কমলাঘাট বাজার ও রিকাবিবাজার এবং মেলার মধ্যে বারুণী মেলা (কমলাঘাট), রামপাল মাঘি পূর্ণিমা মেলা, দশমী মেলা (কমলাঘাট), মুন্সিগঞ্জ রথযাত্রা মেলা, রামপাল রথযাত্রা মেলা, মনসার মেলা ও কাদিরা পাগলার মেলা উল্লেখযোগ্য।

টঙ্গিবাড়ি উপজেলায় টঙ্গিবাড়ি হাট, বেতকা হাট, বালিগাঁও হাট, সুবচনী হাট, দিঘিরপাড় হাট, আব্দুল্লাপুর বাজার, পাঁচগাঁও বাজার এবং ফজুশাহ ফকিরের মেলা।

গজারিয়া উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের মধ্যে রয়েছে ভবেরচর হাট ও বাজার, রসুলপুর হাট ও বাজার, নতুনবাজার হাট, মাথাভাঙ্গা হাট, হোসেনদি হাট, মেঘনা বাজার এবং জেলার মধ্যে দাসকান্দি বটগাছতলা মেলা, জামালদি বৈশাখী মেলাও বালিয়াকান্দি ইউনিয়নের রায়পাড়া গ্রামে শামসু পাগলার মেলা।

শ্রীনগর উপজেলার হাট-বাজারের মধ্যে রয়েছে শ্রীনগরহাট, দেলভোগহাট, শিবরামপুর হাট, ভাগ্যকূল হাট, বীরতারা হাট, বাঘরা হাট, ষোলঘর বাজার, হাসাড়া বাজার, বাড়ৈখালী বাজার, কোলাপাড়া বাজার এবং জেলার মধ্যে শ্যামসিদ্ধি মেলা, শ্রীনগর মেলা, কয়কীর্তন মেলা, রাঢ়ীখাল মেলা।

লৌহজং উপজেলার হাট-বাজারের মধ্যে রয়েছে হলদিয়া হাট, গোয়ালিমান্দ্রা হাট, কলমা হাট, নওপাড়া হাট, কনকসার বাজার, নাগেরহাট বাজার, ঘোড়দৌর বাজার, কাজীর পাগলা বাজার, চন্দের বাজার, বৌলতলীর বাজার, পয়সা বাজার, বেজগাও বাজারও কদম মস্তানের মেলা।

সিরাজদিখান উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের মধ্যে রয়েছে তালতলা হাট, সিরাজদিখান হাট, ভবানীপুর হাট, রাজানগর বাজার, শেখরনগর বাজার, বালুরচর বাজার, মধ্যপাড়া বাজার, বাসাইল বাজার, সৈয়দপুর বাজার, ইছাপুরা বাজার এবং

www.pathagar.com

শেখরনগর কালী পূজার মেলা, জিন্দা পীরের মেলা, সুজানগর রথের মেলা, দোসরপাড়া লালন মেলা, মালখানগর পাউলদিয়ায় বৈশাখী মেলা।

ঝ. উল্লেখযোগ্য ফসল ও রপ্তানিদ্রব্য

উল্লেখযোগ্য ফসলের মধ্যে রয়েছে, ধান, আলু, পটল, গম, পাট, সরিষা, মরিচ, শাকসবজি, পান, চিনাবাদাম, ভুট্টা, সরিষা, করলা ও টমেটো। সিরাজদিখানের শ্রেষ্ঠ ফসল আলু। সারা বাংলাদেশে উৎপাদিত আলুর ৫০% মুন্সিগঞ্জ জেলায় উৎপন্ন হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদিত হয় এই উপজেলায়।

এই জেলার বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি হলো— তিল, ডাল, নীল, কাউন, তিসি ও অড়হর। এ জেলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হলো : আলু, পটল, শাকসবজি, পাট।

ঞ. উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার

শিক্ষার গড় হার ৫১.৬২%; পুরুষ ৫৪.১৩%, মহিলা ৪৯.০৭%। কলেজ ১৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪৯, মাদ্‌রাসা ২৯টি।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি গজারিয়া কলেজ, কলিমুল্লাহ কলেজ, সরকারি শ্রীনগর কলেজ, মিরকাদিম হাজী আমজাদ আলী কলেজ, রামপাল কলেজ, লৌহজং ডিগ্রি কলেজ, বিক্রমপুর কে বি কলেজ, বিক্রমপুর আদর্শ কলেজ, বিক্রমপুর টঙ্গিবাড়ি কলেজ, বি টি কলেজ, রাঢ়ীখাল জে সি বসু ইন্সটিটিউশন ও কলেজ, হাঁসাড়া কে কে উচ্চ বিদ্যালয়, বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, লৌহজং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মালখানগর উচ্চ বিদ্যালয়, এ.ভি.জে.এম. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইছাপুরা উচ্চ বিদ্যালয়, স্বর্ণগ্রাম আর এন উচ্চ বিদ্যালয়, আব্দুল্লাপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ভাগ্যকুল হরেন্দ্রলাল উচ্চ বিদ্যালয়, আউটশাহী রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণগাঁও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পাইকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, রায় বাহাদুর শ্রীনাথ ইন্সটিটিউশন, বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চসার দাখিল মাদ্‌রাসা, গজারিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, বাসুদিয়া মাদ্‌রাসা, মসদগাঁও এ. এল. কে. দাখিল মাদ্‌রাসা, ইসলামপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা, ধীপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বলই ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কামারগাঁও সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

মুন্সিগঞ্জের শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : গড় হার ৫০.৬%; পুরুষ ৫৩.৫%, মহিলা ৪৭.৪%। কলেজ ৪, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, প্রাইমারি শিক্ষক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৯, মাদ্‌রাসা ৯। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ কলেজ, বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৩), মুন্সিগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ

www.pathagar.com

বিদ্যালয় (১৮৮৫), এ ভি জে এম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯২), বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), রামপাল এন বি এম উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৩), কে কে গভঃ ইনস্টিটিউশন (১৯৪২), ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০)।

টঙ্গিবাড়ির শিক্ষার হার ও উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : *শিক্ষা প্রতিষ্ঠান* গড় হার ৫২.৪%, পুরুষ ৫৪.৭%, মহিলা ৫০.০%। স্বর্ণগ্রাম আর এন উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৮), আব্দুল্লাপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৯), সোনারং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০০), আউটশাহী রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১), বানারী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১), দিঘিরপাড় এ সি ইনস্টিটিউশন (১৯০২), পাইকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৪), ব্রাহ্মণভিটা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), আড়িয়ল স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪), পুরা ডি, সি, উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৩)।

গজারিয়ার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারি গজারিয়া কলেজ, কলিমুল্লাহ কলেজ, রাজনগর সৈয়দপুর ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়, ভবেরচর ওয়াজের আলি উচ্চ বিদ্যালয়, হোসেনদি উচ্চবিদ্যালয়, গজারিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, বাউসিয়া এম এ আজাহার উচ্চবিদ্যালয়, ভাটারচর দে, এ মান্নান পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, গজারিয়া পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গজারিয়া বাতেনিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, ভাটেশ্বর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, শিমুলিয়া সিদ্দিকিয়া আলিম মাদ্‌রাসা।

শ্রীনগরের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারি শ্রীনগর কলেজ, স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন, আলী আসগর আবদুল্লাহ কলেজ, সমশপুর বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ, চুড়াইন আদর্শ মহাবিদ্যালয়, রুসদী উচ্চবিদ্যালয়, ষোলঘর একে এস কে উচ্চবিদ্যালয়, হাসাড়া কালীকিশোর উচ্চবিদ্যালয়, ভাগ্যকূল হরেন্দ্রলাল উচ্চবিদ্যালয়, মজিদপুর দয়হাটা কে সি ইনস্টিটিউট, বাড়ৈখালী উচ্চবিদ্যালয়।

লৌহজং-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : লৌহজং কলেজ, কাজির পাগলা এ টি ইনস্টিটিউশন, কলমা এল কে উচ্চবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চবিদ্যালয়, লৌহজং উচ্চবিদ্যালয়, হলদিয়া উচ্চবিদ্যালয়, লৌহজং বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, যশলদিয়া উচ্চবিদ্যালয়, নওপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, খিদিরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, বাসুদিয়া মাদ্‌রাসা, রসুলপুর মাদ্‌রাসা, মসদগাঁও দাখিল মাদ্‌রাসা, পয়সা দাখিল মাদ্‌রাসা।

সিরাজদিখানের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিক্রমপুর কে. বি কলেজ, মালখানগর স্কুল এন্ড কলেজ, বিক্রমপুর আদর্শ কলেজ, মালখানগর উচ্চ বিদ্যালয়, ইছাপুরা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, রায়বাহাদুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন, রসুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, খাসমহল বালুচর উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতিয়ানতলি উচ্চ বিদ্যালয়, বাসাইল উচ্চ বিদ্যালয়, শুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মালপদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, খারশুর উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজদিখান উচ্চ বিদ্যালয়, লতব্দি উচ্চ বিদ্যালয়, সৈয়দপুর আব্দুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা, মধ্যপাড়া রায়হানিয়া মাদ্‌রাসা, খাসকান্দি ইসলামি দাখিল মাদ্‌রাসা।

www.pathagar.com

ট. ঐতিহাসিক স্থাপনা

মুন্সিগঞ্জ তথা বিক্রমপুর একটি প্রাচীন জনপদ। এ জনপদের ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ। কালের বিবর্তনে নদীগর্ভে এর অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এখনও কিছু স্থাপনা কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এ জেলার কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বাবা আদম মসজিদ : মুন্সিগঞ্জ জেলার রিকাবিবাজার ইউনিয়নে কাজীকসবা গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। মিরকাদিম থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে এবং সিপাহীপাড়া মোড়ের সামান্য উত্তরে এই মসজিদটির অবস্থান। সুলতানি আমলে বহুগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের যে ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তার পরিপূর্ণরূপ বিকশিত হয় এই ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিতে। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুলতান ফতেহ শাহের রাজত্বকালে ১৪৮৩ সালে মালিক কাফুর কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মসজিদের বাইরের দিক বিশেষ করে সামনের দেয়াল অতি সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কিন্তু এখন সেগুলো আর টিকে নেই।

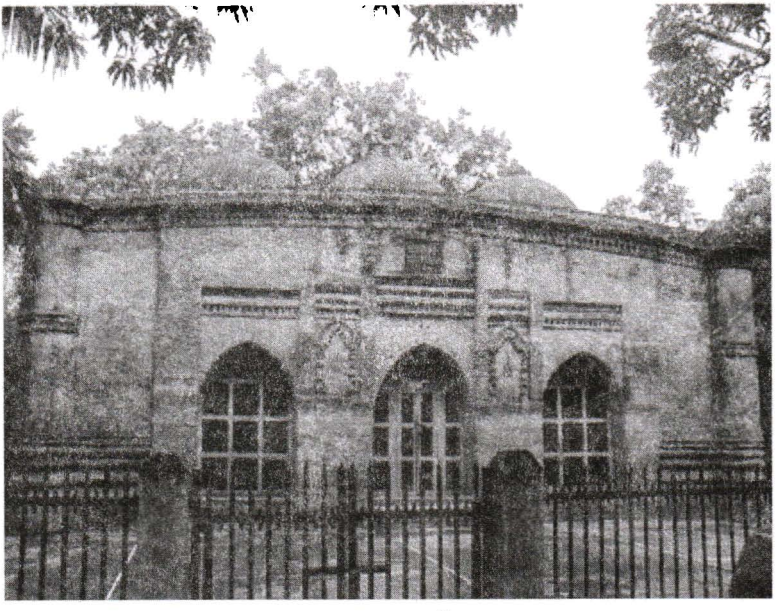

বাবা আদম মসজিদ

টেঙ্গরশাহী মসজিদ : মুন্সিগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে রিকাবিবাজার ইউনিয়নে টেঙ্গর গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের শিলালিপি পাঠ থেকে জানা যায়, এটি ৯৭৬ হিজরি অনুসারে ১৫৬৮ সালে সুলতান সুলেমান কররাণীর

www.pathagar.com

রাজত্বকালে মালিক আব্দুল্লাহ মিঞা নামক জনৈক কাজী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি কাজীর মসজিদ নামেও পরিচিত। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জানা যায়, এই মসজিদের নির্মাতা আব্দুল্লাহ মিঞা কাজী ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এলাকার নাম আব্দুল্লাহপুর হতে পারে।

আউটশাহী মসজিদ : এই মসজিদ টঙ্গিবাড়ি উপজেলার আউটশাহী গ্রামে অবস্থিত। গ্রামের নাম অনুসারেই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। অনেকে এটিকে সমাজ মসজিদ বলে থাকেন। মসজিদটি বর্তমানে বসতিহীন এলাকায় এবং পার্শ্ববর্তী জমি থেকে কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত। এক গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদের কোনো শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নি। তবে মসজিদটির নির্মাণশৈলী দেখে ধারণা করা যায় যে, এটি মোঘল আমলের শেষের দিকে স্থানীয় কোনো শাসক কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ : রামপাল ইউনিয়নের কাজী কসবা গ্রামে অবস্থিত। মোঘল আমলের শেষ দিকে কাজী পরিবারের ইমাম উদ্দীন কাজী উক্ত মসজিদটির নির্মাতা। প্রায় সাড়ে চারশত বছরের প্রাচীন এই মসজিদটি কাজী পরিবারের সদস্যরাই দেখাশোনা ও সংস্কারকার্য পরিচালনা করেন।

পাথরঘাটা মসজিদ : সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নে পাথরঘাটা গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ। নির্মাণ শৈলী দেখে অনুমান করা হয়, মোঘল আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

সতীদাহ মঠ : লৌহজং উপজেলার বেজগাঁও গ্রামে এ মঠ অবস্থিত। হিন্দু ধর্মের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সাথে স্ত্রীকেও সহমরণে বাধ্য করা হতো। এই প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। বিক্রমপুরে এক সময়ে যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল তার একমাত্র নিদর্শন এই মঠ। মঠটিতে কোনো শিলালিপি না থাকায় কে কোন সময়ে এটি নির্মাণ করেছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মঠ নির্মাণ করা হয়েছে। এলাকায় মঠটি সতীঠাকরুণের মঠ নামে পরিচিত।

হাঁসাড়া মঠ : শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া গ্রামে এই সু-উচ্চ মঠটি অবস্থিত। মঠের গায়ে একটি সাদা মার্বেল পাথরের শিলালিপি পরিলক্ষিত হয়। তাতে লেখা আছে এটি শ্রীরামকুমার পালচৌধুরী মহাশয়ের মঠ। শ্রীমতি মনমোহিনী চৌধুরাণী ১২৮৯ বাংলা মোতাবেক ১৮৮২ সালে এই মঠ নির্মাণ করেন। **মাইজপাড়া মঠ :** শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়িখাল ইউনিয়নে মাইজপাড়া গ্রামে একটি সু-উচ্চ মঠ আছে। যা মাইজপাড়া মঠ নামে পরিচিত। এলাকার জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের সমাধির উপরে তার পুত্র তারাপদ রায় মঠটি নির্মাণ করেন। ১২৯২ সালে ভূমিকম্পে মঠটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে ১২৯৩ সালে তা সংস্কার করা হয়। মঠের গাঁয়ে আস্তরের লেখা থেকে এ তথ্য জানা যায়।

ফেগুনাসার মঠ : সিরাজদিখান উপজেলার তালতলা খালের পূর্বদিকে ফেগুনাসার গ্রামে এই সু-উচ্চ মঠটি অবস্থিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, স্থানীয় রায় পরিবারের কেউ এটির নির্মাতা। তাই এই মঠ রায়ের মঠ নামেও পরিচিত। এর গঠনশৈলী দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই মঠে আউটশাহী মঠের নির্মাণশৈলী অনুসরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সোনারং জোড় মন্দির : টঙ্গিবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামে এক জোড়া মন্দির রয়েছে। মন্দির দুটি একই মঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দিকে সুউচ্চ মন্দিরটি কালী মন্দির এবং পূর্ব দিকেরটি শিব মন্দির। শিব মন্দিরটি ১৮৪৩ সালে এবং কালী মন্দিরটি ১৮৮৬ সালে নির্মিত। জানা যায়, রূপচন্দ্র নামের এক বণিক এর নির্মাতা। মুন্সিগঞ্জ জেলার নান্দনিক সৌন্দর্যের মন্দিরগুলির মধ্যে এটির জুড়ি নেই।

সোনারং জোড় মন্দির

শ্যামসিদ্ধির মঠ : শ্রীনগর উপজেলার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে এই সু-উচ্চ মঠটির অবস্থান। এটি এই উপমহাদেশের সবচেয়ে উঁচু মঠ। এলাকাটি একসময়ে মজুমদারদের জমিদারি ছিল। মঠের গায়ে গ্রথিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, এটি শম্ভুনাথ বাসার্থ মঠ। জনৈক শম্ভুনাথ মজুমদার কর্তৃক ১২৪৩ বাংলা, ১৮৩৬ ইংরেজি সালে মঠটি নির্মিত হয়েছে। বিক্রমপুরের দৃষ্টিনন্দন মঠগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

www.pathagar.com

শ্যামসিদ্ধির মঠ

সরকার মঠ : সিরাজদিখান উপজেলার তাজপুর গ্রামের এক সারিতে তিনটি মঠ দৃষ্টিগোচর হয়। এই মঠগুলো সরকার মঠ নামে পরিচিত। তিনটি মঠের মধ্যে দক্ষিণ দিকের মঠটি সর্বাপেক্ষা উঁচু। এটি ১৮৯৮ সালে নির্মিত হয়েছে বলে আস্তরের গায়ে অস্পষ্ট লিপি থেকে অনুমান করা যায়।

ফেগুনাসার শিব মন্দির : সিরাজদিখান উপজেলার ফেগুনাসার গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জে এপর্যন্ত যেসব মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়েছে তন্মধ্যে এই আটচালা শিব মন্দিরটি ভিন্নধর্মী। মন্দিরের ভেতরে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা গঠিত কমিটির মাধ্যমে মন্দিরের পূজা অর্চনা পরিচালিত হয়। জানা যায়, এই মন্দিরটি রাজা বল্লাল সেনের আমলে নির্মিত। বিক্রমপুরের রাজনগরের জমিদার রাজা রাজবল্লভ ঊনবিংশ শতাব্দিতে এর সংস্কার করেন। এ মন্দিরে ফাল্গুন মাসের শিব রাত্রে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

আউটশাহী মঠ : টঙ্গিবাড়ি উপজেলার আউটশাহী গ্রামে এই মঠটি অবস্থিত। প্রায় তিনশত বছর পূর্বে জনৈক কর পদবিধারী জমিদার মঠটি নির্মাণ করেন। এটি করের মঠ নামে পরিচিত।

চৌধুরী বাজার মঠ : মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মহাখালী ইউনিয়নে চৌধুরী বাজার গ্রামে এই মঠটি অবস্থিত। এক সময়ে যে জমিদাররা এখানে বসবাস করতেন তারা চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন। এই জমিদার পরিবারেরই কেউ উনবিংশ শতাব্দিতে এই মঠ নির্মাণ করেন।

মীরকাদিম পুল : মুন্সিগঞ্জ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মীরকাদিম খালের উপরে এই পুলটি অবস্থিত। পাইকপাড়া ও আব্দুল্লাপুর গ্রামের উভয় সীমায় পুলটি উত্তর-দক্ষিণের দীর্ঘ খালকে অতিক্রম করেছে। পুলটি অতি প্রাচীন।

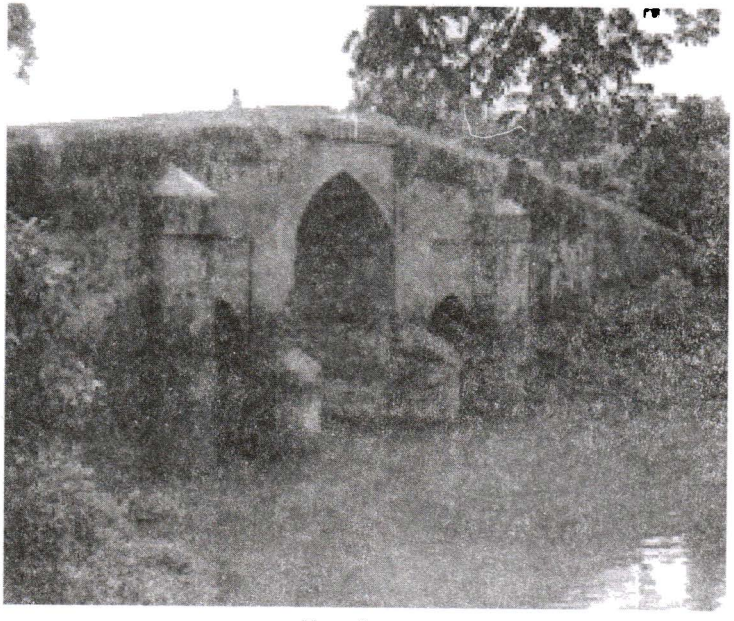

মীরকাদিম পুল

ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মীরকাদিমের খাল খনন করা হয়েছিল। ধারণা করা হয় পুলটিও সেই সময়কার। জনপ্রবাদ, পুলটি বল্লাল সেনের নির্মিত। অনেকে মনে করেন এটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল। পুলটিতে অনেক মেরামতের কাজ করা হয়েছে এবং এমন এটি একটি নতুন পুল বলে মনে হয়।

ইদ্রাকপুর কেল্লা : ইদ্রাকপুর কেল্লা ১৬৬০ সালে মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তখন ইছামতি নদীর গতিপথ এই স্থলের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হতো। তবে

www.pathagar.com

বর্তমানে এই গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। ইদ্রাকপুর দুর্গের সাথে নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা দুর্গ ও হাজিগঞ্জ দুর্গের মিল রয়েছে। এই দুর্গটি নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের কাছ থেকে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জকে সুরক্ষিত করা। ১৯৫৯ সালে এটিকে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ঘোষণা করা হয়।

ইদ্রাকপুর কেল্লায় প্রবেশ তোরণ

তারপর বহুদিন এটি অবহেলিত ছিল। একসময় এটি এস.ডি.ওর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। কথিত আছে যে, এই সুড়ঙ্গে কোনো কিছু গেলে তা আর ফিরে আসে না। একবার এস.ডি.ও র ছেলের বল সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে যায়। ছেলেটি বল আনতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। এরপর থেকে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। তারপরেও এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের বিশ্বাস এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ইছামতি ও ধলেশ্বরী নদীতে যাওয়া যেত।

www.pathagar.com

ঠ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জামাল উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা সিরাজদিখান থানা পুলিশ ক্যাম্পের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়।

২৯ মার্চ ছাত্র জনতা মুন্সিগঞ্জের সরকারি অস্ত্রাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র লুট করে। তারা ঐ দিন হরগঙ্গা কলেজের শহিদ মিনারে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করে। ৯ মে পাক বাহিনী গজারিয়ায় অভিযান চালিয়ে প্রায় চার শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এটাই ছিল মুন্সিগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় পৈশাচিক গণহত্যা। একই দিনে একজন মেজরের নেতৃত্বে ২০০ জন হানাদার বাহিনীর একটি দল মুন্সিগঞ্জ শহরে প্রবেশ করে হরগঙ্গা কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করে। ১১ মে সিরাজদিখান উপজেলায় রসুনিয়া গ্রামের প্রসন্নকুমার দত্তের বাড়িতে ভোররাতে পাকসেনারা ৯জন আশ্রিতকে হত্যা করে। এদের মধ্যে কানুদত্ত, ভানুমণ্ডল, পবন মণ্ডল, শান্তিশীল ও রামসিং এই পাঁচজন ছিলেন গ্রামবাসী। ১৪ মে হানাদার বাহিনী মুন্সিগঞ্জ শহরের অদূরে কেওয়ার গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে আশ্রিত অনিল মুখার্জি, কেদার চৌধুরী, বাদল ভট্টাচার্য, ডা. সুরেন্দ্র সাহা, দ্বিজেন্দ্র সাহা, সুনীল মুখার্জি, শচীন্দ্র মুখার্জিকে রাতের আঁধারে পুলের কাছে এনে হত্যা করে। জুলাই মাসে ধলাগাঁও এলাকায় শত শত যুবককে রিক্রুট করে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তারা বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেয়। ১১ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা শ্রীনগর থানা, ১৪ আগস্ট লৌহজং থানা নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে টঙ্গিবাড়ি থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে। মুক্তিযোদ্ধারা সেপ্টেম্বর মাসে শিবরামপুরে আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীর তিনটি গানবোট ডুবিয়ে দেয়। এতে শতাধিক পাকসেনা নিহত হয়। ২৬ অক্টোবর গোয়ালিমান্দ্রায় মুক্তিযোদ্ধারা ৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং পরে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সম্মুখ লড়াইয়ে প্রায় ৩৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৮ জন পাকসেনা ধরা পড়ে। তাদেরকে হত্যা করে পদ্মায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ১ নভেম্বর গজারিয়া ভাটিবলাকি গ্রামে অপারেশন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জেলার অন্যতম স্বাধীনতা-বিরোধী মুসলিম লীগ নেতা আফসার উদ্দিন ও তার ভাতিজাকে হত্যা করে। ৪ নভেম্বর মুক্তিসেনারা সফল আক্রমণ করে টঙ্গিবাড়ি থানা দখল করে নেয়। ৮ নভেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা সিরাজদিখান থানা আক্রমণ করে, সে অভিযান সফল হয় নি। তবে ১৯ নভেম্বর সফল আক্রমণে পাকবাহিনী সিরাজদিখানে আত্মসমর্পন করে। ১৬ নভেম্বর (২৭ রমজান শবে কদর রাতে) ১১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা একটি ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ থানাসহ সম্পূর্ণ শহর দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনীর এই বিজয় সংবাদ বিবিসিতে প্রেরণ করেছিলেন বিবিসির তৎকালীন ঢাকাস্থ সংবাদদাতা মুন্সীগঞ্জের প্রখ্যাত সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন আহমেদ। পরে তাঁকে হত্যা করে কুখ্যাত আলবদর বাহিনী। পাকবাহিনী শেখর নগর, চিত্রকোট ও সৈয়দপুর গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ লোকদের হত্যা করে। ২৫ নভেম্বর সৈয়দপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধে ৯ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১১ ডিসেম্বর ধলেশ্বরী নদীর তীর ঘেঁষে এপার ওপার অবস্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে রাতভর তুমুল যুদ্ধ হয়। বেগতিক দেখে হানাদার বাহিনী মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ ক্যাম্প থেকে সব কিছু গুটিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর সকাল বেলায় শত্রুমুক্ত মুন্সিগঞ্জ শহরে হাজার হাজার জনতা গ্রাম থেকে আসতে থাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শহরের সর্বশ্রেণির জনতা শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসে।

১৯৭১ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলায় স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের তৎপরতা

১. ১৯ এপ্রিল ১৯৭১ : মিরকাদিমে রিকাবিবাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান কর্মী জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী। সভায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উৎখাতের সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সূত্র : দৈনিক আজাদ : ৩ মে ১৯৭১।

২. ০৯ মে ১৯৭১ : পাক হানাদার বাহিনি মেজর জাবেদের নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ শহরে প্রবেশ করে। তাদেরকে জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সূত্র : পূর্বদেশ, ১২মে, ১৯৭১।

৩. ১১ মে ১৯৭১ : প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টঙ্গিবাড়ী ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মজিবর রহমান মল্লিক, আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ্ব তাহের আহমদ ও সদস্য আঃ সামাদ, টঙ্গিবাড়ি ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব সিরাজুল ইসলাম মল্লিক এবং আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীকে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নিয়োগ করা হয়। সূত্র : দৈনিক আজাদ, ১৬ ও ২২ মে, ১৯৭১।

৪. ১৮ মে ১৯৭১ : বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নে শান্তিকমিটি গঠন :

শ্রীনগর : আহ্বায়ক- জনাব সৈয়দ আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারি- জনাব নজরুল ইসলাম, সহ- সেক্রেটারি- জনাব এ.কে খান।

বাড়ৈখালী : আহ্বায়ক- জনাব এ জলিল খান, প্রচার সেক্রেটারি- জনাব এ.বি.এম সিদ্দিক, সহকারী সেক্রেটারি- জনাব রোস্তম মিয়া।

হাসারা : আহ্বায়ক- জনাব রিয়াজ উদ্দিন মিয়া।

ষোলঘর : আহ্বায়ক- জনাব দেলোয়ার হোসেন।

বাঘরা : আহ্বায়ক- জনাব তোফাজ্জল হোসেন।

আটপাড়া : আহ্বায়ক- জনাব মাহবুবুর রহমান।

তন্তর : আহ্বায়ক- জনাব আব্দুল করী।

কুকুটিয়া : আহ্বায়ক- জনাব আমিনুল হক মৃধা।

কোলাপাড়া : আহ্বায়ক- ডা. ফজলুল হক।

শ্যামসিদ্ধি : আহ্বায়ক- জনাব আঃ বাছির মিয়া।

রাঢ়ীখাল : আহ্বায়ক- জনাব আব্দুল মান্না।

পাটাভোগ : আহ্বায়ক- জনাব সৈয়দ শাহ্আলম। দৈনিক আজাদ : ২১মে ১৯৭১।

৫. ১৯ মে ১৯৭১ : স্থানীয় মোখতার বার লাইব্রেরি হলে জনাব আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরীর নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাক-সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। সূত্র : দৈনিক আজাদ, ২১ মে, ১৯৭১।

৬. ১৫ জুন ১৯৭১ : টঙ্গিবাড়ী থানার বাহেরক কামারখাড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটি এক সভার মাধ্যমে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন

www.pathagar.com

এবং দেশের সংহতি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করা হয়। ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক রুস্তম আলী হালদার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সূত্র : দৈনিক আজাদ: ১৬ জুন ১৯৭১।

৭. ২০ জুন ১৯৭১: রিকাবীবাজার শান্তি কমিটির উদ্যোগে এক জনসভায় পাকিস্তানের অখন্ডত্ব রক্ষার সংকল্প ঘোষিত হয়। আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন রিকাবি বাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়ক জনাব আজিজ মাস্টার, জনাব দুদু মিয়া, জনাব নুরুল হক বেপারী, মিরকাদিম মহাজন সমিতির সম্পাদক জনাব মোঃ মোসলেম মিয়া। মোসলেম মিয়া বলেন, 'আমরা পাকিস্তান পাইয়াছি বলিয়াই এই বন্দরে আজ মুসলমান ব্যবসায়ী হইতে পারিয়াছি নতুবা এই বন্দরে একজন মুসলমান ব্যবসায়ীও থাকিতে পারিত না।' সূত্র : দৈনিক আজাদ: ২৮ জুন, ১৯৭১।

সহায়ক গ্রন্থ : একাত্তরের দালালনামা, ইফতেখার আমিন, শব্দশৈলী, ফেব্রুয়ারি-২০১১।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন : বধ্যভূমি ৩টি, স্মৃতিস্তম্ভ ৩টি, গণকবর ১টি।

ড. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

বৌদ্ধ আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, আচার্য শীল ভদ্র, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, অঙ্কশাস্ত্রবিদ সোমেশ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনী নাইডু, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুনির্মল বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সৈয়দ এমদাদ আলী, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকান্ত চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন দাস, মোশারফ হোসেন, গওহর জামিল, ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, চাষী নজরুল ইসলাম, ড. মিজানুর রহমান শেলি, ইমদাদুল হক মিলন প্রভৃতি বিশিষ্টজন।

বিসি চ্যাটার্জী

বিসি চ্যাটার্জীর পূর্ণ নাম বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী। তিনি বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন। পাঁচগাও গ্রামে তাঁর ভবনটি আজও ভগ্নাবস্থায় রয়ে গেছে। তিনি বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার বাদী সন্ন্যাসী রাজার পক্ষে মামলা পরিচালনা করে জিতেছিলেন। একারণে বাংলাদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিলাত গিয়েছিলেন বলে গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে বয়কট করেছিল। সমাজে উঠার জন্য গ্রামের দীনেশ ব্যানার্জীর মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে তাঁদের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান চেয়েছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণভোজনসহ উপহার সামগ্রী প্রদানের বিধান দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দিনে বিসি চ্যাটার্জী তাঁর বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজের বিশাল আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজপ্রধানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। বিসি চ্যাটার্জী মনের কষ্টে খাবারদাবার ও উপহার সামগ্রী মাটিচাপা দিয়ে দেশত্যাগী হন। আর কখনও গ্রাম-মুখো হন নি। দীনেশ ব্যানার্জী বিসি চ্যাটার্জীর পক্ষ হয়ে কথা বলেছিলেন বলে তাঁকেও দু'বছরের জন্য বয়কট দন্ডভোগ করতে হয়েছিল। পরে প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁকে জাতে উঠতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

পটশিল্পী শম্ভু আচার্য্য

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রিকাবিবাজার ইউনিয়নে কালিঞ্জীপাড়া গ্রামে খ্যাতিসম্পন্ন পটশিল্পী শম্ভু আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ ২৯ পৌষ ১৩৬২ বাংলা। বাবা স্বর্গীয় সুধীর চন্দ্র আচার্য্য, মা কমলা বালা আচার্য্য। তাঁর পরিবার প্রায় ২৫০ বছর যাবত বংশ পরম্পরায় পটচিত্র অঙ্কনের সাথে জড়িত।

শম্ভু আচার্য্যের একটি পটচিত্র

ঢ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফেদু বয়াতি ও আলাউদ্দিন বয়াতি

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার বাসুদিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ফেদু বয়াতি। তাঁর বহু শিষ্য বিক্রমপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তাদের কণ্ঠে আজও গুরুর বহু গান গীত হয়ে থাকে। ফেদু বয়াতির একটি বিখ্যাত গান—

আকাল দেইখ্যা মনোদুঃখে ভাবি তাই
ফেদু বলে ব্রহ্মাণ্ডলে এমুন আকাল দেখি নাই।
হাউল্যা জাউল্যা মুদি চটকী
পয়সা চাইলে মারে ভেটকী
মুখটা করে গরুর পুটকী
দেখলে উটকি আসে ভাই।
ব্রহ্মাণ্ডলে এমুন আকাল দেখি নাই।

ফেদু বয়াতির যোগ্য শিষ্য ছিলেন টঙ্গিবাড়ি থানার হাঁসাকিড়া গ্রামের আলাউদ্দিন বয়াতি। বাউল, শরিয়তি, মারফতি, জারি-সারি ইত্যাদি গান গেয়ে তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বয়াতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আলাউদ্দিন বয়াতির দেহতত্ত্ব বিষয়ক একটি বিখ্যাত গান

www.pathagar.com

আমার এই দেহ ঘড়ি, সন্ধান করি, কোন মিস্তরি বানাইয়াছে।
একদিন চাবি মাইরা দিল ছাইড়া জনম ভইরা চলিতেছে।

আলাউদ্দিন বয়াতি ১৯৭৪ সালে মারা যান।

মারফত আলী বয়াতি

টঙ্গিবাড়ি উপজেলার আউটশাহী গ্রামের প্রখ্যাত বয়াতি ছিলেন মারফত আলী। তিনি মূলত আধ্যাত্মিক গানের শিল্পী। তিনি অসংখ্য গানের রচয়িতা ও সুরকার। তিনি অন্ধ ছিলেন এবং ১০৫ বছর বয়সে মারা যান। ফেদু বয়াতি ও মারফত আলী বয়াতির কবি গানের লড়াই বিক্রমপুর অঞ্চলে কিংবদন্তি হয়ে আছে। তাঁর ছেলে মেয়ে নাছিমা আক্তার, আমির হোসেন, আনোয়ার হোসেন, নজরুল ইসলাম বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান পরিবেশন করে পিতৃঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। মারফত আলী বয়াতির একটি গান–

কালীর উপর শ্মশান কালী
আমার নামটি মারফত আলী।
মারফত আলী যারে ধরে
ছয় মাস ভোগায় কালজ্বরে,
ঘোলা পানি খাওয়াইয়া ছাড়ে
চেকভ্যাগা দা মাইর খাওয়ায়
ফেদা তুই চিনলি নারে।

আবদুস সাত্তার মোহন্ত

লৌহজং উপজেলার বেজগাঁও গ্রামে আবদুস সাত্তার মোহন্ত (বয়স ৭০) মুর্শিদি গীতি নিজে লেখেন এবং নিজেই এককভাবে গেয়ে থাকেন।

আব্দুল হালিম বয়াতি

আব্দুল হালিম বয়াতির (বয়স ৬০) জন্ম লৌহজং থানার মেদিনী মণ্ডল গ্রামে। তিনি মূলত ভাবগীতি গেয়ে থাকেন।

মো. নূরুল ইসলাম আজাদ

মো: নূরুল ইসলাম আজাদ (বয়স ৬০) লৌহজং উপজেলার কলারবাগ গ্রামের অধিবাসী। তিনি মূলত আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন এবং গেয়ে থাকেন। তিনি জিকির মজলিশে ও গান করে থাকেন।

গজারিয়া উপজেলার **মো. আক্কাস আলী মোল্লা (বয়স ৫৫), রজত আলী, আব্দুস সাত্তার, আলী মিয়া ফকির, রবিউল আউয়াল** আধ্যাত্মিক গান ও বাউল গানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সাধক গণি মুন্সী

গণি মুন্সী ফরিদপুরের অন্তর্গত শরিয়তপুর জেলার সুরেশ্বর গ্রামের জানশরীফ মাওলানার মুরিদ ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিরাজদিখান উপজেলাভুক্ত ইছাপুরা ইউনিয়নের কুসুমপুর

www.pathagar.com

গ্রামে। পীরের মুরিদ হওয়ার পর তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মুখে মুখে অনেক গান রচনা করেন। তাঁর অনেক গান সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। পীরের প্রতি তাঁর ছিল খুব ভক্তি ও বিশ্বাস। মৃত্যুর পর তাঁকে দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে দাফন করা হয়। কারণ, মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়ে ছিলেন যে, আমার পীরের বাড়ির দিকে পা দিয়ে যেন আমাকে দাফন করা না হয়। কুসুমপুর থেকে শরিয়তপুর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তাঁর মাজারে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেলায় তাঁর রচিত গানগুলো ভক্তি সহকারে গীত হয়। তাঁর নাতি রব মস্তান এ মেলার আয়োজন করে থাকেন।

কৃষ্ণবাউল চিত্ত

মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ইদ্রাকপুর গ্রামের কৃষ্ণবাউল চিত্ত (বয়স ৪৫) ভবগীতি মুর্শিদী, মারফতি ইত্যাদি গেয়ে থাকেন। বরিশালের ওস্তাদ মোহন্ত তাঁর গুরু।

বাউল মো. শফিক

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার বাউল মো. শফিক (বয়স ৬৫) মুর্শিদি, মারফতি ইত্যাদি গেয়ে থাকেন। তিনি 'অপূর্ব অপেরা' নামে একটি যাত্রাদল গড়ে তুলেছিলেন।

আকমল হোসেন দয়াল

সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের আকমল হোসেন দয়াল (বয়স ৬০) বাউল, মুর্শিদি, বিচ্ছেদি ইত্যাদি গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গুরু ছিলেন বাউল মকসুদ আলী সাঁই।

আব্দুল খালেক বয়াতি

টঙ্গিবাড়ি উপজেলার আড়িয়ল ইউনিয়নের সিংহের নন্দন গ্রামের প্রবীণ সংগীত শিল্পী আব্দুল খালেক বয়াতি (বয়স ৮৫) মুর্শিদী ও মারফতি গান গেয়ে থাকেন। এ উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের **মো. আনিস সরকার** (বয়স ৪৫), জসলং গ্রামের **মো. লালচান বয়াতি** (বয়স ৫০) বাউল, মারফতি, বিচ্ছেদ, পালকি বেহারার গান গেয়ে থাকেন।

সিরাজদিখান উপজেলার কোলা ইউনিয়নে **শীতল সরকার, হানিফ বয়াতি, খালেক বয়াতি, আক্কাস বয়াতি** দলবলসহ বাউল গান গেয়ে থাকেন। এছাড়া **শাহানারা পারভীন (৪০), লীনা ইয়াছমিন ও ফেরদৌসী কুইন** বিয়ের গান গেয়ে থাকেন। মালখানগর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন সরকার ভবগীতি গেয়ে থাকেন।

ণ. প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ

প্রাচীন সমতটের রাজধানী ছিল শ্রী বিক্রমনিপুর বা বিক্রমপুর। বর্তমান রামপাল, রঘুরামপুর, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো এই রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এলাকাটি পাল, সেন, চন্দ্র ও বর্ম প্রভৃতি রাজবংশের রাজধানী ছিল বলে ঐতিহাসিকগণের অভিমত। এই ধারণা থেকেই ২০১১ সালে 'অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন' নামক একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এই এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক

www.pathagar.com

খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে খনন কার্যটি পরিচালিত হচ্ছে। ঐতিহ্য অন্বেষণ ও জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যৌথভাবে কাজটির বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে। 'অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের' সভাপতি নূহ-উল-আলম লেনিন প্রকল্পটির পরিচালক এবং অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এর গবেষণা পরিচালক। ঢাকা ও জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একদল ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় ইতিহাসপ্রেমী যুবসমাজ নিরলসভাবে খনন ও অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। রঘুরামপুর গ্রামে খননকার্যের ফলে এমন সব প্রাচীন স্থাপনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাতে সহজেই অনুমিত হয়, এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার বা মন্দির ছিল। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাস্তুভিটার অদূরে যদি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়, বিক্রমপুরের ইতিহাস নতুন করে লিখিত হবে বলে পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

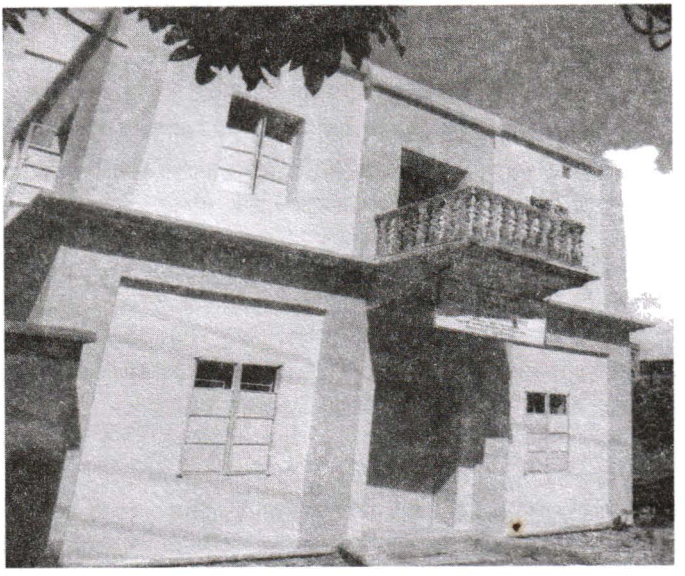

ইতিহাস-ঐতিহ্য-প্রত্নতত্ত্ব-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, মালপাড়া

তথ্যনির্দেশ

১. মুন্সিগঞ্জ পরিচিতি, জেলাপ্রশাসন, মুন্সিগঞ্জ ২০০৩
২. বিক্রমপুর রামপালের ইতিহাস, কমল চৌধুরী সম্পাদিত
৩. আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো
৪. বাংলাদেশের জেলা, উপজেলা ও নদ-নদীর নামকরণের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ আমীন
৫. মুন্সিগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭;
মুন্সিগঞ্জ জেলার উপজেলাসমূহের সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছে বাংলাদেশের মানুষ। ফলে এই জাতিসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদানের মাধ্যমে লোকসাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে। জাতিসমূহের ভাব বিনিময় ও সংস্কৃতিক উপকরণের বিনিময় ব্যতিরেকে লোকসাহিত্য বিকশিত হয় না। বাংলাদেশের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি। এই লোক সংস্কৃতিরই অংশ মৌখিক সাহিত্য। আর মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লোক গল্প, লোক কাহিনি, কিস্‌সা, কিংবদন্তি, লোকছড়া ইত্যাদি।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/ কিসসা

লোকগল্পের উৎস সংশ্লিষ্ট জনপদের সমাজ, পরিবেশ ও মানবগোষ্ঠী। এর স্রষ্টা সাধারণ মানুষ আবার উপস্থাপিত হয় সাধারণের সামনে। লোকগল্প সম্পর্কে শামসুজ্জামান খান লিখেছেন, "লোকগল্প বিশ্বমানবের এক অনন্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আদিম স্তর থেকে নানা পর্যায় অতিক্রম করে বেড়ে ওঠার মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীগত অভ্যাস, সংস্কারগত উপাদান, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা এবং চিন্তন-প্রক্রিয়া তথা বিশ্বদৃষ্টিকে বুঝাবার জন্য লোকগল্প আমাদের এক মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য অন্তদৃষ্টি দিতে পারে।"[১] অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জনপদের অধিবাসীদের জীবনাচরণ, চিন্তন, উপলব্ধি ইত্যাদি সন্ধান পাওয়া যায় লোকগল্প সমূহে। লোককাহিনি মানুষ মুখে মুখে লালন করেছে এবং এভাবেই শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করেছে।

হরজালার পরস্তাব

অব্যামালের বইনেরে জোর কইর‍্যা নিয়া বিয়া কইর‍্যা হালাইছে। জোর কইর‍্যা নিয়া বিয়া করছে, বিয়া করছে যহন অহনে মায়েরে কয়, হস্টির দিন জামাই-জনদের নেমন্তন করি, জামা-কাপড় দেই, বরি ধান দূর্বা দিয়া। এরপর অব্যামালে কয়, 'মাগো আমাগো নাকি বইন আছে?'

'হ-বাবা তর বইন আছে বিপুলা সুন্দর, কাইর‍্যা নিয়া বিয়া করছে জিরাধন মণ্ডল।'

'আমার বইনেরে কি আমি আনতে পারুম?'

'না বাবা, এ জীবনেও পারবি না, বিয়া হইছে পর তারে আনতে যাইও নাই, তারাও দেয় নাই। তুই বাবা পারতি না।'

'হ, আমি পারুম।'

---

১ শামসুজ্জামান খান, 'লোকগল্প ও সমাজ', আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬৫

www.pathagar.com

'তুই যদি পারস, তবে তর হমাইন্যা হমাইন্যা পোলাপান লইয়া গিয়া মাঠের মইধ্যে যুদ্ধ কর। যদি যুদ্ধ কইর‍্যা জিত্যা জয় কইর‍্যা আইতে পারস, তয় মনে করুম যে তুই তর বইনেরে আনতে পারবি।' ছেরা গো লইয়া তহন মাঠে যুদ্ধ করতে গেছে, যুদ্ধে জয় কইর‍্যা জিত্যা আইছে। অব্যামালে কয় 'মা এক মন চাউলের ভাত রাইন্ধিও না করিও ফেনা– বইনের বাড়ি ভাইয়ে যাইব না করিও মানা।'

মা একমন চাউলের ভাত রানছে ফেনা গলে নাই। খাইয়্যা বন্ধু-বান্ধব লইয়া যাইতাছে। আদা রাস্তা গেছে পর ছেরারা কয়, 'কিরে বইনের বাড়ি যাস কিছু নিবি না?' কয়, 'কি নিমু আমি কি জানি?'

'যেরে মনে কয় তর হেরে নে।' শুইন্যা হাটে গিয়া একটা চুনের পাইলা কিনছে, কিন্যা হেইডার মধ্যে চুন ভিজাইয়া ক্ষিরা বানাইয়্যা লইয়্যা গেছে। আবার কতদূর গিয়া কয়, 'আর কিছু নিবি না?' কয়, 'আমি না তরা ল।' চকের মধ্যে দেখে একটা ভিমরুলের বাসা– বাসাডা পাইর‍্যা পান-জর্দা পেচাইয়া কাডলের মত কইর‍্যা লইয়্যা গেছে। তহন যাইতে যাইতে দেহে বইনের জামাইর বাবায় আর মায় খেত নিড়ায়। 'ওনারা যহন খেত নিড়াইতেছে, তয় ল এহান দিয়াই যাই।' গিয়া কয়, 'মাঐমা, ছোড-মোড একটা কাডল আনছি, আপনি বাইত গিয়া ঘরের দুয়ার লাগাইয়া কাডলডা খাইয়েন একলা।' মাঐ করছে কি– ত্বরা কইর‍্যা বাড়িত গিয়া দুয়ার না লাগাইয়্যা চাদরডারে খুলছে আর ভিমরুলে কামড়াইয়্যা মাঐমারে মাইর‍্যা হালাইছে। 'আর তালই মশাই, অল্প একটু ক্ষিরা আনছি, বাড়িত নিমু কিয়ারে এহানেই খাইয়্যা হালান।' হাজ হাজ চুনা ভিজাইছে, চুনাডা গরম না, মুহে দিছে আর তালই মশাই চুন খাইয়্যা হেইহানেই মইর‍্যা গেছে। তহন ছেরারা কয় 'তর মাঐরে মারছি, তালইরে মারছি, এলা ক্ষন্তা কাচিডা দিয়া গর্ত কইর‍্যা কাইচ্যা ছোবার ভিতরে কোপা দিয়া থুইয়া দে মাটি দিয়া। আর ঐ যে বড় চৌচালা ঘরডা দেহা যায়, ঐ বাড়িডায় তুই যাবি, গিয়া দেখবি তর বইনের একটা ননদ আছে, গিয়া ঘর থাইক্যা টান দিয়া বার কইর‍্যা ওছরার তলে খাড়া কইর‍্যা মাথায় জল দিয়া বিয়া কইর‍্যা হালাইবি। এরপরে ঘরে গিয়া হানবি।' এন কালে বইনের জামাই পাশের বাড়ি বইয়া ছিল। গিয়া পোলাপানে কয়, 'তোমরার বাড়ি না অতিথ আইছে?'

'কইথন অতিথ আইছে?'

কয়, 'তোমার শালায় আইছে।' কয়, 'শালায় আইব ক্যা? এই জীবনে আমার শালায় আইল না, বিয়া করছি কেউ আইল না।'

'আরে হ, দ্যাহো গিয়া তোমার বইনেরে বিয়া কইর‍্যা হালাইছে।' হে তহন হাতের লাডিডা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়িত যাইতাছে। দেইখ্যা মনে মনে কয়, 'আমি হের বাড়ি বেড়াইতে আইছি, হে দেহি লাডি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আইতাছে, আমারে বুঝি মারব।' হে করছে কি, বা হাতে টান দিয়া ঘরের একটা খুডি উডাইয়া হালাইছে। জিরাধন মণ্ডল কইতাছে, 'অর এতবড় সাহস, আমার বাড়িতে আমার ঘরের খাম উডাইছে। আমার লগে মাইর করব। অরেত এমনে মারতে পারুম না, অরে কল-কৌশলে মারন চাইব।' কল-কৌশলে কি, এর মধ্যে খাইয়া লইয়্যা হুইয়্যা রইল। সকালে কয়, 'ল হাড যাই।'

www.pathagar.com

হাড গিয়া কামারের দোকান থিকা কয়ডা গোমাকাডা বানাইছে জলে কুইপ্যা পুইত্যা থুইব। আর একটা লোহার খাচা বানাইছে। বাজার কইর‍্যা কয়, 'বাড়িত জাইগা।' হ্যাসে হালারে লইয়া বাড়িতে আইছে। বাড়িতে আইছে মতন রান্দা-বাড়া হইছে। অহনে কয়, 'ল ছান করতে যাই।' ছান করতে গিয়া জলে নামছে। যে কাডা কুইপ্যা থুইয়া আইছে, কাডার মধ্যে হালারে গিয়া হালাইয়া দিছে। হালায় আধা জল আধা উচে পইড়্যা রইছে।

অহনে বইনে কয়, 'কি গো, তুমি ছান কইর‍্যা আইলা, ভাইয়ে কই?'

'তোমার ভাইয়ে আমাদের নদীডা কত বড় আইট্যা আইট্যা দেখতাছে।' বইনে আর ভাত খাইতে যায় না। হে ত ভাত টাত খাইয়্যা উঠছে। বইনে চিন্তা করতাছে, আমার ভাই চিনে না কিছু, নতুন আইছে, আমার ভাইয়েরে একলা গাঙ্গে থুইয়া আইছে। সন্ধ্যার সময় শ্রী কৃষ্ণ ভগবানে কইতাছে, 'এই বাচ্চাডা কার, এই জলে পইড়্যা রইছে, কেউত বিচরায় না, তয় আমি উডাইয়া দেই।'

হে উডাইয়্যা টান গিয়া কাডাডা খোয়াইয়্যা কয়, 'যাইগ্যা।' হে আইয়্যা পড়ছে। অহনে বইনের জামাই হুনল– হে যে কথা কইয়্যা আইছে, অয়ও হেই কথা কইল। বইনে কয়, 'কিরে ভাই কই আছিলি।'

'তোমাদের নদীডা কত বড় হাইট্যা দেইখ্যা আইলাম।'

'আয় ভাত খাই আয়।' হ্যাশে ভাত খাইছে। বইনের জামাই মনে মনে কয়, 'কী রে মরল না দেহি, বিষাক্ত কাডাডা দিলাম, মরল না, তয় কাউলকা মরব।' কাউলকাও রান্না-বান্নার পর দুই জন ছান করতে গেছে। গিয়া হাত পা ভাইঙ্গা ডলামলা কইর‍্যা লোহার খাঁচাত না ভইর‍্যা তালা দিয়া গাঙ্গের মইধ্যে ফালাইয়্যা দিছে। 'আইজ গা হালায় আর বাঁচত না।' হে গেছে পর বইনে কয়, 'কী গো আমার বাইয়ে কই।'

কয়, 'তোমার বাই আমাগ নদীডা কত বড় সাঁতার কাটতাছে।'

'সাঁতার কাটতাছে? অরে একলা থুইয়া আইলেন?'

কয়, 'হের কিছু অইত না।' আজকেও সন্ধ্যা অইয়া যাইতাছে। আজকেও ভাইয়ের খোঁজে কেউ আইতাছে না।

হেই ভগবান আবার কইতাছে, 'কাউলকাও জলের তলে আছিল কেউ নেয় নাই, বিচরায় নাই, আমিই উডাইয়া দিছি।' হে জলের তলে থনে খাঁচাডা উডাইয়া তালাডা খুইল্যা কয়, 'বাড়িত যা।' হ্যাসে খাঁচাডা হালাইয়া দিছে জঙ্গলে। হেই খাঁচাডারে ছেরা আইন্যা গুজাইয়া থুইছে। তয় বইনে কয়, 'ভাই কই গেছিলি?'

কয়, 'বইন তোমাগ নদীডা কত বড় আমি সাঁতার কাটলাম।'

'সাঁতার কাটলা, ভাই তুমি যে বেড়াইতে আইছ, তুমি যে সাঁতার কাটতে যাও, তুমি বড় নদী হাইড্যা বেড়াইতে যাও, আরানি গেলে গা?' কয়, 'না বইন কিছু অইত না।'

'হালায় আউজক্যাও মরে নাই, যা! আমি বাড়িত থাকুম না কামে যাইগা।' তহনে জিরাধন ম-লে খেতে গেছে গা। এর মধ্যে বইনে ভাইয়েরে জিগায়, 'কিয়ারে আইছ?'

'তরে নিতে আইছি।'

www.pathagar.com

কয়, 'তুই আমারে নিতে পারতি না।'

কয়, 'কিল্লিগা?' কয়, 'আমারে ত বিয়া দিছে, এর পড়ত বাপ মা কেউ আহে না, আমারে দেহেও না, তুই ভাই বাড়িত যাইগ্যা।'

কয়, 'না তরে থুইয়া যাইতাম না।'

'তয় আমারে থুইয়া যদি না যাস, তয় ল আমরা দুই ভাই বইনে বাইন দুয়ারে গিয়া যুদ্ধ করি। যুদ্ধ কইর‍্যা তুই যদি আমার সিঁথির সিন্দুরের অর্ধেক তরোয়াল দিয়া কাইট্যা নিতে পারস, তয় মনে করুম তুই আমারে নিতে পারবি।'

তহন ভাই বইনে বাইন দুয়ারে গিয়া যুদ্ধ করতাছে। এই ফাঁকে করছে কি, অর্ধেক সিন্দুর তরোয়াল দিয়া কাইট্যা লইয়্যা গেছে গা। বলে, 'ভাই থাম।' ভাই কয়, 'আমি তরে নিতে পারি, তয় তারাতারি ভাত বহা।' ভাত বহাইয়্যা রানছে বাড়ছে। ভাই বইনে খাইয়া খাড়াইছে। এমনকালে বইনের জামাই খেত থিকা কাজ কইর‍্যা বাড়িত আইছে। তারে ফালদা না ধইর‍্যা দলা-মলা কইর‍্যা ঐ যে খাঁচডায় ভরছিল হেইডার মইধ্যে বইনের জামাইরে হান্দাইয়া দিছে।

বইনে কইতাছে আর কানতাছে, 'ভাই তুই আমারে একেবারে রাঢ়ি করিস না, আমার সিঁথির সিন্দুর একটু রাইখ্যা দে, মারিস না, এই মনে কইর‍্যা থুইয়া যা ভাই, চিরজীবন ভইর‍্যা আমারে মাইনষে কাঞ্চা রাঢ়ি কইব।' এই কথা কইছে মতন ভাইয়ে আর মারে নাই। খাঁচার মইধ্যে ভইর‍্যা একটা আইচার মইধ্যে কয়ডা খুদ দিল, আর একটা আইচার মইধ্যে একটু জল দিল। তারপর খাঁচাডা বেড়ার মইধ্যে টাঙ্গাইয়া থুইয়্যা কয়, 'বইন লও।' হেষে একটা ঘোড়া আনছে। ঘোড়াডার মইধ্যে ওঠছে, ঘোড়াডা চালু দিছে। চালু দিছে মতন ঘোড়াডা আর আডে না। টেগর টেগর কইর‍্যা আডে আর ছেরাডা কেবল বাইর‍্যায়। 'ভাইরে তুই ঘোড়াডারে বাইর‍্যাস কেন?'

'বইন ঘোড়াডার খাজলি হইছে, পোকে কামড়ায়, আডে না, তাই বাইর‍্যাই।'

কয়, 'তুই ঘোড়াডা থামা।' ঘোড়াডা থামাইছে মতন বইনে পান-টান হাজাইয়া খাইল। খাইয়া ঘোড়াডারে পানের পিকগুলি দিল। দিছে মতন পোকাগুলি মরল। মরছে মতন ঘোড়া যে দৌড় দিছে, দৌড়ের ঠেলায় বইনের দশ মাসের বাচ্চা ছিল পেডে, যাইতে যাইতে বইনের প্রসব ব্যাথা উইঠ্যা গেছে। উইঠ্যা গেছে পর অহনে বইনে কয়, 'ঐ যে একটা জঙ্গল দেহা যায়, ঐ জঙ্গলডার ভিতরে ঘোড়াডা ঢুকাইয়্যা তুই একটু আশে পাশে আইট্যা আয়।'

ভাইয়ে আশে পাশে আটতে বাড়াইছে। এই কালে একটা বাচ্চা অইছে। বাচ্চাডা অইছে মতন অরে ডাক দিছে, 'ভাই তুই একটু আয়, তুই ওরে একটু ল, আমি ময়লাডা নদীর ঘাটে ধুইয়া আহি।' ভাইয়ের কোলে দিয়া গেছে। ভাইয়ে কোলে লইয়া বইয়্যা রইছে।

বাচ্চাডা কয়, 'হালার ঘরে হালা, আমার বাপেরে না মাইর‍্যা, মায়েরে লইছ কাইর‍্যা, এক্কেবারে চটকানা দিয়া দাঁত হালাইয়্যা দিমু।'

অব্যামাল মনে মনে কয়, 'এই বাচ্চা বাইচ্যা থাকলে আমা গ মামা বংশই শেষ। অরে একডা আছাড় দিয়া মাইর‍্যা হালামু।' উপরে যেই না আলগাইছে আছাড় আর

www.pathagar.com

দিতে পারে নাই। আকাশে উইট্যা গিয়া বিজুলি ছটক হইয়া গেছে। ঐ যে বৃষ্টি নামলে যে খাড়া জিলিক মারে, ঐডার নাম অইছে বিজুলি ছটক। বিজুলি ছটকটা শয়তান। এই বিজুলি ছটকটারে দেখলে মুসলমানে কয় 'আল্লাহু'। আল্লাহু কইলে যতদূর পর্যন্ত যায় ততদূর পর্যন্ত ঠাডা পড়ে না। আর হিন্দুতে কয় 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে রাম হরে কৃষ্ণ'। রাম নামের দোহাইডা যতদূর যাইব ঠাডাডা ততো দূরেই থাকব। আমাগো সামনে আর আমাগো শইলে পড়ত না। ঐ খাড়া জিলিকটা দিলেই আমরা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কই।'

এরপর বইনে আইছে হাত পা ধুইয়্যা। বইনে কয়, 'কিরে ভাই অয় কই?'

'বইন তোমার কাছে আমি সত্য কতা কই, অয় কয় কি, 'হালার ঘরে হালা, আমার বাপেরে না মাইর‍্যা, মায়রে লইছ কাইর‍্যা, এক্কেবারে চটকানা দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিমু। এই কথা হুইন্যা আমার গায়ে এমন রাগ উইট্যা গেছে, অরে আছাড় দিতে লইয়া উপরে আলগি দিছি, কই গেছে আমি জানি না। অয় কয়, 'আমার নাকি দাঁত হালাইয়্যা দিব।'

ওছরা= চালের সনছা, বিচরায়= তালাশ করা, কাইচ্যা ছোবা= এক ধরনের ঘাস, বাইন দুয়ার= পেছনের দরজা, কাঞ্চারাড়ি= অল্পবয়সী বিধবা।

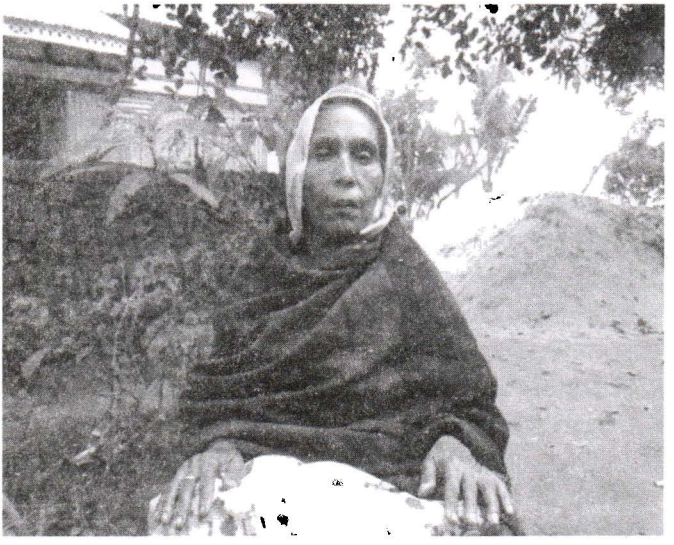

গল্পের কথক পার্বতী রাণী

গল্পের কথক–পার্বতী রাণী, বয়স-৭২, স্বামী- মনীন্দ্র চন্দ্র বাড়ৈ, গ্রাম- পূর্ব শিলমন্দি, থানা- মুন্সিগঞ্জ, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

এই গল্প শুনলে নাকি খুঁজলি, পাঁচড়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ সারে। গল্প শুনতে হলে পান, সুপারি, খর ও সাদা পাতা দিতে হয়। কথক পান চিবান আর গল্প বলতে

www.pathagar.com

থাকেন। পানের পিক রোগীর ক্ষতের মধ্যে ছিটিয়ে দেন। এতে রোগ ভাল হয়ে যায় বলে মনে করা হয়।

যেই দামে কিনা হেই দামে বিক্রি
লাভের মধ্যে তিন মুরগি

এক চোরায় চুরি কইরা পলাইতে লইছে। লোকেরা টের পাইয়া পিছনে দিছে ধাওয়া। চোরে বেগতিক দেইখা চোরাই মাল ফালাইয়া দিয়া দিছে দৌড়। কিছু দূর যাওনের পর দেহে গাছ তলায় একটা ঘোড়া বান্দা আছে। চোরায় ভাবলো এই ঘোড়াডা লইয়া ঘোড়ার উপরে উইঠা পলাইয়া যাই। নাইলে লোকেরা দৌড়াইয়া ধইরা ফালাইবো। ঐ দিকে লোকেরা চোরাই মাল রাস্তায় পাইয়া আর চোরের পিছনে দৌড়ায় নাই। তারা চোরাই মাল লইয়া বাড়িতে ফিরা গেছে। এই দিকে আরেক চোর তিনডা মুরগি চুরি কইরা পলাইতে লইছিল। সে পিছন ফিরা দেখে একটা লোক ঘোড়া দৌড়াইয়া আইতেছে। সেও মনে করছে আমারে ধরার জন্যই ঘোড়া দৌড়াইয়া আইতাছে। এই মুরগি চোরা বোঝে নাই যে ঐ টাও চোর; ঘোড়া চুরি কইরা পলাইতাছে। মুরগি চোরায় মনে করছে ঘোড়ার লগেতো আর দৌড়াইয়া সারন যাইবো না, ধরা পরলে কারবার শেষ। তাই হাতের মুরগি ফালাইয়া দিয়া অন্য দিকে দৌড় দিছে। ঘোড়া চোরায় দেখলো ঘোড়া লইয়া ধরা পড়লে খবর আছে। তার চাইতে ঘোড়া ছাইরা দিয়া এই মুরগি তিনটা লইয়া যাই। মাইনষে মনে করবো বাজার থাইকা কিন্না আনছি। যেই কথা সেই কাজ।

ঘোড়ার পিঠের থন নাইম্মা চোরায় তিন মুরগি লইয়া হাটা শুরু করল। চোরায় তখন মুরগি লইয়া হাইট্টা যায়। রাস্তার লোকেরা জিগায়, ভাই মুরগি তিনটা কত হইলো? এখন চোরায় কী দাম কইবো? কারণ, মুরগি তো চুরি কইরা আনছে। তখন চোরায় বুদ্ধি খাটাইয়া কয়, 'যেই দামে কিনা হেই দামে বিক্রি; লাভের মধ্যে তিন মুরগি।' কথায় কয়, 'চোরের বুদ্ধি খোরে খোরে।' মাইন্সে যেন মনে করে লোকটা মুরগি বেইচ্চা এই তিন মুরগি লাভের মধ্যে পাইছে। কিন্তু সেই দামে কিন্ন্যা সেই দামে বিক্রি করলেতো তিন মুরগি থাকার কথা না। আসল কথা হইলো প্রথম চুরি করা মাল ফালাইয়া লইছে ঘোড়া, আবার ঘোড়া ফালাইয়া লইছে মুরগি। কোনোটাতেই চালান খাটে নাই। ফাওয়ের মধ্যে তিন মুরগি পাইলো। এই জন্য কইছে। যেই দামে কিনা হেই দামে বিক্রি, লাভের মধ্যে তিন মুরগি।

দ্রোন ভুঁই চাষ, ষোল বলদের ঘাস
চাইর আঙ্গুল পিড়ি, চাইর আঙ্গুল পাত
না করলে, না দিব ভাত

এক রাজার মাইয়া বিয়া করবো ঘোষণা দিছে। তয় তার কাছেই সে বিয়া বইবো, যে তার কথা মতোন যা আদেশ করে, সেই কাজ কইরা দেখাইতে পারবো। তবে শর্ত হইলো যদি তার কথা মতোন কাজ করতে না পারে, তাইলে তার বাড়িতে চাকর

www.pathagar.com

থাকতে হইবো। রাজ্যের মধ্যে ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হইল। বড় বড় রাজার পোলারা তারে বিয়া করনের আশায় তার বাড়িতে গিয়া জমা হইতে লাগলো। এর মধ্য এক কৃষকের পোলাও গেছে রাজার মাইয়ারে বিয়া করনের আশায়।

একে একে রাজার পোলারা রাজার মাইয়ার কাছে গিয়া কী করতে হইব জানতে চায়; কিন্তু কেউই রাজার মাইয়ার ফরমাইশ মতোন কাম করতে পারে না। রাজার মাইয়ায় কয়, 'এক ঘন্টার মধ্যে এক দ্রোন জায়গা চাষ দিতে হইব। তারপর ষোলটা গরু আছে রাজার। সব গরুরে এক ঘণ্টার মধ্যে ঘাস কাইট্টা আইন্না দিতে হইব। কোনো গরুর মোখ যেন কামাই না থাকে। অর্থ্যাৎ সব গরুর উরে (সামনে) ঘাস থাকতে হইব। চাইর আঙ্গুলে ফিরিতে বইয়া ভাত খাইতে হইব। চাইর আঙ্গুল পরিমাণ পাতার মধ্যে ভাত দিবো, এক বার না করলে আর ভাত দিবো না।' এ অবস্থায় কোনো রাজার পোলাই রাজার মাইয়ার শর্ত পূরণ করতে পারে না। একদ্রোন জায়গা এক ঘণ্টায় চাষ দেওয়া তো দূরের কথা তারা আধা গণ্ডাও চাষ দিতে পারে না। সময় শেষ হইলে বলে, 'সময় শেষ, এখন ষোল বলদের ঘাস আনেন।' রাজার ছেলেরা ভালো ঘাস এক চাঙ্গারি এক গরুর উরে দিয়া আবার ঘাস কাটতে যায়, আইসা দেহে (দেখে) এই গরুর ঘাস খাওয়া শেষ। কিন্তু কোনো গরুর উরেই নির্দিষ্ট সময়ে ঘাস দিতে পারে না। তারপর বইতে দিছে চাইর আঙ্গুল পিড়ি, দামি পোশাক নষ্ট হইয়া যায় দেইখ্যা পিড়িতে বইতে পারে না উপর হইয়া বহে (বসে)। চাইর আঙ্গুল পাতা দিছে ভাত খাইতে। অল্প কয়টা ভাত নিছে মাটিতে ভাত পইরা যায় দেইখা তা নাড়াচাড়াও করে না, ভাত দিতে চাইলে একবার না করলে আর ভাতও দেয় না। এই ভাবে একে একে সব রাজার পোলারা তার শর্ত পুরন করতে না পাইরা রাজার বাড়ির চাকর হইল। শেষমেষ আইল চাষার ছেলের পালা।

চাষার ছেলে প্রতিযোগিতা কইরা রাজার মাইয়ারে বিয়া করতে আইছে দেইখা রাজার কর্মচারীরা বলে, 'কত রাজার পোলা চাকর খাটতাছে মিয়া আর তুমি আইছ চাষার ছেলে হইয়া রাজার মাইয়া বিয়া করতে।' চাষার পোলা মনে মনে কয়, 'না পারলে রাজার বাড়িতে চাকর খাটুম এইটাইবা কম কিসের। কন দেহি কি করতে হইব?'

প্রথমে হাল গরু দিছে জমি চাষ করতে। রাজার পোলাগো হেই জমির আইলের কিনার ধইর‍্যা চারদিকে একবার লাঙ্গল চালাইয়া তার উপর দিয়া ঘুরাইয়া মই দিছে মুহূর্তের মধ্যে। তার পর চাষার ছেলে বলে, 'এই যে আপনের চাষ, আর এই যে, আপনের মই। কাম বুইজ্জা নেন। এরপর কি করতে হইব কন দেহি।'

তারপর ঘাস কাটার পালা। চাষার ছেলে দেখল ভালো ভালো ঘাস কাইট্টা ষোলটা গরুরে একটু সময়ের মধ্যে দেওন সম্ভব না। রাজার বাড়ির পুকুইরের দিকে চাইয়া দেহে পুকুইরে কচুরি আর দল ঘাস ভরা। সে পানিতে নাইম্মা কচুরি আর দল ঘাস পাজা পাজা ষোল গরুর উরে দিয়া দিছে। কোনে গরুর উরই খালি নাই, সবগরুর মুখই চালু আছে। আবাজাবা ঘাসতো গরুতে তাড়াতাড়ি খাইতে পারে নাই, তাই সব গরুর উরেই ঘাস রইয়া গেছে। এখন চাষার ছেলে কয়, 'দেখেন, কাজ দেখেন, সব

www.pathagar.com

গরুর উরেই ঘাস আছে। আর সব গরুর মুখই চালু আছে। এরপর কী করতে হইব কন।' তখন রাজার লোকেরা বলে, 'হাত মুখ ধুইয়া আহেন, এখন ভাত খাইতে দিব।' খাইতে গেছেপর চাইর আঙ্গুল পিড়িতে ভাত খাইতে দিছে। সে পিড়িটা কোনো মতে পাছার নিচে দিয়া মাটির মধ্যেই লেটকি দিয়া বইয়া পড়ছে। কাপড় চোপরে মাটি ভরলে ভরুক। তারপর চাইর আঙ্গুল পাতার মধ্যে খাইতে দিছে। ভাত মাটিতে পড়লে পড়ুক। সে ঐ পাতের মধ্যে ভাত লয় আর ঘাটে ভাত দেয়, তারপর বলে, 'আরো দেন।' কারণ, না করলে আর ভাত দিব না। তাই সে ঐ ভাতের উপর ভাত চায় আর ভাত ছড়ায়। কিছু মুখে দেয় আবার বলে, 'ভাত দেন।' নষ্ট হইলে রাজার ভাত নষ্ট হইবো তার কি? এই ভাবে সে ভাত চায় আর খায়। এক সময় পাতের সামনে ভাত ভুর দিয়া ফালাইছে। চাষার ছেলে উপরে উপরে খায় আর বলে আরো ভাত আনেন। রাজার লোকেরা বলে, 'আর ভাত নাই।' চাষার ছেলে এমুন চালাকি করছে যে ওগো ভাতের টান ফালাইয়্যা দিছে। চাষার পোলার কাজকর্ম দেইখ্যা রাজার মাইয়া খুব খুশি হইছে। সে ভাবছে পোলাটা খুবই চালাক চতুর। হোক সে চাষার পোলা, এমন একটা পোলাই তার দরকার। তারপর সে চাষার পোলার কাছে বিয়া বইল আর অন্য রাজার পোলারা তাগো বাড়িতে চাকর রইল।

মাঐ পুতরার কিসসা

যতই করেন হাডিবাডি, ভাত আনেন আরেক বাডি

মাঐ বাড়ি পুতরা বেড়াইতে গেছে। মাঐ পুতরারে দুপুরে ভাত খাইতে দিছে। অল্প কয়টা ভাত দিছে তরকারিও দিছে অল্প ইকটু। তয় পুতরা আছিল খুব চালাক। সে ভাবল এই তরকারি দিয়া ভাত মাইখ্যা যদি খাইয়া ফালাই তয় আর ভাত দিব না। কারণ, মাঐ খুবই কিপটা। পুতরা আইছে অহন ভাত না দিয়াও পারে না তাই অল্প কয়টা ভাত দিছে। তাই পুতরা শুধু ভাত খাইয়া পাতে তরকারি রাইখা বইসা আছে। আশা, মাত্রই পাতে ভাত না দেখলে ভাত দিব। কিন্তু মাঐ পাতে ভাত না দিয়া পুতরাকে বলে, 'আমাগো পুতরা খুবই ভালো, তরকারি বেশি খায় না, একটু তরকারি দিছি তাও পাতে রইয়া গেছে খায় নাই, দেও পুতরা তরকারিটা তুইল্লা রাখি।' পুতরা দেখলো মাঐ তো একটা চাল খাটাইলো। পুতরাও কম না। সে বলে, 'মাঐ, যততই করেন হাডিবাডি, তাড়াতাড়ি ভাত আনেন আরেক বাডি, পেট ভরে নাই।' যেমন মাঐ তেমন পুতরা।

মুরগি ও মৌমাছি

এক লোকের একটা মুরগি আছিল। বহুদিন হইয়া গেছে কিন্তু মুরগিটা আন্ডা পারে না। লোকটা ছিল খুব পাজি তাই প্রতিদিন মুরগিরে মাইর দেয়। খাওয়া বন্ধ কইরা দেয়। কিছুদিন পর আন্ডা পারা শুরু করে। তখন সে মুরগিরে খাওন দেয়। আবার মুরগিটা আন্ডা পারা বন্ধ করে। কারণ মুরগি তো সব সময় আন্ডা পারে না। মাঝে মাঝে পারে। কিন্তু লোকটা চায় প্রতিদিন মুরগি আন্ডা পারুক। কিন্তু তা তো আর সম্ভব না। কিন্তু

www.pathagar.com

লোকটা যে দিন দেখতো আন্ডা পারে নাই সেই দিনই মুরগিরে খাওয়া দিত না, মাইর দিত। বলতো, আন্ডা দিবি-না শুধু শুধু খাবি, তোর খাওয়া বন্ধ। ঝাঁটা দিয়া পিটাইয়া বাড়িরতন খেদাইয়া দিতো জমিতে। বলতো, 'ঘরের খাওন পাবি না, টোকাইয়া গিয়া খা।' মুরগিটা মাইর খাইয়া মনের দুঃখে বাড়ি ছাইরা বনে চইলা গেল। মনের দুঃখে মুরগি বনে গিয়া বেজার মুখে বইসা রইলো। এই ব্যবস্থা দেইখা মৌচাকের মৌমাছিরা বললো, 'এই মুরগি, তোমার মন খারাপ কেন?' মুরগি বললো, 'ভাই, আমি প্রতিদিন আন্ডা পারি না দেইখা আমার মালিক আমারে বাড়ির থাইক্যা খেদাইয়া দিছে। সে প্রত্যেক দিন আমারে মারে, খাইতে দেয় না। তাই মনের দুঃখে বনে চইলা আইছি।'

মৌমাছিরা কইল, 'তোমার দুঃখে আমরা দুঃখিত কিন্তু রাত্রে থাকবা কৈ? রাত্রে তো তোমারে পাইলে শিয়ালে ধইরা খাইয়া ফালাইবো। চলো তোমারে বাড়িতে দিয়া আসি।'

'কিন্তু বাড়িতে গেলেতো আমারে আবার মারবো।' মৌমাছিরা কইল, 'আমরা তোমার পাখনার নিচে লুকাইয়া থাকুম। তোমারে কিছু কইলেই আমরা তোমার পাখনার ভিতর থাইক্যা বাহির হইয়া তোমার মালিকরে কামড়াইয়া দিমু।'

তারপর মৌমাছিদের কথায় মুরগি তার মালিকের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। বাড়ির কাছে যাইতেই তার মালিক কইল, 'আবার আইছত। দূর হ আমার বাড়ি থাইক্যা। তোরে আইজ খাইছি।' এই কথা কইয়াই মুরগিরে দিছে বাড়ি। মুরগির পাখনার ভিতরে লুকাইয়া থাকা মৌমাছিরা বাইর হইয়া তার মালিকরে কামড়াইতে শুরু করল। কামড় খাইয়া মালিকের পরান যায় যায় অবস্থা। তখন সে মৌমাছিদের কইলো, 'আমারে তোমরা কামড়াইতেছ কেন?' মৌমাছিরা কইলো, 'তুমি মুরগিটারে এতো মারো কেন?'

মুরগির মালিক কইল, 'এইটায় ডিম পারে না।' মৌমাছিরা কইল, 'আরে ভাই ডিমতো আর বারো মাস পারে না। পারনের সময় হইলে এমনিতেই পারবো। ওরে মারা বন্ধ না করলে তোমারে আইজ কামড়াইতে কামড়াইতে বেহুঁস কইরা ফালামু।' এই কথা শুইন্যা পরান বাঁচানের জন্যে মুরগির মালিক কয়, 'আর আমি ওরে মারুম না। আমারে কামড়ান বন্ধ কর।' তখন মুরগি মৌমাছিরে বলল, 'আমার মালিক যখন ভুল বুঝতে পারছে তখন আর ওরে কামড়াইও না।' মৌমাছিরা তাকে কামড়ানো বন্ধ কইরা বনে চইলা গেল। অতপর মুরগিটা সুখে বসবাস করতে লাগল।

লেজ কাটা ছালি মাখা, ত্রিভুবন দেখাইছে চিলা।
যতই দেও টিবটিবানি, টিবের মর্ম আমরা জানি।

একদিন এক লোকে বড়শি বাইতে গিয়া একটা টাকি মাছ পাইছে। অনেকখুন বড়শি বাইছে আর কোনো মাছ পায় না। হের পর টাকিমাছ লইয়া বাড়িতে আইছে। বাড়িতে আইয়া তার বউরে কইল, 'একটা টাকি মাছ পাইছি এইটা কুইট্টা লও।' বউ উঠানের মধ্যে বইয়া মাছ কুটতে লইছে। মাছেরে ছালি মাইখ্যা লেজটা কাইট্টা ঠোঁট কাটতে লইছে আর তখনই একটা ঝাড়া দিয়া টাকি মাছ তার হাত খাইকা ছুইট্টা গেছে। টাকি মাছটা হাতের থন ছুইট্টা গিয়া উঠানের মধ্যে ফালাফালি করতে ছিল, এমুন সময়

www.pathagar.com

উঠানের উপর দিয়া একটা চিল উড়তেছিল। সে এক ছাঁ মাইরা টাকি মাছটারে লইয়া গেল। চিলের পাও এর থেইকা ছুটনের লাইগা টাকিটা ঝাড়া ঝাড়ি শুরু করলো। চিলটা ঐ পুকুইরের উপর দিয়া যাইতে লইছিল। এক ঝাড়া দিয়া টাকি মাছটা চিলের পাও থাইকা ঐ পুকুইরে পইর‍্যা গেল। লেজকাটা ও ঠোঁটকাটা থাকার পরও পুকুইরে পড়ার পর পরানে বাইচ্চা গেছে।

এরপর ঐ লোকটা আর একদিন ঐ পুকুইরে বড়শি দিয়া মাছ ধরতে গেছে কিন্তু মাছ তো আর ধরে না। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছুই না। ঐ মাছটা পুকুইরের সব মাছেরে তার করুণ কাহিনি কইয়া দিছে। কইছে, 'এইটা একটা মরন ফাঁদ, এই ফাঁদে খাওনের লোভে যে পরবা, হেই মরবা, বড়শির খাওন ভুলেও কেউ খাইবা না।' এই কথা শুনার পর কেউই আর বড়শির আধার খায় না। বড়শিতে ঠোকর দেয় না দেইখা লোকটা পানির মধ্যে বড়শির ছিপা দিয়া টিপ মারে। বড়শি পাতলে ঠোকর না দিলে বড়শি দিয়া পানির মইধ্যে বাড়ি দিয়া টিপ মারতে লাগে। তাইলে আশে পাশের মাছেরা বুঝতে পারে এহানে খাওন আছে। লোকটা বড়শিতে ঠোকর দেয় না দেইখ্যা পানিতে আবার টিপ মারছে। তখন টাকি মাছটা কাছে আইসা দেখেকি বড়শির মধ্যে খাওন দিয়া টিব মারতাছে। এই আধারতো খাওন যাইবো না যতই টিব মারুক। এখন টাকি মাছটা মনে মনে কয়, 'লেজ কাটা ছালি মাখা, চিত্রভুবন দেখাইলো এক চিলা বেটা, যতই দেও টিব টিবানি, টিবের মর্ম আমরা জানি, বড়শির খাওন আর আমরা খামু না।'

খ. কিংবদন্তি

যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে বর্ণিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শুনে নিজের কালে ও উত্তরকালের মানুষের কাছে যা বর্ণনা করে তাই কিংবদন্তি। কোথাও কোথাও কাহিনির উপাদান-উপকরণে মানুষ ও প্রকৃতির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়। কিংবদন্তি এক মুখ থেকে অন্য মুখে প্রচারিত হয়েছে আর সাধারণ মানুষ তা শুনে তৃপ্ত হয়েছে, আনন্দ পেয়েছে। অতঃপর তা উত্তরপুরুষের কাছে প্রচার করেছে।

বল্লাল সেনের দিঘি

এই দিঘির অবস্থান বর্তমান রামপাল কলেজের লাগোয়া দক্ষিণে। অনেকের কাছে এই দিঘি রামপালের দিঘি হিসেবেও পরিচিত। তবে এখনও এলাকার প্রবীণরা এই দিঘিকে বল্লাল সেনের দিঘি হিসেবেই সম্বোধন করে থাকেন। দূর থেকে এই দিঘিকে সবুজ মাঠ মনে হতে পারে। এই দিঘির অনেক অংশই বেদখল হয়ে গেছে। এখন আবার ভরাট করে হাউজিং প্লট নির্মাণের পাঁয়তারা চলছে। এই ঐতিহাসিক দিঘির সাথে বিক্রমপুরের অনেক কিংবদন্তি জড়িত রয়েছে। কথিত আছে যে, এই দিঘির পাড়েই বল্লাল সেনের বাড়ি ছিল। বর্তমানে তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে দিঘির পাড় সংলগ্ন স্থানে অনেকদিন পর্যন্ত একটি গজারি গাছের গুঁড়ি ছিল; যা দেখে এলাকার লোকেরা অনুমান করত যে, এটি বল্লাল সেনের হাতি বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হতো।

www.pathagar.com

বল্লাল সেনের দিঘি

হরিশ্চন্দ্রের দিঘি

রামপালের রঘুরামপুর গ্রামে এই দিঘিটি অবস্থিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম অনুসারে দিঘির নামকরণ করা হয়। এই দিঘির একটি আশ্চর্য ব্যাপার ছিল যে, মাঘী পূর্ণিমার সময় দিঘিটি জলে টইটুম্বুর হয়ে যেত। সারা বছর ধরে দিঘির উপরিভাগ জলজ ঘাসের দামে আচ্ছাদিত থাকত। কেবলমাত্র মাঘী পূর্ণিমায় জল বেড়ে গেলে দাম পানির নিচে চলে যেত। এখন দামগুলো সরিয়ে ফেলায় পানি বৃদ্ধির ব্যাপারটি আর বোঝা যায় না।

গ লোকপুরাণ

১. চড়ক গাছ বা বালা গাছ

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা হয়। যেই গাছটিতে চড়ক ঘুরানো হয় সেই গাছটিকে চড়ক গাছ বা বালা গাছ বলা হয়। একটি উন্মুক্ত স্থানে চড়ক পূজার মেলা বসে। ঐ স্থানের পাশেই একটি পুকুর থাকে। চড়ক পূজা শেষ হয়ে গেলে বালা গাছটিকে ঐ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। ঐ পুকুরকে বলা হয় জিয়স পুকুর। লোক বিশ্বাস এই যে, গাছটি সারাবছর ঐ পুকুরে থাকে না। মাটি ভেদ করে পদ্মা (গঙ্গা) দিয়ে কৈলাশ পর্বতে শিব-

www.pathagar.com

পার্বতীর কাছে চলে যায়। এলাকাবাসীর নিকট পদ্মার জল অতি পবিত্র। কারণ গাছটির চলাচলের পথ এই নদী। চড়কপূজার ৪দিন আগের প্রথম দিনে পুকুরে ধান-দুর্বা-তেল-সিঁদুর-ফলমুল নিবেদন করে জলে নেমে কড়ুখোড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে গাছকে নিমন্ত্রণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে কালীর-কাঁচ নামানো হয়, তৃতীয় দিনে শিব-পার্বতীর পূজা বা নীল পূজা, উপবাস, ফল-ফলাদি মানত ইত্যাদি করা হয়। চতুর্থ দিন সকালে গাছটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। একে বলা হয় গাছ জাগানো। গাছ জাগানো অনুষ্ঠানে ভক্তগণ গাছকে ভক্তি দেয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, দুগ্ধ স্নান করায়, তারপর তেল সিঁদুর মেখে মহাসমারোহে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। বালাগাছ সম্পর্কে মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রায় সর্বত্রই এই লোক বিশ্বাসটি প্রচলিত আছে। আইরল, আব্দুল্লাপুর, পাইকপাড়া, চরশিলমন্দী, পাঁচঘড়িয়াকান্দি, বজ্রযোগিনী, নয়না, ঝাউটিয়া, শ্রীনগর, শেখরনগর ইত্যাদি গ্রামে প্রতিবছর চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২. জিয়স (জীবন্ত) তলা

এ জেলার ইদ্রাকপুর, পঞ্চসার, চোরমর্দন, কুসুমপুর প্রভৃতি গ্রামে শত শত বছরের প্রাচীন কিছু গাছ দেখা যেত। প্রাচীনত্বের কারণেই এ গাছতলাকে এলাকাবাসী জিয়স তলা বলে অভিহিত করতো। যুগ যুগ ধরে একটি গাছ প্রকৃতির সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকাকে এলাকাবাসী দীর্ঘজীবন লাভের প্রতীক হিসেবে দেখতো। এ জন্যই জিয়স তলা অতিশয় পবিত্র স্থান। বিশেষদিনে জিয়স তলায় মেলা বসে এবং ভক্তগণ শিরনির আয়োজন করে। গানের আসর বসায়। সকল ধর্মের ভক্তগণের উপস্থিতিতে এলাকাটি সরগরম হয়ে উঠে। বট, তেতুল, অশ্বত্থ, হিজল প্রভৃতি গাছ জিয়স গাছ হিসেবে পূজিত হয়।

৩. বারো আউলিয়া বা বারৈল্লা তলা

মুন্সীগঞ্জ জেলার হলদিয়া ও বানকাইজ গ্রামে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত প্রাচীন দুটি হিজল গাছ দেখা যায়। এই গাছ দুটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। লোক বিশ্বাস এই যে, এই জেলাটি সৃষ্টির আদিযুগে কালিদহ সাগর ছিল। কালে কালে পলি জমে সাগর ভরাট হতে থাকে। তখন বারোজন আউলিয়া সেখানে বারটি হিজলগাছ রোপণ করেছিলেন। শত শত বছর ধরে সেই হিজল গাছ অসংখ্য ডালপালা মেলে মহীরূহে পরিণত হয়। আউলিয়াগণ সেই গাছতলায় অবস্থান করতেন বলেই স্থানের নাম হয়েছে বারো আউলিয়া বা বারৈল্লা তলা। এই গাছগুলোর ডালপালা মাটি বেয়ে বেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। শুকনা মৌসুমে মাটি স্পর্শ করে থাকে আবার বর্ষায় জল বাড়ার সাথে সাথে ডালগুলোও জলের উপর ভেসে থাকে। এই ডালের সংখ্যা কেউ গুণে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। এলাকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বারৈল্লা তলাকে পবিত্র স্থান মনে করে, ভক্তি প্রদান করে এবং নিজেদের কল্যাণ কামনায় পূজা ও মানত দেয়।

www.pathagar.com

বানকাইজ গ্রামের বারৈল্লা তলা

৪. জিয়স পুকুর

প্রাচীন মন্দির অথবা জিয়স তলার পাশেই থাকে জিয়স পুকুর। জিয়স পুকুরের জলকে সকলে গঙ্গা জলের ন্যায় পবিত্র মনে করে। বিশেষ দিনে পুকুর ঘাটে স্নান উপলক্ষে মেলা বসে। ইদ্রাকপুর, পঞ্চসার, পাঁচগাও গ্রামের জিয়স পুকুর বিখ্যাত। ইদ্রাকপুর গ্রামে প্রায় পাঁচশত বছর প্রাচীন শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের জিয়সতলা ও জিয়স পুকুর সম্পর্কে জনপ্রবাদ এই যে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিক্রমপুরে এসে এই মন্দিরেই অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন কালিদাস সাগরের যোগিনী ঘাটে সূর্য স্নান ও তর্পণ করতেন, জিয়স তলায় বিশ্রাম নিতেন এবং জিয়স পুকুরের জল নিত্যকর্মে ব্যবহার করতেন।

৫. সমাজ মসজিদ

মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বাঁশবাড়ি, শিকদারবাড়ি ও আউটশাহীতে তিনটি প্রাচীন মসজিদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে আউটশাহী মসজিদটি কালের অবক্ষয়ের মাঝেও বিদ্যমান আছে। এগুলি সমাজ মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। মসজিদগুলির স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম এবং আকারে খুবই ছোটো। একসাথে চার-পাঁচজনের বেশি লোক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যেত না। এ জেলায় আর কোথাও এতো ছোটো মসজিদ দেখা যায় না। সম্ভবত একই সময়ে একই শিল্পীর দ্বারা একগম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। বাঁশবাড়ি এবং শিকদার বাড়ির মসজিদ দুটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। হিন্দু প্রধান বিক্রমপুরে ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্নে ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে এখানে যে মুসলমান বসতি বিস্তৃত হচ্ছে তার পরিচয়বাহী এসব স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট সমাজ মসজিদ। জানা গেছে নামাজের সময়ে সমাজের লোকজনদের ডেকে এনে নামাজ আদায় করা হতো বলেই এ মসজিদগুলোর নাম হয়েছে সমাজ মসজিদ।

৬. চৌগাড়া, সিপাহীপাড়া ও হাতিমারা

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় চৌগাড়া, সিপাহীপাড়া ও হাতিমারা নামে তিনটি এলাকার নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলির সাথে সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন। ঢাকার লালবাগের কেল্লার বিদ্রোহী সিপাহিরা নদ-নদী বেষ্টিত দুর্গম রামপাল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। সিপাহিরা নিরাপত্তার জন্য যে স্থানটিতে চারটি গর্ত বা বাঙ্কার খনন করেছিলেন সে এলাকাটির নাম চৌগাড়া, চৌগাড়ার অল্প দূরেই যেখানে সিপাহিরা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিলেন সে এলাকাটির নাম সিপাহীপাড়া এবং সিপাহিদের সাথে যুদ্ধে যেই স্থানটিতে হাতি মারা গিয়েছিল সেই স্থানটির নাম হাতিমারা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

৭. ডাকাত ফটিক ব্যানার্জী

টঙ্গিবাড়ী উপজেলার পাঁচগাও গ্রামে ডাকাত ফটিক ব্যানার্জীর বাড়ি। তাঁকে নিয়ে লোক সমাজে এমন সব দুঃসাহসিক ঘটনার কথা প্রচলিত রয়েছে যা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি পেশায় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু এলাকায় তিনি খ্যাত হয়েছিলেন ডাকাত অভিধায়। তিনি নিজে ডাকাতি করতেন না। ডাকাতি করার প্ল্যান করে দিতেন নির্ভুলভাবে। নিজ গ্রাম বা ইউনিয়নে তার দ্বারা কোনো ডাকাতি সংঘটিত হয় নি। তার দলে ৮০জন ডাকাত ছিল। এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে এবং পদ্মায় স্টিমারে ডাকাতি করতেন বলে জানা যায়। ডাকাতির অর্থ নিজে ভোগ করতেন না, এলাকার সহায়-সম্বলহীন দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবীদেরও তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর দলের সদস্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল যে, ডাকাতির সময়ে নারী ও শিশুদের নির্যাতন করা যাবে না। তিনি কখন, কোথায় ডাকাতি করবেন তা চিঠি দিয়ে আগে-ভাগেই জানিয়ে রাখতেন। আব্দুল্লাহপুরের টোকানিপালের বাড়িতে এভাবে ডাকাতি করেছিলেন। শোনা যায় টোকানিপাল ডাকাতির দিনে তাঁর বাড়িতে যাত্রাগানের আসর বসিয়েছিলেন যাতে ডাকাতরা ডাকাতি করার সুযোগ না পায়। ফটিক ব্যানার্জীর পরিকল্পনা এতটাই অব্যর্থ ছিল যে লোক সমাগমের মাঝেও তার দলের ডাকাতরা ডাকাতি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার হস্তগত করেছিল। কলমা গ্রামের জমিদার যোগেন্দ্রভূঁইয়া (যোগাভূঁইয়া), দশত্তর গ্রামের আজিমুদ্দিন রাঢ়ী (আইয্যা রাঢ়ী), পাঁচগায়ের আব্বাস আলী ফটিক ব্যানার্জীর সহযোগী ছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি দুইবার মুন্সীগঞ্জ জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তার জ্ঞাতিভাই দীনেশ ব্যানার্জী ছিলেন পাঁচগাও ইউনিয়নের দীর্ঘকালের প্রেসিডেন্ট। তিনি পেশায় এল.এম.এফ ডাক্তার ছিলেন। ফটিক ব্যানার্জীর ডাকাতির কথা তিনি অবগত ছিলেন

www.pathagar.com

এবং নীরব সমর্থকও ছিলেন। দীনেশ ব্যানার্জীর অপর তিন ভাই যোগেশ ব্যানার্জী, বঙ্কিম ব্যানার্জী ও শশধর ব্যানার্জী বিপ্লবী ছিলেন বলে শোনা যায়। ফটিক ব্যানার্জীর সাথে তাদেরও যোগাযোগ ছিল। দীনেশ ব্যানার্জীর স্ত্রী বীণা ব্যানার্জীও বিপ্লবী ছিলেন। তিনি ঢাকার বিখ্যাত নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী ছিলেন। বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশদের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র ছিল বীণা ব্যানার্জীদের ঢাকার বেচারাম দেউরির বাড়িটি। ফটিক ব্যানার্জী একসময়ে আদর্শচ্যুত হয়ে নীতি বিগর্হিত আচরণ করায় দীনেশ ব্যানার্জী তার নাম প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ফলে তাকে আবার জেলে ঢুকতে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতার সময়ে ফটিক ব্যানার্জী মুক্তি পান। ফটিক ব্যানার্জীর লোকেরা দশত্তর গ্রামে রোগী দেখানোর কথা বলে নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়ার পথে বৈঠার আঘাতে দীনেশ ব্যানার্জীর মাথা ফাটিয়ে প্রতিশোধ নেন। ১৯৭২ সালে ফটিক ব্যানার্জী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। আজও টঙ্গিবাড়ী উপজেলার জনগণ ফটিক ব্যানার্জীর নামটি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে উচ্চারণ করেন।

৮. গণক ঠাকুর

পাঁচগাও গ্রামের কালীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী কালী ঠাকুর বা গণক ঠাকুর নামে খ্যাত হয়েছিলেন। খ্যাতির কারণ সাধনার বলে তিনি অজানা অনেক তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি প্রথম জীবনে কলমা লক্ষ্মীকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বানকাইজ গ্রামের বারৈল্লাতলা দিয়ে তাঁকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে হতো। একদিন বারৈল্লাতলায় অদৃশ্য কেউ তাঁর মাথায় আঘাত করে। এই অলৌকিক ঘটনার পর থেকে তিনি অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়েন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কালী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মাটির ঘটের উপরে নারিকেল বসিয়ে নিজেই কালীমূর্তির আদল গড়ে তুলতেন। একটি ছোট ঘরের মেঝে গর্ত করে তিনি সেখানে বসে থাকতেন। তার সামনে কালীর মূর্তিটি স্থাপিত হতো। তিনি সর্বক্ষণ গর্তে বসে কালীমূর্তির পদতলে মাথা ঠেকিয়ে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর গণনা এতোটাই নির্ভুল ছিল যে, কে কোন দিক থেকে কোন পোশাক পরে কি উদ্দেশ্যে আগমন করল তা ঐ গর্তে বসেই না দেখে বলে দিতে পারতেন। ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর চতুর্দিকে মা মনসারা (সাপ) ঘুরাফেরা করতো। তার বাড়িতে প্রচুর সাপ ছিল কিন্তু কাউকে ক্ষতি করতো না। সাড়ে সতের কানির বিশাল বাড়িতে জিয়স পুকুর ও প্রচুর গাছপালা ছিল। তিনি টোটকা চিকিৎসাও করতেন। কোন রোগী এসে বিফল হয়ে ফেরত যেত না। তিনি হারানো জিনিসের খবর ও ছাত্রের পাস-ফেলের খবর বলে দিতে পারতেন। এ জন্য প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে প্রচুর লোকজনের আগমন ঘটতো। বাড়ির বাইরে পুকুর পাড়ে তিনি অতিথিশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি একটানা ৭দিন পর্যন্ত পুকুরে ডুবে থাকতে পারতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কলমা গ্রামের প্রখ্যাত চিকিৎসক জ্যোতিষ সেনের বাবা ডা. আদিত্য সেনের বাড়িতে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল বলে জানা যায়। ঐ গ্রামের মহব্বত আলী মুন্সীর নাতনী কোহিনুর রওশান মণির শিশুকালে দুধ-পায়খানার চিকিৎসার জন্য গণক ঠাকুরকে আনা হয়েছিল। তিনি বাড়ির পাশের কোলা থেকে একটি গাছের শিকড় তুলে এনে বেটে খাইয়ে রোগ সারিয়ে দিয়েছিলেন। গাছের শিকড়টিকেও চিনিয়ে দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

যেন পরবর্তীকালে সকলে ব্যবহার করতে পারে। অন্যের ক্ষতি হয় এমন কাজ তিনি কখনও করতেন না। দেশভাগের পর তাঁর স্ত্রী বলা যায় জোরকরেই কলকাতার দমদমে নিয়ে যান। যাত্রাকালে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সেখানে গেলে ৬মাসের বেশি বাঁচবো না।' সেখানে গিয়ে তিনি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ৬মাসের বেশি বেঁচে থাকেন নি। বিক্রমপুরবাসী আজও কালী ঠাকুরের ভিটায় এসে শ্রদ্ধাভরে তাঁর নাম স্মরণ করেন।

৯. ফজু শাহ

টঙ্গিবাড়ি উপজেলার নিতিরা গ্রামে ফজু শাহের দর্গা অবস্থিত। এই দর্গাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ফজু শাহের বাজার নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফজু শাহের দর্গায় রোগমুক্তির কামনায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেখানে রোগের উৎপত্তি সেই অঙ্গের মাটির প্রতিমূর্তি তৈরি করে দর্গায় উৎসর্গ করলে রোগ সেরে যায়। এজন্যে হাত, পা, নাক, মুখ, কান, পেট, হাটু নরম মাটিতে তৈরি করে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত দরগায় এনে রেখে দেয়। সাথে ফল-মুল, চাল-ডাল, হাঁস-মুরগি, ছাগল মানত করা হয়। এসব দিয়ে শিরনি তৈরি করে প্রতি বৃহস্পতিবার ভক্তগণকে খাওয়ানো হয়।

১০. শ্যামাকান্তের কড়ইগাছ

টঙ্গিবাড়ি উপজেলার আরিয়ল গ্রামে রাস্তার ধারে একটি প্রাচীন কড়ইগাছ (রেন্ট্রি) দৃষ্টিগোচর হয়। এই গাছটি শ্যামাকান্তের কড়ইগাছ নামে পরিচিত। ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্তের শক্তিমত্তার কথা কে-না জানে। তিনি আরিয়ল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কড়ইগাছের উত্তরপাশের বাড়িটিই ছিল তাঁর ব্যায়ামের আখড়া। তিনি কড়ইগাছের সাথে লম্বা কাঠ জুড়ে দিয়ে শক্তপোক্তভাবে বুক ডনের মঞ্চ তৈরি করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকেও সেই মঞ্চ এবং ব্যায়ামের স্প্রিং আখড়াবাড়িতে সংরক্ষিত ছিল। এখন আর আখড়াবাড়িটি নেই। শ্যামাকান্তের স্মৃতি হয়ে কড়ইগাছটি সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দশগ্রামের লোক দূর থেকে শ্যামাকান্তের কড়ইগাছ দেখেই বলতে পারে ঐটি আরিয়ল গ্রাম। এক ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্তের সাথে কুস্তি লড়াই করার জন্য কড়ই তলায় এসে এক লোকের কাছে শ্যামাকান্তের বাড়ি কোথায় জানতে চেয়েছিলেন। লোকটি গাছের একটি ডাল মাটিতে নুইয়ে ধরে ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছিলেন। তিনি আগন্তুককে ডালটি ধরে ছাগলকে পাতা খাওয়ানোর জন্য আহ্বান করলেন, 'আপনি একাজটি করতে থাকুন আমি ততক্ষণে শ্যামাকান্তকে ডেকে আনছি।' আগন্তুক ডাল ধরার সাথে সাথে ডালটির সঙ্গে উপরের দিকে উঠে গেলেন। তখন তিনি মনে করলেন, যে গ্রামের সাধারণ মানুষের গায়ে এতো শক্তি! সে গ্রামের ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্তের গায়ে না-জানি কত শক্তি! এই ভেবে তিনি কুস্তির আশা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। লোকশ্রুতি এই যে, ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্তই কড়ইগাছের ডাল নুয়ে ধরে তার ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছিলেন। শ্যামাকান্ত ঐতিহাসিক ব্যাক্তি। তাঁর খ্যাতি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল। ত্রিপুরা অঞ্চলের জনৈক নেংটা বাবার প্রভাবে তিনি শক্তিপ্রয়োগের সাধনা পরিত্যাগ করে আত্মশক্তির সাধনায় পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্তই পরবর্তীকালে সোহহং স্বামী নামে খ্যাত

www.pathagar.com

হন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা বিষয়ে বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতের নৈনিতালে তাঁর আশ্রমটি এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী শ্যামাকান্তের স্মরণে গাছটিকে পরম আদরে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন।

১১. কালীবাড়ি আশ্রম

লৌহজং উপজেলার কলমা কালীবাড়িতে তিনশত বছরের কালী মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পূর্ব পাশের দিঘিটিও জিয়স পুকুরের ন্যায় পূজিত হয়। এই দিঘির উত্তরপাড়ে রামকৃষ্ণমিশন মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আশ্রমে তিনজন আশ্রমিকের নাম আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। এঁরা ১. ননীলিকান্ত চক্রবর্তী, ২. উমেশ চন্দ্র সেন, ৩. হেমন্তবাবু। ননীলিকান্ত ও হেমন্তবাবু পেশায় শিক্ষক ছিলেন। উমেশ চন্দ্র সেন ছিলেন কলকাতা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা সহকারী। ঐসময়ে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে এই কালীবাড়ি আশ্রমে চলে আসেন। আশ্রমের পরিবেশ তখন খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ছিল। যক্ষা রোগ সম্পর্কে সেই সময়ের একটি প্রবাদঃ

উদরী, বাদরী, যক্ষা
এই তিনে নাই রক্ষা।

কালীবাড়ি আশ্রমে এসে তিনি অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সূর্যঘড়ি, বায়োগ্যাস, মাটির কলসির ফিলটার তৈরি করেছিলেন সেই যুগে। তিনি পর্দায় ছায়াচিত্র প্রদর্শন করে জনসচেতনতামূলক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। পঞ্চাশের দশকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে তিনি এসব করতেন। আজও গ্রামের প্রবীণদের মুখে এই তিন আশ্রমিকের কথা শোনা যায়।

তথ্যদাতা : প্রফেসর সুখেন চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা : ডাক্তার দীনেশ ব্যানার্জী, বয়স ৬০, গ্রাম : পাঁচগাও, উপজেলা : টঙ্গিবাড়ি ও মো. মুছা, পিতা- মহব্বত আলী মুন্সী, বয়স- ৮০, গ্রাম- কলমা, উপজেলা- লৌহজং।

ঘ. লোকছড়া

প্রাচীনকাল থেকেই রচিত হচ্ছে ছড়া। মুখে মুখে রচিত হয়ে তা বাহিত হয়। জনপ্রিয়তার কারণে কোনো কোনো ছড়া নিজ সময়কালকে অতিক্রম করে মুখে মুখে কথিত হয়। ছড়ায় লোকসংস্কার, লোকজীবনী, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি দৃষ্ট। ছড়ার সঙ্গে নারী-শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে ছড়া রচিত ও পরিবেশিত হয়। লোকছড়ার বিভাজনে পাওয়া যায় ছেলেভুলানো ছড়া, উপলক্ষের ছড়া, যাদুর ছড়া, খেলাধূলার ছড়া ইত্যাদি।

প্রচলিত ছড়া সমূহে রচয়িতার নাম যুক্ত থাকে না। এমন কী বহুতাল আগে রচিত ছড়ায় পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে রচিত ছড়াও রয়েছে। লোকছড়া চলিষ্ণু এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। কাজকর্মের খাতিয়ে মানুষকে স্থান পরিবর্তন করতে

www.pathagar.com

হয়। ফলে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও স্থান বদল করে। লোকছড়ার কোনো লিখিত রূপ থাকে না প্রচার হয় মুখে মুখে। এ বিষয়ে আতোয়ার রহমান লিখেছেন,ত "কিন্তু-যেহেতু মুখের ভাষা কাল থেকে কালান্তরে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়, সেজন্যে অলিখিত ছড়ায় পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। মৌখিক প্রচারে স্মৃতিবিভ্রমজনিত ভুলভ্রান্তির ফলেও পরিবর্তন ঘটতে পারে।"[১]

১.
কচি পাঠা বৃদ্ধ মেষ
দধির অগ্রে ঘোলের শেষ।

২.
মাংসে মাংস বৃদ্ধি
শাকে বৃদ্ধি মল
দুগ্ধে শ্রী বৃদ্ধি
ঘৃতে বৃদ্ধি বল।

৩.
ঐ ছেড়ি ছ্যাড়ারে ধর
কইল্লা ভাজি কর
ত্যাল নাই, নুন নাই
আল্লা আল্লা কর।

৪.
তাই তাই তাই
মামাবাড়ি যাই
মামি আইলো ঠেঙ্গা লইয়া
পলাই পলাই।

৫.
আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পড়ি দুল
ভালোবাসার ফুল।
ঐ বাড়িতে সেলিনা
তার সাথে খেলি না
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি।

---

১. আতোয়ার রহমান 'বাংলাদেশের গ্রাম ছড়া, লোক সাহিত্যের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৪, পৃ. ৮৪

www.pathagar.com

তাদের বাড়ি দোতলা
করে শুধু ইশারা ।
মা তোমার পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও তাড়াতাড়ি ।
বউর সাথে খেলা করি
বউর মাথার লম্বা চুল
বেঁধে দিব গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের সুগন্ধ
জামাই মিয়ার আনন্দ ।

৬.
সোনা বড় ভাল ছেলে
কাঁদতে জানে না
বই দিলে পড়তে পারে
ছিঁড়ে ফেলে না
শিলেট দিলে লিখতে পারে
ভেঙ্গে ফেলে না ।

৭.
গোপাল আইলো ঘরে
ঘর টলমল করে
সিংহাসনে বইয়া গোপাল
রাজ্য শাসন করে ।

৮.
ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা–
ইশ বিশ ধানের শীষ
অতিথ আইলে বইতে দিস্ ।

৯.
দ্বিতীয়ায় দিয়া ফোঁটা
তৃতীয়ায় দিয়া নিতা
যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা
আমি দেই আমার ভাইরে ফোঁটা
আইজ হইতে ভাই আমার যম দুয়ারের কাঁটা ।

১০.
দিনে রোদ, রাতে জল
তাতে ধানের বাড়ে বল ।

www.pathagar.com

১১.
সামনের চেয়ে পিছনে ভাল
যদি ডাকে মায়
ভরার চেয়ে খালি ভাল
যদি ভরতে যায়।

১২.
অযোধ্যায় এক রাজা ছিল
দশরথ তার নাম
তিনটি রাণী চারটি ছেলে।
বড়টির নাম রাম
রামের গুণে জগত আলো
ভূমে চরাচর।
রামের গুণে বন্ধু হলো
বনেরই বানর।
অকুলেরে কূল দিলেন রামগুণমণি
ধনুক ভেঙ্গে করলেন বিয়ে
জনক নন্দিনী।

১৩.
ধর্মমতি যুধিষ্ঠির
ধর্মে-কর্মে মতি স্থির
দুর্যোধন চক্র করে
পাশা খেলায় রাজ্য হারে
পঞ্চ ভ্রাতা বনে যায়
কত কষ্ট তাতে পায়।

১৪.
আহাম্মক এক
যে ছোট হইয়া বড়র লগে দেয় ঠেক।
আহাম্মক দুই,
যে ঘর ছাইয়া চালে না দেয় টুই।
আহাম্মক তিন,
যে বড় হইয়া ছোটর কাছে করে ঋণ।
আহাম্মক চাইর,
যে হাটে বাজারে খায় মাইর।
আহাম্মক পাঁচ,
যে এক সীমানায় লাগায় ফলের গাছ।
আহাম্মক ছয়,

www.pathagar.com

যে নিজের কথা পরের কাছে কয়।
আহাম্মক সাত,
যে প্রতি কথায় দেয় হাস।
আহাম্মক আষ্ট,
যে ইষ্টি কুটুমের কথা করে রাষ্ট্র।
আহাম্মক নয়,
যে স্ত্রীর কাছে গোপন কথা কয়।

বাচ্চাদের খেপানোর ছড়া

করিমন নেছা
তেনা দিয়া পেছা
গাঙ্গে নিয়া ধো
চেলি মাছে ঠোকর দিলে
পে পো পে পো।

বাচ্চাদের চুপ করানোর ছড়া

১.
তালগাছ কাটি
তালগাছ কাটি
তালের উপর বাসা
হাতি নাচে ঘোড়া নাচে
তালগাছ কাইট্টা ফালা
মামু তুমি সাক্ষী
পানির তলে পক্ষী
লোটা আইন্যা খোটা দেও
কন্যা আইন্যা বিয়া দেও।

২.
আয়রে ঘুম লেত্তর দিয়া
ভাওয়া বেঙ রাইন্ধা দিমু
কাউয়ার ঠেং দিয়া।
বারই বারই ফিরি চাচী
ফিরি কই?
ফিরি নিছে হোতে
বেড়া ধইরা কোতে
চুঙা ভইরা মোতে।

গারু পূজার সময় খেতের ধান বেশি হওয়ার ছড়া

ধানলো ধান হোন্দা খা
খেতের কোনায় বইসা বুড়ি

www.pathagar.com

ধান মাপে আশি কুনি
ধানলো ধান হোন্দা খা
সবার ধান চিটা চিটা
আমার ধান আটি আটি ।

লক্ষ্মী পূজার ছড়া

সবার বাড়ির লক্ষ্মী গড়াগড়ি যায়
টেকার থলি লইয়া লক্ষ্মী আমাগো বাড়ি আয় ।

বাচ্চাকে খাওয়ানোর ছড়া ।

আমগো খোকন ভালো
পেট ভইরা খায় ভাত
লগি দিয়া খোচা দিলে
পুত কইর‍্যা দেয় পাদ ।

কমিক ছড়া

এলোরে ঘোর কলি কাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল ।
ওরে খেকশিয়ালের ডাক শুনিয়া
কুত্তা পলায় চকির তলে ।

দই বিক্রির ছড়া

আমার দই এমুন টাডি
কাটতে লাগে কুড়াল বডি ।
আমার দই এমনি ভালা
খাইলে হয় ম্যালেরিয়া ।
লাল মোহনের দফা সারা
খির মোহনে গেল কৈ
রাখবেন নি ভাই চিন্তামণির দই ।

বউছি খেলার ছড়া

ছেই কুতকুত লাই
তবলা বাজাই
তবলার সুরে
লাঠি গুনগুন করে
চু আক্কা চুয়ানি
কলসি লইয়া টানি টানি
কলসি নিল চোরে
বিয়া দিমু দূরে ।

www.pathagar.com

হাডু ডু খেলার ছড়া

চেল কাবাডি চেলেকদার
হড্ডি ঙডডি খবরদার।

নৌকা বাইছের গান

বাইছ খেলাইতে গেছিলাম ভাই
ইছাপুরার খালে
খাল নাই বিল নাই
শুকনা দিয়া ঠেলে।
বাইছের নায়ে কচুরি
বেঙে পাইছে মাতবরি
পারলি নারে কদম বেপারি।

বিয়ের ছড়া

বিয়া বিয়া করিছ না,
বিয়া অত রং না,
যুদি বিয়া নড়ে
দুমড়াইয়া পড়ে।

ঠাট্টা ও বিদ্রূপের ছড়া

বাগিনারে বাগিনা
তোর বাহের ডরে আগিনা,
যাই আগি বারে,
পড়ে তোর বাহের ঘাড়ে
আমি আগি লুহাইয়া
তোর বাহে আগে হুইয়া।

টিকা : বাগিনা=ভাগনে, বাহের=বাপের, আগিনা=পায়খানা করিনা, বারে= বৃদ্ধি পায়, লুহাইয়া= লুকাইয়া, হুইয়া= শুয়ে।

ঘুম পাড়ানি/ছেলে ভুলানো ছড়া :

১. ঢলে ঢলে গো ময়না ঢলে
ডালিম গাছের তলে,
সাপে কিলবিল করে,
সাপের ভিতরে আণ্ডা
আমাগো সাব্বিরে ঠাণ্ডা।

২. ঘুম ঘুম ঘুমানি
ঘুমের ছড়া লইয়া
হাড় চোরা চুরি করে
পাট খেতে বইয়া।

www.pathagar.com

গোরক্ষের লাড়ু ব্রত ও ছড়া : গোরক্ষনাথ গোরক্ষক দেবতা হিসেবে পরিচিত। মুসলমান সমাজে 'গোরক্ষনাথের সিন্নি' এবং হিন্দু সমাজে 'গোরক্ষনাথের পূজা' একই উদ্দেশ্যে পালিত হয়। বাছুর হওয়ার ২১ দিন পর গাভীর দুধ দোহন করে সবটাই গাঢ় করে জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর চিনি মিশিয়ে সেই দুধ দিয়ে গরু ও বাছুরের মূর্তি, নাড়ু প্রভৃতি তৈরি করা হয়। সন্ধ্যার সময় একজন রাখাল বালক কলাপাতায় করে ঐ ভোগ গোয়ালঘরের কোণে রেখে আসে। রাতের বেলা গোরক্ষনাথ এসে ঐ ভোগ গ্রহণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। গাভীর অধিক দুধ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আচারটি পালন করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে উঠোনের একটি স্থান লেপে পরিষ্কার করে তাতে গোরক্ষের লাড়ুর আয়োজন করা হয়। লোকবিশ্বাস, এতে সেই গাভীর দুধ বৃদ্ধি পায়। এ উপলক্ষে গোরক্ষনাথের ছড়া বা পাঁচালি পরিবেশিত হয়। এই সময় একজন ছড়া পাঠ করে আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই হেইচ্ছ হেইচ্ছ বলে: যেমন—

ওরে ভাই সামসুমার- হেইচ্ছ।
সর্গে আছিল- হেইচ্ছ।
মাটিতে নামল- হেইচ্ছ।
তোমার গোরক্ষনাথকে চিনুম ক্যামনে- হেইচ্ছ।
হাতে লড়ি, মাথায় ঢোল- হেইচ্ছ।
গাঙ্গের পাড়ে। পাড়ে ঢোল- হেইচ্ছ।
ওরে ওরে বারই ভাই- হেইচ্ছ।
আমার গোরক্ষনাথের পান যোগাইও- হেইচ্ছ।
তোমার গোরক্ষনাথকে চিনুম ক্যামনে- হেইচ্ছ।
হাতে লড়ি, মাথায় ঢোল- হেইচ্ছ।
গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ঢোল- হেইচ্ছ।
ওরে ওরে যোগী ভাই- হেইচ্ছ।
আমার গোরক্ষনাথের তেল যোগাইও- হেইচ্ছ।
তোমার গোরক্ষনাথকে চিনুম ক্যামনে- হেইচ্ছ।
হাতে লড়ি, মাথায় ঢোল- হেইচ্ছ।
গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ঢোল- হেইচ্ছ (সংক্ষেপিত)।

পাঁচালি পরিবেশনের সময় বয়াতির সামনে ঘটি, পাঁচ প্রকার পাতা, পাঁচটি নাড়ু, ধান, ফুল, চন্দন, তিল, আতপ চাল, হরিতকী ইত্যাদি রাখা হয়। পাঁচালি বলার সময় রাখালরা সেই নাড়ু খায়। একজন রাখালকে গোয়াল ঘরের ভেতর যেতে বলা হয়। বয়াতি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে। রাখাল ঘরের ভেতর থেকে সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়। এরপর বয়াতির নির্দেশে রাখাল বের হয়ে এলে বাইরের রাখালেরা তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়। গোরক্ষনাথের পূজার শেষে গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্যসূচক ব্রতকথা ও ত্রিনাথের গান গাওয়া হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলায় অঞ্চলভেদে গোরক্ষনাথের ছড়ারও পরিবর্তন লক্ষণীয়। নিম্নের ছড়াটি সিরাজদিখান অঞ্চল থেকে নেয়া। এই ছড়ার প্রতিটি চরণের শেষে সমস্বরে হেইচ্ছ বলতে হবে।

১

পিক[১] পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম ছুতার হাটি

www.pathagar.com

ওরে আমার ছুতার ভাই
আমার গোর্খনাথের আসন যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম মালীর হাটি
ওরে আমার মালী ভাই
আমার গোর্খনাথের ফুল যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম বাইন্যার হাটি
ওরে আমার বাইন্যা ভাই
আমার গোর্খনাথের সিঁন্দুর যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম কুমার হাটি
ওরে আমার কুমার ভাই
আমার গোর্খনাথের জলঘট যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম পাউন্যার হাটি
ওরে আমার পাউন্যা ভাই
আমার গোর্খনাথের পান যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম সুপাইর‍্যা হাটি
ওরে আমার সুপাইর‍্যা ভাই
আমার গোর্খনাথের সুপারি যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম মুদীর হাটি
ওরে আমার মুদী ভাই
আমার গোর্খনাথের গুড় যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম গোয়ালের হাটি
ওরে আমার গোয়ালা ভাই
আমার গোর্খনাথের দুধ যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম কুলুর হাটি

www.pathagar.com

ওরে আমার কুলু ভাই
আমার গোর্খনাথের তেল যোগাইও।

পিক পারাইয়্যা তুললাম মাটি
তাতে বসাইলাম গৃহস্থের হাটি
ওরে আমার গৃহস্থ ভাই
আমার গোর্খনাথের নাড়ু যোগাইও।
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...।

[১]পেক (কাদা মাটি) > পিক।

২

এই বাড়ির পুব জায়গাটা
তাতে ফেলাইলাম মান্দার কাঁটা
মান্দার কাঁটা পারাইয়্যা
গোর্খ আসলেন দৌড়াইয়্যা
আসলেন গোর্খ বসলেন খাটে।

এই বাড়ির পশ্চিম জায়গাটা
তাতে ফেলাইলাম বকাই কাঁটা
বকাই কাঁটা পারাইয়্যা
গোর্খ আসলেন দৌড়াইয়্যা
আসলেন গোর্খ বসলেন খাটে।

এই বাড়ির উত্তর জায়গাটা
তাতে ফেলাইলাম বেতের কাঁটা
বেতের কাঁটা পারাইয়্যা
গোর্খ আসলেন দৌড়াইয়্যা
আসলেন গোর্খ বসলেন খাটে।

এই বাড়ির দক্ষিণ জায়গাটা
তাতে ফেলাইলাম খেজুর কাঁটা
খেজুর কাঁটা পারাইয়্যা
গোর্খ আসলেন দৌড়াইয়্যা
আসলেন গোর্খ বসলেন খাটে।
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৩

কাইট্যা বাগা কুমার ভাই
ওপার যাইতে ঠাঁই না পাই

www.pathagar.com

নাইম্যা দেখ কত পানি
আজ গোর্খের নাড়ু বিলানি।

কাইট্যা বাগা কুমার ভাই
ওপার যাইতে ঠাঁই না পাই
নাইম্যা দেখ গিটু পানি
আজ গোর্খের নাড়ু বিলানি।

কাইট্যা বাগা কুমার ভাই
ওপার যাইতে ঠাঁই না পাই
নাইম্যা দেখ হাঁটু পানি
আজ গোর্খের নাড়ু বিলানি।

কাইট্যা বাগা কুমার ভাই
ওপার যাইতে ঠাঁই না পাই
নাইম্যা দেখ মাজা পানি
আজ গোর্খের নাড়ু বিলানি।

কাইট্যা বাগা কুমার ভাই
ওপার যাইতে ঠাঁই না পাই
নাইম্যা দেখ গলা পানি
আজ গোর্খের নাড়ু বিলানি।
গাঙ পাড়ে ঝিনাই
রবি বারে গাই বাছুর ছিনাই
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৪

গিরি গিরি দেও বর
গরু বাছুরে ভরুক ঘর।
গিরি গিরি দেও বর
ঘর দুয়ারে উঠান ভর।

গিরি গিরি দেও বর
গাঠ গাছালিতে বাড়ি ভর।
গিরি গিরি দেও বর
টাকা পয়সার সিন্ধুক ভর।

গিরি গিরি দেও বর
ধান চাউলে গোলা ভর।

www.pathagar.com

গিরি গিরি দেও বর
ছেলে-মেয়েতে ভরুক ঘর।

গিরি গিরি দেও বর
জামাই দিয়া ভরুক ঘর।
গিরি গিরি দেও বর
নাতি-পুতিতে ভরুক ঘর।
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৫

আইলো রে চত্তির মাস
সোনার নাঙ্গল রূপার ফাল
গাই আবালে জুইর‍্যা হাল।
ঘরে আছিল যুবতী নারী
আইন্যা দিল পাটের বিচি
সেই পাট বুনলাম
নিড়াইয়্যা দিলাম।
মামায় কয় ভাইগ্নারে
চল ভাইগ্না পাট কাটি
সেই পাট হৈল কুইয়্যা
পাট হৈল মন চৌদ্দ।
গরু বান্ধি গরু ঠিক
বাছুর বান্ধি বাছুর ঠিক
ঘর বান্ধি ঘর ঠিক
নৌকা বান্ধি নৌকা ঠিক
যাহা বান্ধি সবই ঠিক
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৬

আয়রে পোলাপান স্বর্গে যাই
স্বর্গে গিয়া ডে ফল খাই
ডেফল খাইয়্যা ফেলাইলাম বিচি
তাতে হৈল বাঁশের ছোব
বাঁশের জন্ম বৈশাখ মাসে
করুল মেলে আষাঢ় মাসে
সেই বাঁশ কাইট্যা আনলাম

www.pathagar.com

আগা ফালাইলাম গোড়া ফালাইলাম
মধ্য দিয়া গোর্খনাথের লাডি বানাইলাম
একখানা লাডি দুইখান করি
যমের দুয়ারে খুটা গাড়ি
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৭

গাইয়ের নাম কলমিশ্বরী
দুধ দেয় হাড়ি হাড়ি
কত দুধ রাজায় খায়
কত দুধ প্রজায় খায় ।
কত দুধ পাড়া পড়শিতে খায়
কত দুধ গোয়ালে নেয়
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

৮

উত্তর থিকা আইল টিয়া
সোনার মটুক মাথায় দিয়া
সোনার মটুক ধরল ঘুণে
গাই বিয়াইল গোর্খের গুণে ।

দক্ষিণ থিকা আইল টিয়া
সোনার মটুক মাথায় দিয়া
সোনার মটুক ধরল ঘুণে
গাই বিয়াইল গোর্খের গুণে ।

পূর্ব থিকা আইল টিয়া
সোনার মটুক মাথায় দিয়া
সোনার মটুক ধরল ঘুণে
গাই বিয়াইল গোর্খের গুণে ।

পশ্চিম থিকা আইল টিয়া
সোনার মটুক মাথায় দিয়া
সোনার মটুক ধরল ঘুণে
গাই বিয়াইল গোর্খের গুণে ।
ওরে ভাই সামসুমা
হেইচ্ছ...

www.pathagar.com

গোর্খনাথের পূজার সময় রাত্রে ত্রিনাথের মেলা হয়। মেলার একটি গান:

ত্রিনাথ ঠাকুর এল জগতে
আজগুবি তামাশা হল কলিতে
বোবায় বলে হরি হরি
অন্ধে পেল দুই নয়ন
এখন আর ভাবনা কিরে মন
ত্রি-নাথের নাম নিলে হয়
রোগের বারণ।

তথ্য দাতা : সুবাস মণ্ডল, গ্রাম- পূর্ব রসুনিয়া, বয়স-৫৫, থানা : সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ। সংগ্রহ : মো: শাহজাহান মিয়া ও হাজী আলী আকবর, তারিখ : ১৯/১১/২০১২

ঘ. লোককবিতা

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ গীতপ্রধান, তারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন। এই রচনাসমূহ লোকপরম্পরায় প্রচলিত ও জনপ্রিয়। এই লোককবিতার মাঝে সে অঞ্চলের মানুষের ধর্মবিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক চিন্তন লভ্য।

গনি মুন্সীর লোককবিতা :

১.
দিলগাড়ি তুই চিনলি না হায় হায়
গাড়ির মধ্য দিয়া আসে যায়
হযরত আলী গাড়ির চাকা হয়।
ইমাম হাসান হোসেন নিশান লইয়া দুই ধারে খাড়ায়
নূর নবীজী লাইন ধইরাছে ইঞ্জিন হইলো ফতেমায়-ঐ
সেই গাড়িতে চড়ছে যেও জন
নামাজ রোজা ছাড়ান দিয়া চলছে জঙ্গল বন।
চায় না ঘর চায় না বাড়ি বাস করে সে জঙ্গলায়
ইল্লাললাহু দরুদ পড়ছিল আর চাইর কলিমায়-ঐ
নামাজ রোজা গাড়ির টিকেট হয়
ভেবে ওস্তাদ গনি বলে সত্য পরিচয়-ঐ

২.
কর্ম কেবল আর কিছু নয়
কেবল আঁকা আঁকি মোছামুছি
দেখে আমি তাজ্জব হইছি
তুমি শিশুর মতন কলম লয়ে
নানান রঙের কালি দিয়ে
এ ভ্রমা- কাগজ পেয়ে
লেখতে আছো বোঝের বাজি-ঐ।

www.pathagar.com

কৈ বা কৈ কারে বা কৈ
আমি তোমার হই বা না হই
তুমি আমার ঠিক জেনেছি...ঐ ।
তোমার অবকাশ নাই দিনে রাইতে
পরিশ্রম নাই খাটতে খাটতে
পাগল গনি বলে জানতে গিয়ে বেশ বুজেছি-ঐ ।

শাচাই শাহ-এর লোককবিতা

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে
চিনলি না তারে,
মাল ভরা ধন সিন্ধুকেতে
চিন তারে তরিকতে
চাবি তারে তরিকতে ।
চাবি রইল পীরের হাতে
এবার খুঁজলে পরে মিলবে চাবি
যদি ডুবতে পার রূপ সাগরে
কাণ্ডারী তুমি কার দোষ দিবা
আপন দোষে তোমার ডুবলো তরী ।
নৌকায় ছিল ছয় জন দাঁড়ি
তা গো মায়না দিতে নারি,
আ রে দাঁড় ছাড়িয়া সব পালাইল
কে করে তফিল চুরি ।

মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁ-এর লোককবিতা

চিশতিয়া কাদেরিয়া নকশাবন্দী মোজাদ্দেদীয়া
কোন জায়গায় কোন দলিলে কয়
কোন জায়গায় যাইয়া নবী
কোন জায়গায় বইস্যা রয় ।
কে বা তার ডাইনে বাঁয়
কে বা তারে মুরিদ করায়
চান সুরুজ তারা দুই ভাই
কোন জায়গায় লুকাইয়া রয় ।

জীতেন চন্দ্র বর্মণের লোককবিতা

১

প্রেমে গেল জাতি কুলমান ধরিয়া বন্ধুর গলা
লোক সমাজে যায়না বলা মাইনষে শুনলে কয় শালা

www.pathagar.com

তারে কি আর যায় ভোলা ।
প্রেমিক মুখে ফুটায় কয়েকদিন হাসি
যেমুন আকাশের চাঁদ পায় তারে
পরে গলায় দেয় রশি ।
একলা ঘরে কাটাই নিশি
মিটেনা যৌবন জ্বালা ।

প্রেমে যখন মিটে যায় সাধ
জজ কোর্টের উকিল ধরে শাস্তির পাতে ফাঁদ
খাইবো না গোলাম তর ভাত জেল খানায় মারে তালা ।

প্রেমে দেখলাম আজব কা-
কাউরে বানায় রাজা বাদশা ভাইরে
কাউরে বানায় ভ-
জীতেন দাসের কপাল মন্দ
জীতেন দাসের এই কপালে
শ্মশান ঘাটের নাইরে ধুলা ।

২
কে যেন ঐ কদম ডালে বাজায় মোহন বাঁশি আমার বন্ধুরে
মন বলে দেইখ্যারে আমি বন্ধুর প্রেমে উদাসী
বাঁশির সুরে ঘরে রয়না মন
আমার মন করলো চুরি সে দেখিতে কেমনরে
আমার মন নিয়া পালায় সে জন
কাঁদায় দিবা নিশি আমার বন্ধুরে ।

যে দিন হতে হই গৃহ ছাড়া
এই দেহে প্রাণ থাকতে গিয়াছি মারা রে
এ মরা যায়না চিতায় পোড়া
দেখে জগতবাসী আমার বন্ধুরা ।

আমার পোড়া দেহ আর পোড়াবি কি
এই জীবন থাকিতে একবার যেন দেখিরে
কাঙ্গাল জীতেন দাসের এ মিনতি করিও চরণ দাসী ।-ঐ

৩
শোনেন আমার বন্ধুগণ শোনেন যত জনগণ
এই বার আসলো নির্বাচন ।

www.pathagar.com

জনগণের দোয়া প্রার্থী শেখ হাসিনার আগমন ।-ঐ
শেখ মুজিব ছিলেন নয়নের মণি
আমরা অনেকে জানি
অনেক দিন হয় চলে গেছেন নিজ আপন বাড়ি

তারে সবে মিল্লা করবেন দোয়া পড়িয়া খোদার কোরান ।
ঝাউটিয়া এলাকাবাসী
শেখ হাসিনার মুখে আমরা ফোটাবো হাসি ।
ওরে কৃষক-শ্রমিক-জেলে-চাষী
ঘোচাবো দেশের নিদান । ঐ
মনির মাস্টার আর হবি মুন্সী
শান্তিরঞ্জন আর গিয়াসউদ্দিন
চায় জনগণের মন
শেখ হাসিনার মনের আশা করিবেন পূরণ ।
কাঙ্গাল জীতেন দাসের এই পরিশ্রম
গান লিখিয়া কাটাবো জীবন ।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

পুথিগত শিক্ষা ব্যবহার না করে কোনো কারিগর কর্তৃক উদ্ভাবিত ও তৈরিকৃত বস্তু যখন সমগ্র সমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে তখন সেগুলোকে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বলা হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে স্থানীয় উপাদান, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিচারে এ লোক উপাদানসমূহ ব্যবহার করা হয়। লোকশিল্প (Falk Arts and crafts)- এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিজ্ঞাত হয়। উদাহরণস্বরূপ কুলার গায়ে রঙ দিয়ে যখন কোনো নকশা করা হয় তখন সেই নকশার আলাদা আবেদন অনুভব করা যায়। কুলা আর নকশাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এই দুইয়ের অন্বয়ে শিল্পরস সৃজিত হয়। কুটির শিল্পের অন্তর্গত জিনিসসমূহ বস্তুগত লোক-সংস্কৃতিভুক্ত।

ক. লোকশিল্প

লোকজীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনে উদ্ভূত বস্তু, যাতে ঐতিহ্য ও শিল্পবোধ প্রকাশিত হয় তাই লোক শিল্প। এই শিল্পের অভ্যন্তরে প্রাকৃতজনের নিত্যদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য লভ্য। লোকজীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বস্তুই এর অংশ। এই শিল্প একই সঙ্গে জীবনের উপযোগিতা ও সৌন্দর্যবোধকে প্রতিফলিত করে। বংশ পরম্পরায় কারিগররা এই শিল্প উপাদান নির্মানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

১. বাঁশ-বেত শিল্প

প্রাচীনতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে মৃৎশিল্পের পরই বাঁশ-বেত শিল্পের স্থান। পাল যুগে নির্মিত পাহাড়পুরের টেরাকোটা মৃৎশিল্পের উন্নত নমুনা। ঐ যুগে রচিত চর্যাপদে বাঁশ-বেত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাহ্নপার একটি পদে ডোম রমণী কর্তৃক সুতা, চাঙ্গারি ও নলের পেটরা বিক্রয় করার বর্ণনা আছে। কবির ভাষায় : "তান্তি বিকণহ ডোম্বি অবর মো চাঙ্গিড়া ।/তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥"-ডোমনি সুতা বেচ আর আমাকে বেচ চাঙ্গারি। তোর জন্য নলের পেটরা ছেড়েছি।

চেঙারি বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, আর পেটরা বা বাক্স নল বা বেতের তৈরি। এ শিল্পের ঐতিহ্য আজও বিক্রমপুরে বহমান। প্রথমে গৃহস্থালির দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে নানা পাত্র তৈরি হয়েছে। পরে দিনে দিনে এ শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঁশ, বেত, মোতরা, নল-খাগড়া প্রভৃতি উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। দেশের কুশলী শিল্পীরা সহজলভ্য এসব উপাদান দিয়ে সমাজ জীবন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী বহু ব্যবহারিক ও শৌখিন সামগ্রী তৈরি করেছে।

বাঁশ-বেত শিল্পের প্রাচীনতা ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের হস্ত ও কুটির শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছে এসব শিল্পকে কেন্দ্র করেই। এ

www.pathagar.com

শিল্প পরবর্তীকালে অন্য শিল্পের বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কাঠ ও ধাতু নির্মিত সমধর্মী শিল্পসামগ্রী বিচার করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

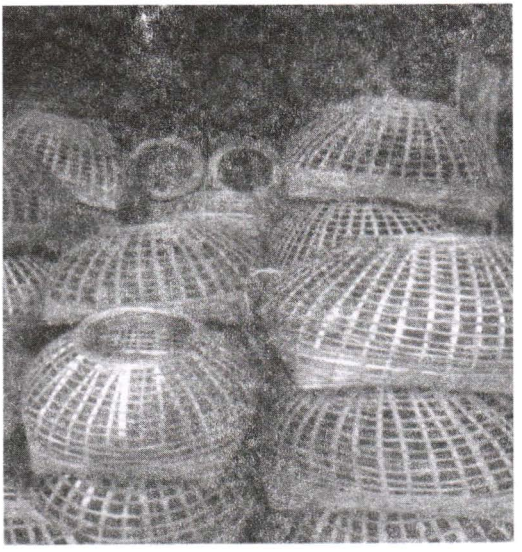

বাঁশ বেতের সামগ্রী

বিক্রমপুরে বাঁশ-বেতের ডালা, কুলা, চালনি, ডুলি, ডুলা প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম সাধারণত ঋষি, ক্ষত্রিয় ও দাস শ্রেণির অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বংশানুক্রমে নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। আজকাল মুসলমানরাও এ কাজ শুরু করেছে। বেত দিয়ে অনেক জিনিস যেমন ধামা, সাজি, পাতি, ঝুড়ি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল, মোড়া, পালি, খুচি, সরপোস প্রভৃতি তৈরি হয়। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় দোচালা-চারচালা ঘর, বিভাজন বেড়া, দরজা, ঝাঁপ, চটি, বাখারি ইত্যাদি। এছাড়া মাথাল, ডালা, কুলা, ঝুড়ি, চালুনি, ধামা, সাজি, আড়বাঁশি, নৌকার ছই ও পাটাতন, মাছ ধরার ফাঁদ, গরুর মুখের ঠুসি ইত্যাদি সরঞ্জামও বাঁশ দিয়ে বানানো হয়।

ভেলকি : বাঁশ নির্মিত অলঙ্কৃত ভেলকি ঘরের ভিতরে বিভাজন-বেড়া ও সিলিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষভাবে ঘরের বারান্দার উপরিভাগে স্থাপিত ভেলকি গৃহের বেশ সৌন্দর্য বাড়ায়। প্রাচীনকালে শৌখিন গৃহস্থরা অলঙ্কৃত ভেলকির ব্যবহার করতেন। বর্তমানে এর প্রচলন কম। এখনও মুন্সিগঞ্জে এ জাতীয় ভেলকির ব্যবহার রয়েছে। ভেলকি স্থানীয়ভাবে 'কার'/'আপার' নামেও পরিচিত। সাধারণত কাঠ, বাঁশ, মুলি ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া বা বানানো হয়। ভেলকির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় টিনের চালের নিচে। এর একটি সহজ ব্যাখ্যা হলো, চালের নিচে ভেলকি ব্যবহার করলে শীত বা গরম কম অনুভূত হয়। টিনশেড বিল্ডিং-এ ভেলকি ব্যবহারের রীতি বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

দরমা : ঘরের বেষ্টনী হিসেবে ব্যবহৃত দরমা বা পার্টিশনেও এ শিল্পের নমুনা আছে। মুন্সিগঞ্জে দরমা করার জন্য সাধারণত বাঁশ, বেত, পাটকাঠি যা স্থানীয়ভাবে পাটখড়ি হিসেবে পরিচিত, এগুলো ব্যবহৃত হয়। ছৈয়ালরা এ কাজের জন্য নিযুক্ত থাকে।

দরমার বেড়া

কুলা : বাঁশের সরু বেতি ও শলা দিয়ে তৈরি কুলা, ডালা, ঝুড়ি, চালুনি প্রভৃতি বহু প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। বড় কুলা সাধারণত ধান, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষ সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়াও মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে এগুলি ব্যবহার করে থাকে।

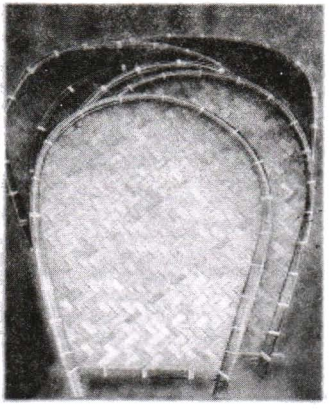

কুলা

বিয়ের তত্ত্ব চিত্রিত ডালায় ও কুলায় পাঠানো হয়। কুলায় প্রদীপ ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজিয়ে নব বর-বধূকে বরণ করা হয়। গৃহসজ্জার শৌখিন দ্রব্য হিসেবে কুলা ঘরে টানিয়েও রাখা হয়। আবার অল্প বয়সের মেয়েরা ছোট আকারের কুলা খেলনা হিসেবেও ব্যবহার করে। কুলা তৈরি করা হয় বাঁশ ও বেত দিয়ে। অনেক সময় এই

www.pathagar.com

কুলা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কারিগরের চমৎকার মেধা। কারিগর কয়েক রং-এ বেত রঙিন করে কুলা প্রস্তুত করেন। এই রকম নকশি কুলা অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রি হয়। নকশি কুলা ব্যবহৃত হয় গৃহ সজ্জার কাজে এবং মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানে।

চালুনি : চালুনি গৃহস্থালি কাজের নিত্য ব্যবহার্য একটি তৈজসপত্র। শস্যদানা চালার জন্য মোটা ছিদ্রের চালুনি আছে, আবার আটা চালার জন্য ক্ষুদ্র ছিদ্রের চালুনি আছে। এগুলির বুনন সাধারণ মানের। গৃহসজ্জার জন্য যে চালুনি ব্যবহৃত হয়, তাতে নানা কারুকাজ থাকে। বিক্রমপুর অঞ্চলের মেয়েরা বাঁশের চালুনির উপর নানা রকম কাজ করে, কখনও উল সুতার কাজ আবার জরির কাজ। রং ব্যবহার করেও চালুনি অলঙ্কৃত করা হয়। এতে লাল, সবুজ, হলুদ ও বেগুনি রং দিয়ে প্রজাপতি, জবা ফুল, নানা রকমের ফুল লতা-পাতার নকশা করা হয়। শহরে ঘরের বা বারান্দার দেওয়ালে নকশি চালুনি ঝুলিয়ে গৃহের শোভাবর্ধন করা হয়।

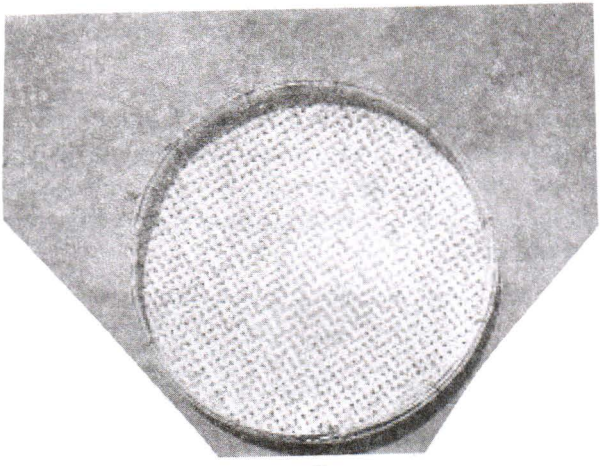

চালুনি

কলমদানি : বাঁশের তৈরি কলম রাখার পাত্রবিশেষ। বাঁশ নির্মিত এরূপ পাত্র কলমদানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবেও ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। বাঁশ কেটে গিরাসহ কিছুটা অংশ পৃথক করে তা দিয়ে গ্লাসের আকারে তৈরি করা হয়। কলমদানির সামনের দিকে বিভিন্ন নকশা করা হয়। এতে মানুষের অবয়বসহ বিভিন্ন প্রকার নকশা স্থান পায়। মুন্সিগঞ্জে যেসব কলমদানি প্রস্তুত করা হয় তা সাদা-মাটা। বাঁশ ও বেত দ্বারা প্রস্তুতকৃত এই কলমদানিগুলোতে হালকা কাজ করা হয়। কলমদানির আকৃতি হয় সাধারণত ৮ সে.মি. থেকে ১২ সে.মি. পর্যন্ত।

কাঠা : বেতের তৈরি ধান-চাল মাপার ছোট পাত্র। কাঠায় চাল মেপে ভাত রান্না করা হয়। ধান মাপার কাঠার সাইজ তুলনামূলকভাবে বড় হয়। সাধারণত পাঁচ সের ওজনের হয়ে থাকে। পাল্লার বিকল্প হিসেবে এরূপ কাঠার ব্যবহার ছিল। ঘন বুননি ও

www.pathagar.com

মজবুত কাঠা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মুন্সিগঞ্জে কাঠ ও বেতের কাঠা দিয়ে ধান-চাল মাপার প্রচলন দেখা যায়। তবে বর্তমানে প্লাস্টিক ও স্টিলের কৌটা দিয়েও চাল-ধান মাপা হয়। শৌখিন দ্রব্য হিসেবে কাঠা বাজারে বিক্রি হয়।

২. মৃৎশিল্প

লোকশিল্পের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো মৃৎশিল্প। যারা এই শিল্পের সাথে জড়িত তারা কুমোর হিসাবে পরিচিত। মাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও খেলনা তৈরি করা হয়। যেমন—হাড়ি, পাতিল, কলসি, সরা, খেলার পুতুল, নানা প্রকার ফল এবং খেলার ঘর ইত্যাদি। নারী পুরুষ উভয়ই এই শিল্পের সাথে জড়িত। মুন্সিগঞ্জের প্রায় সকল উপজেলায় এখনও মৃৎশিল্পীরা তাদের এই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে ধরে রেখেছেন শত প্রতিকূলতার মধ্যেও।

৩. পাটি শিল্প

পাটি শিল্পের অন্যতম উপকরণ মোতরা নামক এক প্রকার গাছ। গৃহস্থের বাড়ির আশেপাশের নিচু জায়গা ও পুকুর পাড়ে এসব গাছ অনেকটা পরিচর্যাহীন ভাবেই জন্মায়। মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে এই গাছের ছাল দিয়ে উন্নতমানের পাটি ও চিকনাই তৈরি করা হয়। এ পেশায় নিয়োজিতরা পাটিয়াল বা পাইট্যাল নামে পরিচিত। সিরাজদিখান, গজারিয়া, শ্রীনগর, টঙ্গিবাড়িতে এ পেশার কিছু পরিবার আজও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া নারিকেলের পাতা, খেজুর পাতা, তাল পাতা দিয়েও মাদুর, আসন, জায়নামাজ, বিছানা তৈরি করা হয়। গৃহস্থবাড়ির নারীরা নিত্যকর্মের অবসরে এসব সামগ্রী তৈরি করে।

৪. কাঁথা শিল্প

গ্রামীণ সমাজের মহিলারা বিভিন্ন প্রকার কাঁথা তৈরি করে। আর এসব কাঁথা দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু কিছু কাঁথা অত্যন্ত সৌখিন হয়। যা নকশী কাঁথা নামে পরিচিত। পুরানো শাড়ি, লুঙ্গি দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হয়। কাঁথা সেলাইয়ের সুতা পুরাতন শাড়ির পাড় থেকেই সংগ্রহ করা হয়। সাংসারিক প্রয়োজনে নারীরাই এসব কাঁথা সেলাই করে।

৫. তাঁত শিল্প

এই জেলায় তাঁত শিল্পের অস্তিত্ব সামান্যই আছে। শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী ইউনিয়নের শিবরামপুরে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ তাঁতের কাপড়ের হাট। এই হাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার তাঁতিরা এখনও তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এখানকার পুরুষ, মহিলা উভয়েই তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

লোকপোষাক-পরিচ্ছদ

শ্রেণিগত অবস্থান অনুসারে মুন্সিগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে। বিত্তশালীরা উন্নত সূতায় বয়নকৃত পোশাক পরিধান করে, তবে নিম্নবিত্তরা স্বল্পমূল্যের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে থাকে। সাধারণত গ্রামের ছেলেরা ৮/১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেংটা থাকে। আর মেয়েরা ফ্রক পরে থাকে।

শহর এলাকার বিত্তশালী মুসলমানরা পায়জামা, পাঞ্জাবি ও মাথায় টুপি পরিধান করে। ধর্মীয় যে কোনো অনুষ্ঠানে মৌলভী ও মওলানারা পায়জামা, শেরওয়ানি ও মাথায় পাগড়ি পরেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবে বর্তমানে শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শার্টপ্যান্ট পরেন। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে চাষি ও দিন মজুরদের লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শার্ট পরতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে অনেকেই গেঞ্জি গায়ে বা খালি গায়ে থাকেন। তখন তাদের একমাত্র সম্বল গামছা। হিন্দু প্রবীণ গৃহস্থরা ধুতি ও সুন্দর কাপড়ের পাঞ্জাবি পরতে পছন্দ করেন। পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ধূতি পরলেও বর্তমানে মুসলমানরা ধূতি পরে না।

পোশাক পরিধানের পাশাপাশি বস্ত্র উপহারের প্রচলনও রয়েছে। বিভিন্ন উৎসবে-পার্বণে আত্মীয় স্বজনদের বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। বিত্তশালীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের ধর্মীয় পার্বনে পোষাক উপহার দেয়। এছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানে ছেলেরা পোশাক পেতেন মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে আবার বর শ্বশুরবাড়ির মুরব্বীদের জন্যে শাড়ি, লুঙ্গি ফতুয়া, শার্ট ইত্যাদি নিয়ে আসে। একে স্থানীয়ভাবে 'মুরব্বিয়ানা কাপড়' বলা যায়।

শীতকালে সুয়েটার, হাতে বোনা চাদর, মাফলার, কোট ইত্যাদি শীত নিবারণকারী পোশাকের প্রচলন দেখা যায়। মুন্সিগঞ্জ শহরের দোকানগুলোতে দেশি-বিদেশি নানা সূতায় তৈরি শাড়িসহ অন্যান্য পোশাক বিক্রি হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্মীয় উৎসব ছাড়া সাধারণত ধূতি পরে না।

এ জেলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের সাধারণ পোষাক শাড়ি ও ব্লাউজ। তবে অল্প বয়সিরা সালোয়ার, কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করে। বর্তমানে অল্প বয়সি ও মধ্য বয়সি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বোরকার প্রচলন বেশি দেখা যায়। বিত্তশালী মহিলারা দামি শাড়ি ও ব্লাউজ পরে। অন্তর্বাস হিসেবে সায়া বা পেটিকোট, ছোট বক্ষবন্ধনী বা ব্রেসিয়ার ও ব্লাউজ পরে।

তারা চুলের বেণী ও বিভিন্ন ছাঁদের খোপা বাঁধে। অনেকেই চুলে হালকা বব কাটে। চোখে কাজল পরে ও ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার করে। নখে মেহেদি ও নেলপালিশ লাগায়। আগে পায়ে আলতা পরত, এখন তা উঠে যাচ্ছে। হিন্দু বিবাহিত

www.pathagar.com

মহিলারা কপালে সিঁদুরের ফোটা বা টিপ পরে, এবং সিথিতে সিঁদুর লাগায়। তারা হাতে শাখা পরে।

হিন্দু-মুসলিম বিত্তশালী মহিলারা নানা রকম অলঙ্কার যেমন হার, দুল, ব্রেসলেট, বালা, চুড়ি, আংটি ইত্যাদি পরে। স্বর্ণ দুর্মূল্য হওয়ায় বিকল্প হিসেবে অনেকেই রূপা, কাঁচ ও ইমিটেশনের অলঙ্কার ব্যবহার করে। অল্পবয়সি মেয়েদের পায়ে রূপার মল পরতে দেখা যায়। অলংকার হিসেবে আগে টিকলির প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা নেই। অভিজাত হিন্দুরা কোমড়ে বিছা পরতেন। তবে সধবারা সাধারণত নাকে নথ, নোলক ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাবিজের প্রচলন রয়েছে, তামার পাশাপাশি অনেককে রূপার তাবিজ ব্যবহার করতে দেখা যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই চামড়া, রাবার ও প্লাস্টিকের জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত মুন্সিগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য মাছ, মাংস, ডাল ও সবজি। উৎসবাদিতে বিত্তশালীরা পোলাও, কোরমা, রোস্ট ও অন্যান্য উন্নত খাবারের আয়োজন করে থাকে। তারা খাবারের সঙ্গে সালাদ, বিভিন্ন ধরনের আচার ও বোরহানি খেতে পছন্দ করে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মাছ, শাক-সবজি, ডাল ও ভাতে অভ্যস্ত। ডাল সকল শ্রেণির জনগণ অত্যন্ত পছন্দ করে। দ্রব্য মুল্যের উর্ধ্বগতির কারণে অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য সবজি ও ডাল। মুসলমানরা সব ধরনের মাংস খায়। হিন্দুদের কেউ কেউ এখনও মাংস খায় না। তারা মাংসের পরিবর্তে পেয়াজ-রসুন বর্জিত সুক্তা, তিক্ত ডাল, লাবরা বা পাঁচ তরকারি খায়।

নানা ধরনের ফল যেমন কলা, আনারস, আম, জাম, কাঁঠাল সকলেই পছন্দ করে। এসব ফল এই জেলাতে বেশ উৎপন্ন হয়। রামপালের কলা এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। এ জেলার জনগণ পিঠা, পায়েস খুব পছন্দ করে। চিতই বা দুধ চিতই, ভাপা, পাটি সাপটা, কুলই (পুলি বা চন্দ্রপুলি), হাতে কাটা সরু সেমাই, মালপোয়া, পাতা পিঠা, নকশি পিঠা, দউল্যা পিঠা ও ছিটরুটি এ অঞ্চলের প্রিয় পিঠা। এ জেলার লোকজন আগে রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশ লোকই ভাতের বিকল্প হিসেবে গমের আটার রুটি খায়।

মুন্সিগঞ্জ জেলা বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা জেলার অধিবাসীদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে পরিব্রাজক মার্ক পলো ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন, এখানকার লোকজন বিভিন্ন ধরনের মাংস, ভাত, দুধ ইত্যাদি খেতে অভ্যস্ত ছিল। এই এলাকা শস্য উৎপাদনের দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিভিন্ন ধরনের শস্য, আদা, চিনি এবং অন্যান্য শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান এ দেশে এসে দেখেছিলেন, মুসলমানরা গরু, খাসি, মুরগি ও বিভিন্ন ধরনের মাছ খায়। র‍্যালফ ফিচ বলেছিলেন, সোনারগাঁ এলাকায় এক শ্রেণির হিন্দু মাছ-মাংস কিছুই খায় না। এই সম্প্রদায় ভাত, দুধ ফল-ফলাদি ও নিরামিষ খেয়ে জীবন ধারণ করে।

সিরাজদিখানের মিষ্টির খুব সুনাম রয়েছে। বিশেষ করে 'পাতক্ষীর' এখানকার শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য। দুগ্ধজাত এই পাতক্ষীর সিরাজদিখান ব্যতীত বাংলাদেশের আর কোথাও উৎপাদিত হয় না। দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে এই মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়। কলাপাতার মোড়কে রেখে এই ক্ষীর বাজারজাত করা হয় বলে একে 'পাতক্ষীর' বলা হয়। সন্তোষপাড়া গ্রামের প্রয়াত পুলিনবিহারী ঘোষ এই ক্ষীরের আদি প্রস্তুতকারক। বর্তমানে তাঁর বংশধর সুনীল ঘোষ, কালাচান ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

রাত্রিযাপন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও হিংস্র জীবজন্তুর-আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবাসস্থলের আবিষ্কার করে মানুষ। এই আবাসস্থলে অবস্থান করে মানুষ বৃষ্টি-ঝড়-রোদ ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। ঘর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় উপাদান-উপকরণ, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি। এর গঠন-কাঠামো ও নকশায় ব্যবহার উপযোগিতার বিষয়টি যুক্ত, একই সঙ্গে নির্মাণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। লোকস্থাপত্য বিষয়ে রবিউল হুসাইনের ভাষ্য,"আমাদের দেশের লোকজ স্থাপত্য মূলত গ্রামের ঘরবাড়িতে পরিদৃষ্ট যার ভিতর দিয়ে সাধারণত মানুষের জীবনযাপনের রূচি, ব্যবহারিক চাহিদা সব কিছুর প্রকাশ পায়।"[১]

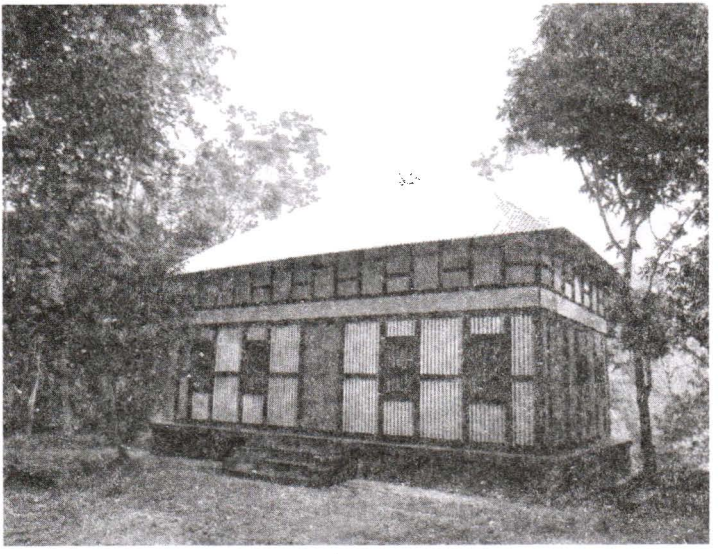

টিন-কাঠ নির্মিত ঘর

মুন্সিগঞ্জ জেলার ভূ-প্রকৃতি নিচু ও প্লাবনময়। এই জন্য এখানকার অধিবাসিরা মাটি তুলে খুব উঁচু করে বাড়ি তৈরি করে। বাড়িগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। ভরা

১. রবিউল হুসাইন, 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ; বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, সম্পাদক শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৬৭

www.pathagar.com

বর্ষায় এই বিচ্ছিন্ন বাড়িগুলো ভাসমান দ্বীপের মত মনে হয়। নিম্ন ও প্লাবনভূমি হওয়ার কারণে এ জেলায় পাকা বাড়ি খুব একটা দেখা যায় না। অধিবাসিরা টিন-কাঠের ঘরে বসবাস করতে অভ্যস্ত। দেখা গেছে লোহা কাঠ ও উন্নতমানের জাপানি সিটের ঢেউ টিন দিয়ে একটি ঘর তৈরি করতে যে পরিমাণ খরচ হয়, তা দিয়ে ঐ মাপের একটি দালান নির্মাণ করা সম্ভব। লোহা কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি এ এলাকার মানুষের মজ্জাগত। কোন ভিটিতে ঘর তৈরি করলে বসবাসে আরামদায়ক হয় এ সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে—

'দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারি তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারি তাহার ভাই
উত্তর দুয়ারির মুখে ছাই।

অর্থাৎ বসবাসের জন্য দক্ষিণ দুয়ারি ঘর সর্বোৎকৃষ্ট আর উত্তর দুয়ারি ঘর সর্ব নিকৃষ্ট।

আবহমানকাল ধরেই এ জেলার কাঠ মিস্ত্রিরা গৃহ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করে এসেছে। তাদের এ দক্ষতা অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে বংশপরম্পরায় লালিত শিল্প নৈপুণ্য। এ জেলার মত শিল্পসুষমামণ্ডিত ঘর বাংলাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না। গৃহনির্মাণ ও বিপণনের জন্য সদর উপজেলার ধলাগাঁও বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

গানের সঙ্গে বাঙালির যোগ প্রাচীন কাল থেকেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বাঙালির গীত প্রবণতার চিহ্ন বহন করে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত, "বাংলা সাহিত্যের-প্রাচীনতমো নিদর্শন, ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে রচিত চর্যাপদগুলি যে গীত হত সেগুলির রাগ আর তালের উল্লেখই তার প্রমাণ। চর্যাপদের পরবর্তীকালের অন্যতমো প্রধান কবি বিদ্যাপতি গীতিকায়। ষোড়শ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের একটি উক্তি থেকে জানা যায়, তাঁর আমলে সুদীর্ঘ কবিতাও গান হিসেবে ব্যবহৃত হত।"[১] একই সঙ্গে লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের গ্রামে প্রচলিত ছড়া, মন্ত্র, রূপকথা, উপকথা, ব্রত ইত্যাদি সুর ও ছন্দে পরিবেশিত হয়। সুরের সঙ্গে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গভীর যোগ রয়েছে। এই সূত্রেই সংগীত প্রবণতা দেখা যায় সাধারণে। নানা উৎসব, আয়োজনে গীত হয়। এই উৎসব আয়োজনে পরিবেশিত গীত বিষয়ে আতোয়ার রহমান লিখেছেন, "অনেক দেশেই হয়তো বা সর্বত্রই উৎসব-উপলক্ষের বহু গান প্রচলিত রয়েছে। লোকসাহিত্যের আলোচনাদিতে এই গানগুলির সাধারণ পরিচয় 'ব্যবহারিক গীত' বা Functional song বলে।"[২]

লোকসংগীত মুখে মুখে প্রচারিত হলেও বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। এরই মাধ্যমে লোকসংগীত জনমানুষের কাছে প্রসারিত হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতম মাধ্যম লোক সংগীত।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় লোকজ সংগীতের বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে উদাস করা দুপুরে রাখালের বাঁশি ও পাখির ডাক, ভরা নদীর পাল তোলা নৌকা, শ্যামল শস্য খেত অতি সহজেই এ অঞ্চলের ভাবুক মনকে সংগীতমুখর করে তুলেছে। বিয়ের গান, কন্যা বিদায়ের গান, শরিয়তি-মারফতি গান, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদী গান, বেদের গান, বেহারাদের গান, জারি-সারি ও ভাটিয়ালী গান, জেলার গণমানুষ ও তাদের চেতনাকে করেছে সরস ও গভীর অনুভূতিপ্রবণ।

জেলার কতিপয় উল্লেখযোগ্য গান :

১. মরমি ও দেহতত্ত্ব গান

নৌকার যতন করলি না বেপারি
নতুন নৌকা ঘাটে বাইন্ধা
নোনারে কেন খাওয়ালি।
নৌকার যতন ...

---

১. আতোয়ার রহমান 'ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া, লোক সাহিত্যের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮৪, পৃ. ১১৪।

২. আতোয়ার রহমান, 'মেয়েলী গান," প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

নৌকার আগায় পাছায় মোমের বাত্তি
মালখোপে হয় ডাকাতি
নৌকার যতন ... ।
নতুন নৌকা ঘাটে বাইন্ধা
অসময় ক্যান ঘুম গেলি ।
গায়ক– কৃষ্ণ বাউল চিত্ত, ইদ্রাকপুর, মুন্সিগঞ্জ ।

২.

আমারে চিনি না আমি পরের ধান্দায় দিন কাটাই
পরকে ভালোবাসি সদাই নিজকে কভু চিনি নাই ।
মান আরাফা নাফসাহু হাদিসেতে পাই
নিজের রুহু না চিনিলে, চিনব না যে মালেক সাঁই
আমারে চিনি না ... । – লৌহজং অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ।

২. মুর্শিদী গান

মাওলা তোর লাইগারে, মুর্শিদ তোর লাইগারে
দেশ বিদেশে ঘুরিরে মাওলা তোর লাইগারে
লাহুতদ দুনিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা
পাথরও ভাসিয়া চলে, ডুবিয়া চলে শোলারে
মাওলা তোর ...
নিরাঞ্জনে গড়ছেরে নৌকা, বানছে সারি সারি
সেই নৌকার বেপারি আমার মুর্শিদ চাঁন কাণ্ডারীরে
মাওলা তোর ... ।
–টঙ্গিবাড়ি থেকে সংগৃহীত ।

৩. বিচ্ছেদী গান

আমার পরান যাইবার আগে
আরে আমার জীবন যাইবার আগে
দেখাও তারে, পরান সখিরে ।
ও তার আশায় আশায় জনম গেল শেষে
তারে না দেখিয়া যদি মরি
আমার দাগ থাকবে অন্তরে রে
আমার পারান ... । গায়ক– খালেক বয়াতি, টঙ্গিবাড়ি ।

৪. মারফতি ও শরিয়তি গান

মারফতের দেশে যদি যাবি রে
আগে মারফতের দেশে যদি যাবি
অমূল্য ধন বিক্রি করে বিনা মূল্যে পাবি
আগে মারফতের ...

www.pathagar.com

সে দেশের এমনি রীতি, গুরুকে কর পতি
সে দেশের আসল মতি, নিঝুম ঘরের চাবি
খুল্লে তালা দেখবি খেলা, জ্যোতির্ময় এক ছবি
আগে মারফতের ... ।

গায়ক– খালেক বয়াতি, টঙ্গিবাড়ি ।

২.
শরিয়ত হইল ঘরের বেড়া
শক্ত কইরা দিতে হয় গো, শক্ত কইরা দিতে হয় ।
উদলা ঘরে শিয়াল কুকুর রয় ।
ঘরের বেড়া না থাকিলে
সেই ঘরেতে কিছু থুইলে
সব লইয়া যায় কাউয়া চিলে, দেখ না–
ওরে মন, মনরে–
যদি চোরা কাবু পায়
শিং কাটিয়া ঘরে যায়
মাল খানার উপর যাইয়া
সর্বস্ব ধন লইয়া যায়
উদলা ঘরে শিয়াল কুকুর রয়
হায়রে উদলা... ।

– মৃত মারফত আলী বয়াতির গাওয়া গান, টঙ্গিবাড়ি ।

৫. বিয়ের গান

মাইফল মাইফল হারামজাদা
যাওরে মাইফল বাজারে ।
বাজারেতে যাওরে মাইফল
কিনবো কি সালেমার বাটা রে
কিবা কিনব সালেমার বাটা রে ।
সালেমায় বড় কালা রে ।
মাইফল মাইফল হারামজাদা,
যাওরে মাইফল বাজারে ।
হইয়েছে হইয়েছে সালেমায় কালো
সালোমায় গলার মালারে
মাইফল মাইফল হারামজাদা
যাওরে মাইফল বাজারে ।
বাজারেতে যাইয়ারে মাইফল
কিনবা কি সালেমার ব্লাউজ রে ।

বিঃ দ্র : মাইফল = বরের নাম
হারামজাদা = আদর অর্থে ।

www.pathagar.com

সালেমায় = কনের নাম।
বাটা রে = বাটার সাজ; কনের জন্য শাড়ি, গহনা কসমেটিক্স।
কালারে = গায়ের রং।

–গজারিয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

৩.
একলা হইয়া যাওগো দামান
দোকলা হইয়া আইসো গো
ও সোনার দামান গো।

৪.
ময়নার মায়ে কান্দে গো ময়নার বিয়া দিয়া
ঘর শোভা ময়না গো নাগো দিতাম বিয়া
ময়নার বাপে কান্দে গো ময়নার বিয়া দিয়া
ময়নায় আমার বুকের মানিক, নাগো দিতাম বিয়া।
ময়নার বইনে কান্দে গো, ময়নারে বিয়া দিয়া
বুজি আমার খেলার সাথী কেনে দিলা বিয়া
ময়নার ভাইয়ে কান্দে গো ঘরের কপাট ধইরা
চান্দের বাত্তি বোন গো আমার কেন গেল লইয়া।

৬. বেহারার গান

আল্লা বলো (সর্দার)
চলন চলো (সকলে একত্রে)
চলন চলোরে–
আল্লা বলোরে

যামু শ্বশুড় বাড়িতে (সর্দার)
আল্লা বলো– (সকলে)
শ্বশুর বাড়ি মজাহে
আল্লা বলো।
মজার মজার খাবার হে (অতি জোরে)
আল্লা বলো হে (জোরে)
মজার মজার খাবার হে
জোরে চলো হে
চল চল চল হে, মজার মজার খাবার হে
হে হে হে হে... হে হে হে...

২.
সুন্দরী বৌ গো
পাল্কীতে বসা গো
এদিক ওদিক হইলেগো

www.pathagar.com

পইড়া যাইতে পারোগো
ঠিক মতে বসো গো
সুন্দরী বৌ গো।

৩.
পোলার মা গো
বউ আউগ্যাইয়া নে গো।
এমন বউ আনছি গো
আসমানের চান গো
তোমার কপাল ভালো গো
বউ রাইন্দা দিবো গো
পাও ঝুলাইয়া থাকবা গো
বকশিস দেও গো
পোলার মা গো।

পোলার বাজান গো
চান্দের মাইয়া আনছি গো
তামাক সাইজ্যা দিব গো
বকশিস দাও গো
পোলার বাপ গো

৭. বেদের গান
খা খা খা
বখ্যিলারে খা
কৃপন্যারে খা
খেলা দেইখ্যা যে পয়সা না দেয় তার নানীরে খা।

২.
সোনার বরণ লক্ষ্যাইরে আমার
বর্ণ হইল কালো
কি সাপে দংশিল লক্ষ্যাইরে
তাই আমারে বলোরে
বিধির কি হইল!

তথ্যসূত্র : মুন্সীগঞ্জ জেলার লোকগীতির অতীত ও বর্তমান, অধ্যাপক হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক।

৮. গনি মুন্সীর গান

গ্রাম্য গায়ক হানিফ মাঝির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় গনি মুন্সীর গানগুলো। এ গান গুলোর উপজীব্য বিষয় যাই হোক না কেন এর আধ্যাত্মিক মূল্য অনেক।

www.pathagar.com

১.
ও নিষ্ঠুর বন্ধুরে কানতে বুঝি
আমায় আনলিরে জগতে
আমার জনম অবধি সুখ হইলো না
জনম গেল কান্দিতে ...ঐ ।
ভবে মানুষ কি পাষাণ
কারো না গলে প্রাণ, আমার দুঃখ দেখে
আমার দুঃখ দেখে গাছের পাতা
ঝইরা পড়ে মাটিতে...ঐ ।
আমার ভাগ্যের এমনি ফল
সুধা হয় গরল মধু হয় তিতে
আমার দুঃখ দেখে বনের পশু
তারা কানতে আছে বনেতে...ঐ
ভেবে আব্দুল গনি কয়
আমার কানতে যদি জনম যায়
দুঃখ নাই তাতে
আমার মনেরি বাসনা
আর যেন আসি না
তোমার নামের কলংক করিতে ।

২.
কোরান খান পড় কার লাগিয়া ও মুন্সি মিয়া
কোরান খান পড় কার লাগিয়া ।
কোরান হইলো খোদার মুখের বাণী
তাজিম কর দিন রজনী
পড় কোরান অর্থটি বুঝিয়া-ও মুন্সি মিয়া ।
কারো বন্ধু যদি পত্র লেখে
সেকি তার পত্রতে থাকে
খবর গুলি দেয় শুধু লেখিয়া...
প্রথমে ঠিকানা ধর জিলা হয় আদম শহর
পোস্টফিস রসুলপুরে গিয়া
সেই জাগাতে যে গিয়াছে
জিন্দা থাকতে সে মরেছে...ঐ
কোরানে খোদারে পাইছনি খুঁজিয়া...ঐ ।
দিল কোরানে না পড়লে
এ আয়াত কোরানে পাবি না
মানব দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা...ঐ ।
কাফ, লাম আর সিন দিয়া
কলবে গেছে মিলিয়া, সর্ব গায়ে আলেফের চিত
মুখেতে বে-র ঘটনা ... মানব দেহের... ।

www.pathagar.com

৩
সৃজন করিয়া এতিম সন্তানে
তুমি যদি নাহি কর করুণা
সারাটি জীবন তোমার লাগিয়া
আশা-পথ পানে দয়াল আছি গো চাহিয়া
তুমি অন্তরে থাকিতে অন্তরে থাকিয়া
নিরবধি করিতেছ ছলনা...ঐ ।
অভাব অশান্তি মোহ সকলে
রোগ ভোগ আলস্যতা আসে দলে দলে
তোমার কৃপা বিনে আমি বাঁচিব কেমনে
কেমনে করি তোমার সাধনা । ঐ

দুর্বল দেখিয়া সদয় হইয়া
নিজ গুণে যদি নাহি লহগো টানিয়া
কে আছে আমার কেমন করিয়া
ভব সিন্ধু উতারিব বল না । -ঐ
এই ঘোর বিপদে পাগল গনি চান্দে
তোমার পথে মতি যেন আমার সদায় থাকে
যেন এ বিপদে আনন্দে আললাদে
তোমার নামে হয়ে থাকি মাতোয়ারা । ঐ

তথ্য সূত্র : রব মস্তান, নাতি গনি মুন্সী, কুসুমপুর ।
মোঃ হানিফ বয়াতি, পিতা: আব্দুল আলী কুসুমপুর ।

৯. শাচাই শাহ্-এর গান

আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফকির শাচাই শাহ । প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে তিনি শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণকরেন । তাঁর মাজার আটপাড়া ইউনিয়নে তারাটিয়া গ্রামে অবস্থিত । তাঁর প্রোশিষ্য আনোয়ার হোসেন দিদার লৌহজং উপজেলার বাসিন্দা । তিনি শাচাই শাহ এর গান পরিবেশন করেন এবং নিজেও গান রচনা করেন । তাঁর কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা হলো :

১.
সেকি কারো ভয় করে
দেখলে শমন পালায়
সে হইয়াছে মার্কা মারা
দয়ার প্রেমের প্রেমিক যারা
সে গিয়েছে প্রেমিক যারা
প্রেম ছাড়া আর থাকে না
বস্তুতত্ত্ব বসায় সে যে পুরায় মনের বাসনা,
কুল মানের করে না ভয়
আমার সনে তাঁর পরিচয়
দয়াল চরণ করে আশ্রয়

www.pathagar.com

একজনারে বানছে তাঁরা।
শাচাই শাহ্ কয় ইসমাইলরে তুই হবি ভব পার
ভবে কয়বার আইলি কয়বার গেলি, করলি না তার সুরাসার।
সুপথে তর রুচি হয় না, কুপথে হতে মন ফিরে না
শেষে কাঁদলে আর পাবি না
লাভে মূলে সকল হারা।।
২.
মনের মানুষ অবুজ বাঁকা
মানুষের মধ্যে মানুষ থাকা
সাধন করলে পাবি দেখা
অপরূপ এক বাজিকর
গুরু শাচাই বলে মন কি করলি
তুই আপন ঘরে করলি চুরি
তোর কপালে বৈঠার বাড়ি
ডুবব যে দিন দমের নাও।

১০. মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁ-এর গান

মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁ (বয়স ৯৫) পিতা– আব্দুল হাসিম খাঁ, গ্রাম– খিলাপাড়া, উপজেলা–সিরাজদিখান গল্পকথক হিসেবে এলাকায় বহুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গান দেয়া হলো—

মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁ

www.pathagar.com

ওরে ডাক দেখি মন তারে
রামের ভাই বীর হনুমান রাম রাম সদাই করে
আবার ন্যাংড়া আতুর লুলা হইলে মায় কি ফেলাইতে পারে
অন্ধ পুত্র হৈলে পরে মায় কোলে তুইল্যা লয় তারে
হৃদয় ছিড়া দেখায় মায়রে রাম বসাইছে হৃদয় মাঝে
ওরে ডাক দেখি মন তারে।

১১. আনোয়ার হোসেন দিদারের গান

আনোয়ার হোসেন দিদার (বয়স ৫২) লৌহজং কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। তিনি আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন এবং পরিবেশন করেন।

১
মন আমার সাধন ভজন হলো কই হলো কই
মন যে আমার রঙের ঘোড়া
এখনো না হলো সই না হলো সই
মনরে মিছে মায়া মরীচিকার পিছে
জনম গেল ঘুরে মিছে মিছে ও মনরে।
জনম গেল ঘুরে মিছে
রং মাখিয়া সং সাজিলাম
মুখে আমার ফোটে খই ফোটে খই।
আমি না জানিলাম গুরুতত্ত্ব
না বুঝিলাম পরম সত্য ও মনরে।
প্রজাপতির মতো মত্ত
আগুনে ধাবিত হই প্রাণ সই
গেলো না মোর কামের গন্ধ
কিসে হবে প্রেমানন্দ ও মনরে
আনোয়ার কয় সদানন্দ
নিত্যনন্দ রলো কই রলো কই।

২
সোনার নাও পবনের বৈঠারে
প্রেমের পাল উড়াইয়া হায়রে
প্রেমের পাল উড়াইয়া
আমার দয়াল নামের সারি গাইয়া
যাইও তরী বাইয়ারে।
মাল্লা ছয়জন বাধ্যকরি
চালাইও যে তরী হায়রে
চালাইও যে তরী
ওরে তা না হলে যাবে মারা
অকুল সাগরেরে।

www.pathagar.com

তরীর মাঝে আছে তোমার অমূল্য রতন
দিন থাকিতে ওরে মাঝি কইর তার যতন।
ওরে তা না হইলে মদনা চোরা
নিবে চুরি করে রে
মুর্শিদ ধ্যানে চৈতন্য
দিও নদী পাড়ি হায়রে
দিও নদী পাড়ি।
ওরে হেলে দুলে যাবে কুলে
ভয়কি ঢেউ মার ঝড়েরে
চৌদ্দ পোয়া তরীর ভিতর
দয়াল মুর্শিদ আছে হায়রে
দয়াল মুর্শিদ আছে।
ওরে আনোয়ার কয় দিন থাকিতে
চিন মনা তারেরে।

১২. জীতেন চন্দ্র বর্মণের গান

জীতেন চন্দ্র বর্মণ (বয়স ৫০) লৌহজং উপজেলার ঝাউটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন জেলে। মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে তিনি মুখে মুখে গান রচনা করেন এবং বিভিন্ন আসরে তা গেয়ে শোনান। লোক মুখে তার প্রায় শতাধিক গান প্রচলিত আছে।

জীতেন চন্দ্র বর্মণ

www.pathagar.com

জীতেন চন্দ্র বর্মণের কয়েকটি গান তুলে ধরা হল :

১

দয়াল তোমারি লাগিয়া কান্দে আমার হিয়া
আমার ব্যথা কি দয়াল তুমি বুঝ না
হৃদয় মাঝে তোমার স্মৃতি আজো ভুলতে পারি না
তোমার স্মৃতি বুকে ধরি মরি ধুকে ধুকে
তোমার মতো দয়াল কাউকে দেখি না
শয়নে স্বপনে ভাসে রূপ নয়নে
কেমনে সইবো আমি তোমার যন্ত্রণা।
শুনিলে তোমার কথা দূরে যায় মনের ব্যথা
শত যন্ত্রণার মাঝে পাই যে সান্ত্বনা
কেমন তোমার হিয়া, পাষাণ সাজিয়া
আমার মন নিয়া করছ ছলনা।
দয়াল তোমার লাগি কান্দিয়া নিশি জাগি
কান্দিয়া ভিজাই বিছানা।
দেও যত আঘাত পাই যেন সাক্ষাত
জীতেন দাস কয় তোমার গুণ বললে ফুরায় না।

২

যার তার সাথে প্রেম করিলে
দুই দিন পরে বিচ্ছেদ ঘটে
সখিরে আর যাব না কদমতলা বান্ধা ঘাটে
তারা দেখায় এই নমুনা
সাজে তারা কাঞ্চা সোনা
বন্ধু সাজিয়া তারা স্বার্থ লোটে
মুখে কোকিলের বুলি সব সময় থাকে ঠোঁটে। ঐ
গলায় পড়ে নামের মালা
লোক সমাজে করে খেলা
ধর্মকর্ম তাদের মধ্যে নাইরে মোটে
খাইবার বেলায় ভাত না ঘটে
হাজার টাকার শাড়ি জোটে। - ঐ

স্বার্থবাদী মানুষ যারা
আল্লা, হরি মুখের দ্বারা
সত্যেরে মিথ্যা কইয়া কিরা কাটে
জীতেন দাস কয় পাবি না রেহাই
যেদিন উঠবি বাঁশের খাটে। ঐ

৩

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রাসুল
ঐ নাম করিও না ভুল

www.pathagar.com

ঐ কলেমা পড়লে পাইবা আল্লা রাসুল
ঐ নাম তোমার চিরসাথী
যেমন আঁধার ঘরে জ্বলে উঠবে নূরের বাতি।
জপ ঐ নাম দিবা রাতি
সকল শান্তির মূল ঐ নাম
ঐ নামের সুধা না খাইয়াছে যারা
তারা কিন্তু হইয়া গেছে জীবন্তে মরা
আল্লা রাসুল পাইয়া তারা হইয়াছে মাশগুল।
কাঙ্গাল জীতেন দাস হয় অতি গুনাগার
পার করহে দয়াল নবী ভরসা তোমার
পাপী তাপীর এই মোনাজাত করিও কবুল।

৪

প্রেমের আঘাত যার অন্তরে পুইড়া দেহ অঙ্গার হয়
বন্ধুর প্রেমের ছলনা কি প্রাণে সয়
স্বার্থ প্রেমের মিষ্টি কথায়
কথা দিয়া প্রাণ কাইরা নেয়
লোভ লালসা দিয়া ভোলায়
ব্যর্থ হইলে প্যাঁচ লাগায়। - ঐ
সূক্ষ্ম প্রেম হইলে পরে সে প্রেম থাকে চিরতরে
সূক্ষ্ম প্রেম কেঁদে মরে।
দুই দিকে দুই নদী বয়-ঐ
শোন যত প্রেমিকেরা না জানিয়া প্রেমের ধারা
জীতেন হৈল সর্বহারা তিলে তিলে জীবন ক্ষয়।

১৩. খালেক বয়াতীর গান

আমার এই যৌবন গেল চুল পাকিল
মনতো আমার বুড়া হয় না
আমার এই যৌবন গেল...
মনে কয় যুবতী কেন (২)
আমার সাথে কথা কয়না।

দিনে দিনে দিন ফুরালো, মন তো আমার হয় জোয়ান–
আমার মনে বলে বিয়া করি
শুধু কয়ডা টাকার টান গো (২)
হইল না আর সাধন ভজন
হারাইলাম অমূল্য ধন
বিফলে গেল জনম, মরার কথা স্মরণ হয় না।
আমার এই...

www.pathagar.com

চামড়া গেছে থোৎরা খাইয়া
দাড়ি পাইক্কা কদম ফুল–
মনে বলে কলপ দিয়া, কালা করি মাথার চুল গো (২)
এবার তেরাসিঁথি নক্‌শী কাটি
করলাম কত বাবুগিরি
একলা ঘরে শুইয়া থাকি, ভাঙ্গা ঘরে ঘুম আসে না।
আমার এই...।

গায়ক– খালেক বয়াতি, টঙ্গিবাড়ি।

১৪. কাঙাল রশিদের গান

ওরে রঙের বাড়ি, রঙেরই ঘর, রঙেরই দালান
তোমার নীল দরিয়ায় উঠবে যেদিন রঙেরই তুফান
রঙিলারে রঙ বেরঙয়ের গাইও রঙিন গান।
ও রঙিলারে–
ক্ষুধার শত্রু বেইমানরে, হাকিমের শত্রু মিছা
টাকার শত্রু মকদ্দমা, লুচ্চার শত্রু পিছা–
ঘরের শত্রু আগুনরে, মানুষের শত্রু রাগ
হাতের শত্রু গারুরে, পাখির শত্রু খাঁচা
হাতির শত্রু বড়ইর দানা, পোকার শত্রু পেঁচা।
রঙিলারে...।

– কাঙাল রশিদ, টঙ্গিবাড়ি।

১৫. দেশাত্মবোধক গান

অন্তরে অন্তরে দেখ মানুষ চিন্তা করে
বিক্রমপুরের গুণের কথা করি বর্ণনা ভাইরে
মুন্সিগঞ্জের গুণের কথা করি বর্ণনা।
সব গাছের আছে রে প্রাণ জগদীশ বসু করেছেন প্রমাণ
রাঢ়ীখাল জন্মস্থান শ্রীনগর থানা ওরে... (২)
বৌদ্ধ ধর্মের মুকুট মণি অতীশ দীপঙ্কর মহাজ্ঞানী
জন্মস্থান বজ্রযোগিনী মুন্সিগঞ্জ থানা ভাই রে... (২)
ইয়ামেনের বাবা আদম রামপালে রাখলেন কদম
শুয়ে আছেন দর্গাবাড়ি লয়ে আল্লাহর নাম হায়রে... (২)
শেখ সাঁই আছেন হেথাই কেওয়ার তার মাজার শরীফ ছোট্ট একটি
গ্রাম রে... (২)

অন্তরে অন্তরে দেখ মানুষ চিন্তা করে
বিক্রমপুরের গুণের কথা করি বর্ণনা ভাইরে
মুন্সিগঞ্জের গুণের কথা করি বর্ণনা।

গায়ক– তাইজুল শেখ, গ্রাম- উত্তর ইসলামপুর, মুন্সিগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বাঙালির জনজীবনে উৎসবের অস্বিষ্টতা অনিবার্য। বছরজুড়ে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়। উৎসব মানুষকে নিঃসঙ্গতার বেড়া ভেঙ্গে জনমানুষের মিলনে ধাবিত করে। উৎসবের নানা ভাগ রয়েছে। কোনো কোনোটি ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় নানা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় এ উৎসব। প্রতিটি ধর্মের মানুষই নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করে। তবে বাঙালির ধর্মীয় উৎসবসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের উৎসব নয়। বাঙালির সকল ধর্মের, সকল শ্রেণির মানুষের উৎসবে রূপান্ত রিত হয়। সামাজিক ও ঐতিহ্যমূলক উৎসবসমূহ সর্বস্তরের সকল মানুষের উৎসব হিসেবে এ দেশে পালিত হয়। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উৎসব উদ্‌যাপনে নানা মেলার পত্তন হয়। এই মেলায় লোকজীবনের নানা উপকরণ ও উপাদানের সন্ধান মিলে। ফলে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বছরের বিভিন্ন সময় মেলা আয়োজিত হয়। মেলার জন্য বছর জুড়েই নানা প্রস্তুতি চলে, অধিবাসীরা অপেক্ষায় থাকে মেলা আয়োজনের। উৎসব বিষয়ে শামসুজ্জামান খান বলেন, "উৎসব শুধু উৎসব নয়, মানুষের আচরণ (Behaviour), জীবনধারণের এমনকি ইচ্ছা অনিচ্ছারও প্রকাশ। তাই কোনো সামাজিক জীবনধারাকে বোঝার জন্য উৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।"[১] লোকজ সংস্কৃতিতে মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষের চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল মেলা। যদিও বর্তমানকালে মেলা আয়োজন অনেক কমে এসেছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার কিছু উল্লেখযোগ্য মেলা হচ্ছে: কমলাঘাটের বারুণী মেলা ও দশমী মেলা, রামপালের মাঘী পূর্ণিমা মেলা ও রথযাত্রা মেলা, মুন্সিগঞ্জ রথযাত্রা মেলা, মুন্সিগঞ্জের মনসার মেলা ও কাদিরা পাগলার মেলা, দিঘিরপাড়/মূলচরের বৈশাখী মেলা, কলমা গ্রামের অম্বুচীর মেলা, টঙ্গিবাড়ির ফজু ফকিরের মেলা, নয়না গ্রামের চৈত্র সংক্রান্তি, চড়ক পূজা ও পহেলা বৈশাখের মেলা বা গলইয়া, লৌহজং-এর কদম মস্তানের মেলা, শ্রীনগরের মাগডাল গ্রামে সুলতান মস্তানের মেলা, শিং পাড়া গ্রামের চান মস্তানের মেলা, শাচাই ফকিরের মেলা, শেখর নগরের কালীপূজার মেলা, সিরাজদিখানের জিন্দা পীরের মেলা, ৫ পীরের মেলা, দোসর পাড়ার বটতলার লালন মেলা ইত্যাদি।

১. বৈশাখী উৎসব ও মেলা

বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষে বৈশাখী উৎসব ও মেলা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রচলিত হওয়ার পর নববর্ষ পালন শুরু হয়েছে, এমনটি ধরে নেওয়া যায়। আকবর বাদশাহর সিংহাসনে আরোহণের হিজরি বছরকে (৯৬৩ হিজরি - ১৫৫৬ খ্রি.) গণনায় নিয়ে যে 'ফসলি হিজরি' প্রবর্তন করা হয়, তাই কালক্রমে 'বাংলা সনে'

১. শামসুজ্জামান খান, 'বাংলাদেশের উৎসব', বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন- ৬৫, হাবীব-উল-আলম (সম্পা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃ.৫

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয় ; মুর্শিদাবাদের নবাবগণ কর্তৃক আঠার শতকের গোড়ায় নববর্ষ উপলক্ষে 'পুণ্যাহ' উদ্‌যাপন করার ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জের অনেক অঞ্চলে বৈশাখী মেলা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে মূলচরের বৈশাখী মেলা, টঙ্গিবাড়ির বৈশাখী মেলা, লৌহজং, শ্রীনগর ও গজারিয়ার বৈশাখী মেলার শতবছরের ঐতিহ্য রয়েছে। পূর্বে খুব জাঁকজমকের সাথে মেলা উদ্‌যাপিত হতো। কোলকাতা থেকে যাত্রাদল, লাঠিখেলার দল, বাদকদল মেলায় আসত। বর্তমানে মেলার জৌলুস কমে এসেছে। পদ্মা নদীর ভাঙন ও একাধিকবার গতি পরিবর্তনের কারণে মেলার স্থান বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। মেলায় শিশু-কিশোরদের খেলনা সামগ্রী বিভিন্ন ডিজাইনের মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেতের হস্তশিল্প, মৌসুমী ফল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে মেলার প্রধান আকর্ষণ জিলিপি, লাড্ডু, নিমকি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রকমের মিষ্টি। যারা মেলায় আসে তারা অবশ্যই কিছু মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরে। পহেলা বৈশাখে গ্রামাঞ্চলে মিষ্টি খাওয়ার প্রচলন আছে। মেলার সাধারণ চরিত্র অনুসারে এই মেলায়ও হরেক রকম পণ্যের পসরা বসে। সকল স্তরের মানুষের আনাগোনায় ও বেচাকেনায় মেলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত সরগরম থাকে। বাংলা নববর্ষকে উৎসবমুখর করে বরণ করার পেছনে সবার মনে একই বাসনা, বছরের প্রথম দিনটি আনন্দ, উৎসব ও সুখ-শান্তির মধ্যে কাটলে বছরের সামনের দিনগুলি ভালোভাবে কাটবে।

২. পৌষ-পার্বণ

পৌষ-পার্বণ হিন্দু সমাজের একটি জমকালো ও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ লোক উৎসব। পৌষ-পার্বণ পৌষ সংক্রান্তির একটা অংশ। পৌষ মাসে গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর গ্রামের চিন্তামণি দাসের বাড়িতে, আখরার বাজারের পার্শ্বে এবং মধ্য বাউশিয়ার হীরালাল মাস্টারের বাড়িতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে কলা পাতায় খাবার পরিবেশন করা হয়। পৌষ-পার্বণ-এ মেলাও বসে। তিন থেকে সাত দিন ব্যাপী এই পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।

এই পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কীর্তন গাওয়া হয়। আর এই কীর্তন গানে ঢোল, দোতরা, মন্দিরা, বাঁশি, খোল করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কীর্তনের কয়েকটা পদ :

(১) রাধে রাধে রাধে গো রাই
রাধে যমুনার পারে।
(২) খসিয়া পড়িলে নাকের সোনা মাগো
চিহ্ন যায় গো জানা।

৩. হালখাতা

হালখাতা ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের একটি উৎসব। বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিন ক্রেতারা ব্যবসায়ীদের পাওনা টাকা পরিশোধ করে। টাকা বাকি রাখাকে ক্রেতারা

www.pathagar.com

অসম্মানের কাজ বলে মনে করে। এই টাকা পরিশোধ করে তারা নতুন হিসাব খুলে। হালখাতাকে কেন্দ্র করে দোকানিরা ক্রেতাদের মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করে।

৪. চৈত্র সংক্রান্তির মেলা

সংস্কৃত 'চক্র' থেকে চড়ক শব্দটির উৎপত্তি। এর মূল অর্থ বর্ষচক্র শেষ করে বছরের সমাপ্তি ঘোষণা। এটি চৈত্রমাসের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে পালনীয় যদিও হিন্দু ধর্মীয় পূজানুষ্ঠান তবুও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলা সংস্কৃতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের মত মুন্সিগঞ্জেও চৈত্র সংক্রান্তিতে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। এই মেলার অন্যতম আর্কষণ হলো চড়ক পূজা; একে শিব বা ধর্মঠাকুরের 'গাজন উৎসব'ও বলা হয়। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "চড়কপূজা আদিম কৌম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক কৌমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া বাণ ফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যেসব অনুষ্ঠান চড়কপূজার সঙ্গে জড়িত, তার মূলে সুপ্রাচীন কৌম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান।" বর্তমানে মানুষের প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন নরবলির পরিবর্তে পাঁঠা, কবুতর ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। সাংসারিক মঙ্গল কামনায় নানাবিধ 'মানত' করে চড়কপূজার আয়োজন করা হয়। এসব মানতের মধ্যে 'পুত্র-সন্তান কামনা', 'রোগ-ব্যাধির উপশম', 'কন্যা বিবাহ', 'মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ' ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে।

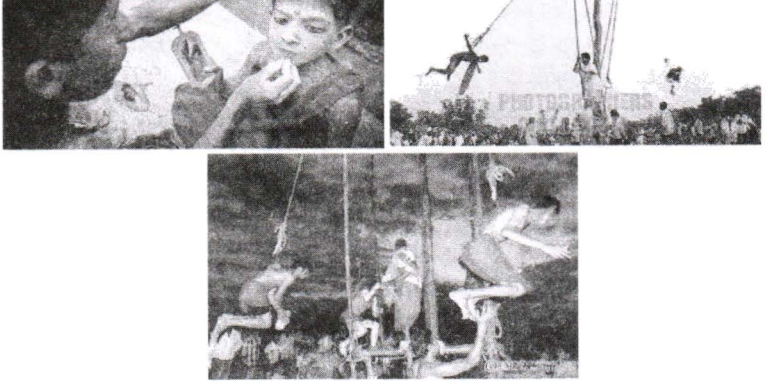

চড়ক পূজা

বৈশাখ মাস শুরু হওয়ার পাঁচ বা সাতদিন পূর্বে চড়কপূজা শুরুর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি খোলা স্থানে একটি খড়ের চালার নিচে শিবকে নামানো হয়। এই স্থানকে বলা হয় 'শ্মশান'। মাটিতে শিবের একটি শোওয়ানো মূর্তি বসানো হয়। এ

www.pathagar.com

মূর্তির উপর একটি লম্বা পাথর রাখা হয়; পাথরটি শিবলিঙ্গের প্রতীক। খড়ের চালার চারদিকে চারটি কলাগাছ পুঁতে দেওয়া হয়। পূজার শুরুতে পূজারি বা দেয়াসি (<দেবদাসী, সং) কাঁসার বাটিতে বেল পাতা, জবা ফুল, জল, কাঁচা দুধ ইত্যাদি দিয়ে শিবের স্থানটিকে স্নান করান, আর মন্ত্র পাঠ করেন। অতঃপর ঘিয়ের প্রদীপ সাজিয়ে আরেকটি মন্ত্র পাঠ করলে শিব এসে সেখানে অধিষ্ঠিত হন। একটি নতুন পাতিলে ফুল, আতপ চাল, কাঁচা দুধ, গঙ্গাজল ইত্যাদি ভরে পার্বতীকেও নামানো হয়। পূজারি পাতিলটি শিবের অধিষ্ঠানের চারদিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে সেখানে স্থাপন করেন। পাঁচ দিন বা সাত দিনের আয়োজনে একদল যুবা-তরুণ বাঁশের কাঠি দিয়ে বিভিন্ন পশুপাখি, ঘোড়া ও মাছের মূর্তি তৈরি করে সারাদিন ঢাকঢোল বাজিয়ে নৃত্যগীত সহযোগে পাড়ায় পাড়ায় প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। এই প্রক্রিয়াকে 'গমীরা' বলা হয়। কোনো গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনো ব্যক্তি গমীরা মানত করে এবং নিজে এর সব ব্যয়ভার বহন করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পূর্বে শেষ হয় গমীরা। ঐদিন ঠিক সূর্যাস্তের পর শিবের অধিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পূজা। পূজা উপলক্ষ্যে অনেক মানুষ-জনের সমাবেশ ঘটে। ঐ সময় একটি কলাগাছে বেঁধে রাখা কবুতরকে কালী বা চামুণ্ডার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণকারী দেয়াসী এক কোপে কেটে ফেললে পূজা শেষ হয়।

৫. কালী গাছতলা

গজারিয়া উপজেলার একটি বটগাছকে কেন্দ্র করে বৈশাখীর মেলার আদলে এই কালগাছ উৎসবটির তথা মেলার আয়োজন করা হয়। কালীগাছতলা অনুষ্ঠানটি পুরাতন বছরের শেষ এবং নতুন বছরের শুরু অর্থাৎ নববর্ষকে বরণ করার জন্য আয়োজন করা হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা এই বট গাছটিকে পূজা দেয়, যা গাছ পূজা নামে পরিচিত। এ কারণে লোক উৎসবটির নামকরণ হয়েছে কালী গাছতলা।

কমলাঘাটের বারুণী মেলা সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত। এই মেলায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পূণ্যার্থীরা আসে। কমলাঘাটের দশমী মেলাও এই অঞ্চলের বিখ্যাত একটি মেলা। দূর্গাপূজার দশমীকে কেন্দ্র করে এই মেলা বসে।

রামপাল মাঘি পূর্ণিমা মেলাও এ অঞ্চলের একটি বিখ্যাত লোক মেলা। এই মেলায় বহু লোকের সমাগম ঘটে। রামপালে রথযাত্রা উপলক্ষেও মেলা বসে থাকে।

মুন্সিগঞ্জ শহরে রথযাত্রা মেলা ও মনসার মেলা লোকমেলার অন্যতম উদাহরণ। মনসার মেলা চলে পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে মেলায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় মেলার সময়-সীমা কমানো হয়েছিল। কখনো ১৫ দিনে আবার কখনো ২০ দিনে মেলা বন্ধ করে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

৬. দমের মাদার

মাঘ পূর্ণিমার মঙ্গলবার গোয়াগাছিয়ার জামালপুর গ্রামে রহম আলী ফকিরের বাড়িতে তার মাজারকে কেন্দ্র করে একটা বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

www.pathagar.com

সেখানে থাকে গান, বাজনা, তবারক ইত্যাদি। তাদের ভাষায় এই আচার অনুষ্ঠানকে বলা হয় দমের মাদার। দমের মাদার অর্থ হচ্ছে জান নিয়ে খেলা।

দমের মাদার

এই উৎসবে দুইটি বাঁশ জোড়া দেওয়া হয় এবং জোড়া বাঁশটি লাল হলুদ কাপড় দিয়ে মোড়ানো হয়। প্রথা অনুযায়ী উৎসবের আগে সমস্ত গ্রামবাসিকে জানাতে হয়। আর এর জন্য একটি দল আছে। যাদের অধিকাংশ মৃগী রোগী। এই দলটি গ্রামের কোনো বাড়িতে গিয়ে, ঢাক ঢোলের বাজনার সাথে এক বিশেষ পদ্ধতিতে নাচে। তাদের ডান হাতে জোড়া বাঁশটি থাকে। অন্যরা তাদের অনুসরণ করে ঘুরে ঘুরে নাচে। এর আগেই ঐ বাড়ির কোনো গৃহস্থের উঠানের মাঝে এক কলস পানি ঢেলে দেয়।

ঐ দলের লোকেরা নাচতে নাচতে এক সময় প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে যায়। ইতোমধ্যে ঐ বাড়ির মালিক চাল, ডাল টাকা পয়সা দেয়। তারপরে ঐ দল অন্যান্য বাড়িতে যায় এবং একইভাবে নেচে গেয়ে টাকা পয়সা ও চাল ডাল ওঠায়। এই উৎসবে আগুন ও দম নিয়ে এক বিশেষ খেলা প্রদর্শন করা হয়। মৃগী রোগীদের আগুনের ছেঁকা দেয়া হয়। কিন্তু তাদের ভাষায়, দয়ালের ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হয় না। এই চাল, ডাল টাকা পয়সা দ্বারা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবার রাতে মাজারকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয়ভাবে এটা দমের মাদার হিসাবে পরিচিত।

রহম আলী ফকির মারা যাবার পর এই আচার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন জলিল ফকির।

এই অনুষ্ঠানে মারফতি, মাইজভাণ্ডারী ও অন্যান্য গানের আয়োজন করা হয়। এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে শিল্পী আসে। মাইজভাণ্ডারী গান করেন। যেমন:-

দয়াল বাবা ক্যাবলা কাবা
আয়নাল কারিগর,
আয়না বসাইয়া দিবা কলবের ভিতর।

www.pathagar.com

এভাবে বিভিন্ন প্রকার গানের মাধ্যমে স্রষ্টার ও পীর বাবার বন্দনা ও প্রশংসা করা হয়। উল্লেখ্য যে, যারা মৃগী রোগী তাদের মধ্যে বিশ্বাস যে, মাজারের সেবা ও পীর সাহেবের সেবা করলে তারা সুস্থ হবে।

যে বাঁশ দুইটিকে লাল নীল কাপড় দিয়ে মোড়ানো হয় সেই সম্পর্কে একটি ইতিহাস আছে। পার্শ্ববর্তী ফুলতলী গ্রামের এক বাঁশলনী ফকির—এর বড় ভাইকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, এই বাঁশকে তারা যেন যত্ন করে এবং কাউকে স্বপ্নের কথা না বলে দেয়। কিন্তু সে একথা তার পরিবারের সদস্যদেরকে বলে দেয়। এতে এক দুপুরে তাঁর কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে এবং সে মারা যায়। তখন থেকে বাঁশটিকে কেন্দ্র করে ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে এ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে।

৭. আশুরা

আশুরা মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিজরি বছরের প্রথম মাস হলো মহরম মাস। মহরম মাসের ১০ তারিখে ইমাম হোসেন তার সঙ্গী-সাথীসহ কারবালার ময়দানে এজিদ বাহিনীর হাতে সপরিবারে নিহত হন। মহরম মাস তাই শোকের মাস। শিয়া-সুন্নি সব মুসলমানই এ শোক উৎসব পালন করে থাকে। তবে শিয়ারা এ অনুষ্ঠান একটু ভিন্ন ধারায় করে। সুন্নিরা আশুরা পালন করে। তারা মহরম মাসের ১ম দশদিন রোজা রাখাসহ নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। শিয়ারা মহরম মাসের ১০ তারিখে তাজিয়া মিছিল (শোক মিছিল) বের করে। চাবুক দিয়ে ছুরি দিয়ে পিঠ চাপকে রক্তাক্ত করে শোক প্রকাশ করে থাকে।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় শিয়া মতের অনুসারী লোক খুব একটা বেশী নেই। সুন্নিদের মধ্যে যারা আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করে তারা আশুরায় তাজিয়া মিছিল না করে শোকের অনুষ্ঠান করে। গ্রামে সাধারণ মুসলমান ১০ই মহরম জারি গানের আয়োজন করে। কোনো বাড়িতে মহরমের আসন বসানো হয়।

সামনে আসন রেখে ভক্তরা জারিগান শোনে। বিষয়টা কিছুটা হিন্দুদের প্রতিমা স্থাপন করার মতো। মাটির তৈরি আসনের মধ্যে অনেকে মানত করে। বিশেষ করে চোখের অসুখের জন্য এখানে মানত করে। তাদের বিশ্বাস যে এতে তাদের চোখ ভাল হয়ে যাবে। প্রথমে মিলাদ পড়ানো হয়। তারপর সিন্নি বিতরণ। এরপর সারারাত ধরে চলে জারি গান। গ্রামের সাধারণ মানুষ এ জারি গান শোনার জন্য আসরে আসেন। দুই জন গায়ক, তাদের সাথে দোহার থাকে তিন-চারজন। বাদ্যযন্ত্র থাকে- ঢোল, বায়া, দোতরা ও হারমোনিয়াম। নারী-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে উঠানে জড়ো হয়। আসরের কর্তা অনুমতি দিলে গায়ক আসরের সবাইকে শ্রেণি মতো ভক্তি শ্রদ্ধা সালাম জানিয়ে জারি শুরু করে। সিরাজদিখানের কুসুমপুর দেওয়ান বাড়ি ও চন্দনধুল তালুকদার বাড়িতে এ জারিগান হয়। হাসান-হোসেনের মৃত্যুর করুণ চিত্র জারি গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। গানের একটি ধুয়া থাকে। যেমন, "কালো কোকিল তুই ডাকিছ না কদমের ডালে।" এ ধুয়া দোহাররা বলবে আর গায়ক বর্ণনা করবে। এর পর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিচ্ছেদ গান করে। যেমন—

মহরমের দশ তারিখে কী ঘটাইলো রাব্বানা,
জয়নাল আবদীন বন্দিরে হইল এজিদের জেলখানা।

www.pathagar.com

মইরো না মইরো নারে জয়নাল জয়নাল তুমি মইরো না
তুমি জয়নাল গেলেরে মারা নবীর বংশ রবে না।
মাও রাঢ়ি ঝিও রাঢ়ি রাঢ়ি বিবি সখিনা
একই ঘরে তিন জন রাঢ়ি খালি সোনার মদিনা।

এভাবে সারারাত গান সহযোগে আশুরা বা মহরমের জারি গান চলে। হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুর কাহিনি শুনে ধর্মপ্রাণ মুসলমান চোখের পানি ফেলে।

৮. খোদাই শিরনি ও নবান্ন

খোদাই শিরনি মুন্সিগঞ্জের লৌকিক ঐতিহ্য। বাংলা বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এই শিরনির আয়োজন করা হয়। হেমন্তে ধান কাটা শেষে গ্রামের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গ্রামবাসিরা নতুন ধানের চাল তোলে ঘরে ঘরে গিয়ে। কেউ কেউ আবার চালের বদলে টাকাও দেয়। পরে সেই টাকা দিয়ে দুধ ও খেজুরের গুড় কেনা হয় এবং জোহরের নামাজের পর শিরনি রান্না করা হয় গ্রামের কোনো এক খোলামেলা জায়গায় রাস্তার ধারে। একে বলা হয় হালট। হালটের একপাশে চুলা খুঁড়ে শিরনি রান্না করা হয়। আসর নামাজের শেষে মিলাদ পাঠের পর এই শিরনি বিতরণ করা হয়। শিরনি গ্রহণকারীদের মধ্যে শিশু-কিশোরদের সংখ্যাই বেশি থাকে। সিরাজদিখান উপজেলার কাঠাতলী গ্রামে এই উৎসবটি এখনও প্রচলিত আছে।

নতুন আমন ধান গোলায় ওঠার পর বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে নব অন্ন আহারের উৎসবকে নবান্ন বলা হয়। ঢেঁকি ছাটা নতুন আমন ধানের আতপ চাল আগের রাতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নবান্নের দিন ভোরে নারকেল কোরা ঐ চালের সাথে মিশিয়ে খুব ভাল করে বাটতে হয়। গুড় অথবা চিনি মিশ্রিত জলে ঐ বাটা মিশিয়ে নবান্ন প্রস্তুত করা হয়। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। প্রথমে লক্ষ্মীসহ বিভিন্ন গৃহ দেবতা, পিতৃ-পুরুষ, গবাদি পশু এবং কাকদের উদ্দেশ্যে নবান্ন নিবেদন করতে হয়। এরপর পরিবারের সকলের এবং পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করতে হয়। শস্যদেবীকে সন্তুষ্ট করাই নবান্নের মূল উদ্দেশ্য। মুন্সিগঞ্জ জেলার কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নবান্ন উৎসব আজও প্রচলিত আছে।

৯. পাতিল সাধুর ওরস ও মেলা

সিরাজদিখান উপজেলার জৈনসার ইউনিয়নের খিলগাঁও গ্রামে আফসার উদ্দিন ওরফে পাতিল সাধুর মাজার আছে। ধারণা করা হয় তিনি লৌহজং উপজেলার কলিকাতা ভোগদিয়া গ্রামের লোক। জীবিত অবস্থায় তিনি ছালার চট ও কাঁধে একটি মাটির পাতিল নিয়ে পথে পথে হাঁটতেন। রাস্তার দোকানদারদের কাছে পাতিল পাতলে তারা খুশি হয়ে বিস্কুট, কলা, রুটি দিতেন। ঐ কলা রুটি তিনি নিজে খেতেন এবং যে কেউ চাইলে তাকে দিতেন। লোকের ধারণা ছিল সাধুর কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে যে যে

www.pathagar.com

নিয়তে খেত তার সেই বাসনা পূর্ণ হতো। শেষ বয়সে তিনি খিলগাঁও গ্রামে গনি মিঞার বাড়িতে আস্তানা গাড়েন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। যেই ঘরে মৃত্যু হয় সে ঘরকে পরবর্তীকালে মাজারে রূপান্তর করা হয়। এখানে প্রতি বছর ২৩শে মাঘ থেকে ৩ দিন ওরশ ও মেলা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। মেলাকে কেন্দ্র করে বয়াতিদের গানের আসর বসে। এ ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে বৈঠকী গানের আসর জমে। স্থানীয় গায়ক কামাল, হারুন ও পীয়ার আলী গান করেন। প্রথমে গনি বেপারী ও ওয়াহেদ আলী বেপারী মাজার দেখাশোনা করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর বর্তমানে খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, হাসেম বেপারী ও আকরাম আলী বেপারী।

১০. কদম মস্তানের মেলা

লৌহজং উপজেলার বড় নওপাড়া গ্রামে কদম মস্তানের আস্তানা আছে। প্রতি বছর ৫ ও ৬ই পৌষ ওরস হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় ১৭ই মাঘ হতে ২৪শে মাঘ পর্যন্ত ৭ দিন। মুন্সিগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য জনসমাগম ঘটে এই মেলাকে কেন্দ্র করে। দূর-দুরান্ত থেকে পাগল, ফকির, সাধুরা এ মেলায় আসেন ।

১১. চাঁন মস্তানের মেলা

শ্রীনগর উপজেলার সিমপাড়া গ্রামে চাঁন মস্তানের মাজার আছে। মাজারের চারিদিক ঢেকে রাখার জন্য অপূর্ব কারুকার্য খচিত একটি আসন নির্মাণ করা হয়েছে। কাঠের আসনটি স্থানীয় ছুতারগণ দীর্ঘ সময় ধরে নির্মাণ করেছে। লোকজ শিল্পের এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে ৭ দিনব্যাপী ওরস ও মেলা বসে। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই মাজারকে কেন্দ্র করে জাঁকজমকপূর্ণ ভেলা ভাসানো হয়।

১২. শাচাই ফকিরের মেলা

শ্রীনগর উপজেলার আটপাড়া ইউনিয়নে তারাটিয়া গ্রামে শাচাই ফকিরের মাজার ও দরগা আছে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তি এবং ১লা মাঘ ওরস ও মেলা হয়। এ উপলক্ষে বয়াতিদের গানের আসর বসে। আসরে শাচাই ফকিরের নিজস্ব গানও গীত হয়।

এসব মেলা ছাড়া পয়সা-মাইজগাঁও গ্রামের রমজান ফকিরের মেলা, হাটভোগদিয়া গ্রামের ফকির জোগাইশাহ্, মাওয়ার মালেক দরবেশ শাহ্, হলদিয়ার সাগর দরবেশ, ইয়াকুব দরবেশ, সুরুজ নূরীর ওরসকে কেন্দ্র করে গানের আসর ও মেলা বসে।

১৩. শেখর নগর ও কয়কীর্তনে কালী পূজার মেলা

শ্রীনগর উপজেলার কয়কীর্তন ও শেখর নগর গ্রামে প্রতি বছর পৌষ ও চৈত্র মাসে জাঁকজমকপূর্ণ কালীপূজার মেলা বসে। শেখর নগরের মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। প্রায় ১হাজারের বেশি পাঁঠা বলি হয়। দেশের সকল অঞ্চল থেকে সাধু সন্তগণের আগমন ঘটে এই মেলায়।

www.pathagar.com

১৪. দোসরপাড়া বটতলায় লালন শাহের মেলা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় দোসরপাড়া গ্রামে ইছামতি নদীর তীরে একটি বটগাছ আছে। সেই বটগাছ ঘিরে ২০০৪ সালে কয়েকজন লালনভক্ত সাধু সঙ্গের আয়োজন করেন। ধীরে ধীরে এর পরিসর বাড়তে থাকে। জায়গাটার নাম হয়ে যায়

দোসরপাড়া লালন শাহ্ বটতলা

লালন শাহ্ বটতলা। এখানে প্রতিষ্ঠা করা 'পদ্মহেম ধাম' নামক সাধুর আখড়া। প্রতি বছর মধু পূর্ণিমায় সারা দেশের বাউল সাধকগণসহ বিদেশি সাধকগণও এখানে উপস্থিত হন। ২দিন ব্যাপী গানের আসর ও মেলা বসে। 'পদ্মহেম ধাম'-এর প্রতিষ্ঠাতা কবির হোসেন। কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ার পরে বাংলাদেশে বৃহৎ বাউল মেলা এটাই।

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠান

১. কালের ব্রত

এক যে ছিল গৃহস্থের বউ। সে আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন কিছুই মানতো না। শাশুড়ি কইত, 'বউ তুমি এইভাবে চইল্যো না। এটা একটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর সংসার। তুমি এই সংসারের বউ। তুমি অনেক কিছু মাইন্যা চলবা। যেই দিনের যেই ফল তুমি তা ঠাকুররে দিয়া খাইয়ো।' বউ শাশুড়ির কথা শুনত না। আগে আগে সব ফল খাইয়্যা ফালাইতো। এভাবে দিন যায়। বউ একদিন গর্ভবতী হয়। সাত মাসে সতামি ও নয় মাসে সাধ দেয়। এরপর বউ-এর প্রসব ব্যাথা উঠছে। দাই আইছে, আঁতুড় ঘরে নিছে, এরপর প্রসব হইল। প্রসব হইছে কী? একটা থইল্যা। হ্যাষে থইল্যাটা ফাটাইয়া দিছে। তখন দেখে দশটা নাড়। দশটা নাড় সাপ হইয়্যা গিরস্তের বউর প্যাটে জন্ম নিছে। এরা তো গেল গ্যা। এদিকে গিরস্তের বউ এই সন্তান হারাইয়া পাগলের মতো করে। এই দশটা নাড় দশ দিকে গেছে ঠিকই কিন্তু ওরা মায়ের কাছে ফির‍্যা আহে। রাতে মার কাছে ঘুমায়।

এদিকে শাশুড়িরও বয়স অইছে। শাশুড়িও মইর‍্যা গেছে। তখন বউ পাগলের মতো করে সন্তানের জন্য। একদিন এই বউকে কালঠাকুর স্বপ্নে দেখাইছে, 'তুই কালের পূজা কর। কালের পূজা করলে তোর সন্তানরা তোর কাছে আইবো, যেইদিনের যেই ফল হেইটা কালেরে দিবি। তারপর তুই খাবি। আর তোর এই সন্তানরা তর কাছে আইয়্যা রাতে ঘুমায়, তুই টের পাস না, তুই জাগা থাকবি। ওরা যখন খোলস পাল্টাইয়া তর কাছে শুইব তখন তুই খোলসগুলি পুইড়্যা ফালাবি।' হেই বউ পরে চৈত সংক্রান্তির দিন আম দিয়া কালের ব্রত করছে। এই ব্রত কইর‍্যা ঐদিন রাতে ঘুমায় নাই। ঘুমের ভান ধইর‍্যা শুইয়্যা রইছে। যেই রাত হইছে পোলারা সব মার কাছে আইছে। ওরাতো প্রতিদিনের মতো খোলস পাল্টাইয়া মার কাছে শুইছে। মায় তো উঠ্যা হেই খোলস পুইড়্যা হালাইছে। অহন দ্যাখে দিব্যি তার দশ পোলা। দশ পোলা ঘুম থেইক্যা উঠ্যা মারে কয়, 'মা তুমি এইটা কী করলা? তোমার পাপের লিগাই তো আমরা সাপ অইয়্যা রইছি।' এর উত্তরে মা কয়, 'বাবারে আমি জানি। তবে আমি যা করছি অন্যায় করছি, ভুল করছি। যাউক আমার পাপ খণ্ডন হইছে। আমি তগো বুকে পাইছি।' তারপর দশ পোলারে মা বুকে জড়াইয়া ধরল। সবাইরে দেখাইলো। জাঁকজমক বিয়া-শাদি দিয়া সংসারি করল। আর পোলার বউগো কইল, 'বউরাগো তোমরা যেই দিনের যেই ফল হেইটা কালেরে দিবা। আগডোগ কিছু খাইবা না। আমি আমার শাশুড়ির কথা শুনি নাই, হেই পাপে আমার শাস্তি অইছে। নিয়ম-নিষ্ঠা দিয়া আচার-অনুষ্ঠান যেখানে যিটা আছে হেইটা করবা।' ঐ বউ সংসারে প্রচার কইর‍্যা দিয়া গেল যে, 'যেই দিনে যেই ফল, সেটা কালেরে না দিয়া খাইতে নাই। খাইলে সংসারের লিগা ক্ষতি অয়।'

www.pathagar.com

এই ব্রতটি করা হয় চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে। একে বলা হয় কালের ব্রত। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের এইরকম একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রথম ভাল বস্তু বা ফল দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয়।

২. মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা

দুই সই আছিল। এক সইয়ের অবস্থা খুব একটা বেশি ভাল ছিল না। আরেক সইয়ের অবস্থা ছিল মোটামুটি। যে সইয়ের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল, তার জামাই কোনো কাম-কাইজ করত না। বাড়িতে একটা উইস্তা গাছ বুইনন্যা থুইছিল, হেটোরেই যত্ন-আত্তি করত। ঐ গাছে যা হইতো, হেরে বেইচ্যা সংসার চালাতো। ওই বেইচ্যা আর কত সংসার চলে। এভাবে কয়েকদিন যায়। ঐ যে আরেক সই আছে হে আবার মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। এই সই তার সইয়েরে কয়, 'তর এমন অবস্থা তখন তুই আমার লগে আইয়্যা ব্রত কর।' এই গরিব সই তখন ঐ সইয়ের লগে গিয়ে ব্রত করা শুরু করে। এরপর দিনে দিনে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় গরিব সইয়ের অবস্থা ভাল হইতে শুরু করে। এরপর সে নিজের বাড়িতে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বইয়া পূজা করে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় এই সইয়ের সংসারে অহন খুব সুখ-শান্তি। তার পাঁচ পোলা। পাঁচ পোলার ঘরে বউরা আছে, নাতি-পুতি আছে। বুড়ির সুখের আর শ্যাষ নাই। ঐ গেরস্থ সই একই রকম আছে। এই দিকে এই সইয়ের এই টাকা-পয়সা, সুখ-শান্তি আর ভাল লাগে না। তার খালি কানতে ইচ্ছা করে। তখন সইয়ে কয়, 'এত ধন-সম্পদ নাতি-পুতি আমার আর ভাল্লাগে না। আমার খালি কান্‌তে ইচ্ছা করে।' তখন সই কইলো, 'আরে মুখপুড়ি পিছামারানি তুই চুপ কর। আগে তো তর স্বামী উইস্তা গাছের উইস্তা বেইচ্চ্যা সংসার চালাইতো, এখন কতকিছু হইছে তর। তুই কত ভাল আছত। এরকম করিস না।' সইয়ে ওরে বোঝাইয়া শোনাইয়্যা দেয়। এইভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে ও আবার সইয়ের বাড়িতে দৌড়াইয়্যা যায়। কয়, 'আমার আর ভাল্লাগতাছে না। আমি কান্দুম। আমার কানতে ইচ্ছা করে।' সই হাত ধরে, পায়ে ধরে। সইয়ে ওর বিরক্তে টিকতে না পাইর‍্যা কয়, 'যা তোর স্বামী যে উইস্তা গাছটা লাগাইয়া আগে সারাজীবন চলছে, হেই উইস্তা গাছটা উঠ্যায়া হালাইগ্যা। তারপর তোর স্বামী তরে বকবো আর তুই উইস্তা গাছটা ধইর‍্যা কানবি।' তখন সইয়ের কথা মতো সে বাড়ি যাইয়্যা চুপ কইর‍্যা উইস্তা গাছটা তুইল্যা যাইয়্যা শুইয়্যা রইছে। সন্ধ্যা হইয়্যা গেছে। এরপর রাইত পোহাইতে গিয়া দেখে একটা উইস্তা গাছের জায়গায় বহু উইস্তা গাছ হইয়া রইছে। আর সবগুলি গাছভর্তি উইস্তা। চাঙ্গারি চাঙ্গারি উইস্তা। তখন ওর মনে পড়ছে, হায় হায় এক উইস্তা গাছ আমি উঠাইয়্যা ফালাইছি, অহন দেখি কত উইস্তা গাছ হইয়্যা গ্যাছে গা। বুইড়্যা তো হেই উইস্তা বাজারে নিয়া আর সারতে পারে না।

ও তখন আবার সইয়ের কাছে দৌড়াইয়্যা আইছে। 'ও সই, তুই যে আমারে উইস্তা গাছ উঠাইয়্যা ফালাইতে কইছস আমি তো উঠাইয়্যা ফালাইছি। অহন গিয়া দ্যাহ হাজার হাজার উইস্তা গাছ অইয়্যা গ্যাছে। চাঙ্গারি চাঙ্গারি উইস্তা ধরছে। তখন সই কয়, দেখছস, এগুলি সব ঠাকুরের কৃপা। তুই আর কান্দন কান্দন করিস না।' কে শোনে কার কথা ও কয়, 'না আমি বুঝি না। তুমি আমারে কান্দনের কথা কইবায়। আমি কান্দুম। কান্দুমই। আমার আর ভাল্লাগে না।'

www.pathagar.com

তখন সই কইলো, 'তুই কাউলকা সব নাতি-পুতিরে লইয়্যা ঘাটে ছান করাইতে যাবি। ছান করাইতে নিয়া বড় পোলার বড় নাতিটারে ঘাটের খাইট্টার নিচে কুইপ্যা থুবি। আরডিরে ঠিকমত ছান করাইয়্যা লইয়্যা আবি। বড়ো নাতিডা মইর‍্যা যাইবো। হের পর, হেই নাতিডারে ধইর‍্যা কানবি।' তারপর ওই বাড়ি গ্যাছে। খুব সকালে উঠ্যা কইছে, 'বউরাগো, অগ মাথায় তেল-তুল দিয়া দ্যাও। আমি আইজকা অগ ছান-টান করামু। আমি অগ ছান করাইয়্যা এক জায়গায় বাইরমু।' তখন বউরা কইছে, 'আপনি বাইরইলে বাইরইয়্যা যান, আমরা অগ ছান করামুনে।, তখন ও কয়, 'না তেল দাও, আমিই কর‍্যাইয়্যা যাই। তোমরা আবার জলে-জুলে হালাইয়্যা দিতে পার।' বউরা তখন কয়, 'আমরা প্রতিদিন করাই, কিছু অয় না আর অহন কি অইবো।' বউরা ত্যাল-তুল দিয়া দিছে। তখন সব নাতি-পুতিরে এক লগে নামাইয়া দিছে। সব নাতিরা যখন আপুড়-উপুর কইর‍্যা ছান করতাছে তখন বড় নাতিডারে ঘেটি মটকাইয়্যা খাইট্টার নিচে ঢুকাইয়্যা দিছে। তারপর সবাইরে লইয়্যা বাড়িতে আইয়্যা পড়ছে। বাড়িতে না আইয়্যা বউগো ডাইক্যা কইতাছে, 'এ কি গো বউ! আমি অগ নিলাম পাঁচজন, অহন দেখি চাইর জন। আরেকটায় গেল কই? হায় হায়, 'ওরে তো দেখতেছি না।' তখন বড় বউ কয়, 'এ রাম মা, কি কন। ও দেহি সবার আগে আইয়্যা খাইতে বইয়্যা পড়ছে। আমি তো অরে এই মাত্র ভাত দিয়্যা আইলাম।' তখন ও যাইয়্যা দেহে সত্যই নাতি খাইতে বইছে। হায় হায়।

তখন ও আবার সইয়ের কাছে গ্যাছে। ও সই, 'তুই কি কস। আমি বড় নাতিরে খাইট্ট্যার নিচে ঢুকাইয়্যা রাখছি, হেয় দেহি আরও আগে গিয়া খাইতে বইছে। সই কয়, 'তুই অহনো বুঝস না; অহনো কান্দন কান্দন করছ। এই সব মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছা। তুই আর এমন করিস না।' না, কে কারে বোঝায়, ও আবার কয় 'না লো সই, আমি কান্দুম।' তখন সই কয়, 'ঠিক আছে তুই করবি কর। তগো তো গোলাভরা ধান, গোলা ভরা ডাইল, সব মিলাইয়্যা তগো তো পাঁচ-ছয় গোলা হইবো, তুই যা করবি কী? সব গোলা রোদে মেলতে দিবি। হের পর বুড়ারে কবি খড়ম পায়ে দিয়া হাটতে। বুইড়্যায় যখন উষ্ঠা খাইয়্যা মরব তহন তুই কানতে পারবি।'

ও তখন বাড়িতে আইয়্যা ধানের গোলা, ডালের গোলা সব গোলা দুই-তিন উঠান ভইর‍্যা মেইল্যা দিছে। আর বুইড়ারে কইছে দুই পায়ে খড়ম পা দিয়া হাটতে। 'আজকা তোমার খাওন নাই, হোয়োন নাই।' হেরপর বুইড়্যা ধানের গোলা, ডালের গোলা মেইল্যা, সব শেইত্যা-গুইত্যা বইয়া রইছে। রৌদ্রে পুইড়্যা মরব তো দূরের কথা বুইড়্যার এক ফোটা ঘামও অয় নাই। অহন তো ও কানতে পারল না। ও আবার সইরে কয়, 'সই তুই তো কইছিলি বুইড়্যা হেইল্যা-দুইল্যা মরব। কিন্তু কি এর কি? বুইড়্যা তো দিব্যি ভাল আছে।' তহন সই কইলো, 'তুই অহনো বুঝঝ না কে করে এইগুলি।' তখন ও কয়, 'না আমি কান্দুমই।' তখন ওর সই কইলো, 'তাইলে তুই আরেক কাজ কর। বিষ দিয়া ক্ষীরার লাড়ু কইর‍্যা, চাকর দিয়া মাইয়্যার বাড়ি পাঠাইয়্যা দিবি। আর কইয়্যা দিবি, মশারি ফালাইয়্যা খাইতে, আর করবি কি তুই কতগুলি সাপও হাড়িতে ভইর‍্যা দিয়া দিবি। সাপগুলি অগ কামরাইয়া মারবো। তখন সবাই যখন মরব তহন তুই কানতে পারবি।' এরপর চাকর দিয়া পাঠাইছে। চাকর না করছে কি হেটা লইয়্যা গ্যাছে। আগের দিনে তো মানুষ হাইট্যাই এক জায়গা অইতে আরেক জায়গায়

www.pathagar.com

যাইতো। চাকরের অনেক পিপাসা লাগছে। অহন কী করবো। নিজের হাতের জিনিস রাখবো, তবে না পুকুরে নাইম্যা জল খাইতো পারবো। এরপর চাকরটা পুকুরে নামছে জল খাইতে। তখন মা মঙ্গলচণ্ডী কয়, 'এই না সুযোগ।' তখন মা মঙ্গলচণ্ডী সাপগুলি বনের মধ্যে ঢাইল্যা দিয়া মুখের অমৃত দিয়া লাড়ু বানাইয়া দিছে। হেই লাড়ু ঐ রাইঙ্গে ভইর‍্যা দিয়া দিছে। কয়, 'মায় কি পাঠাইছেরে।' তহন চাকর কয়, 'মা তোমগো লিগা লাড়ু বানাইয়া পাঠাইছে।' মাইয়্যায় চাকররে কয়, 'দাও লাড়ুগুলি খাই।' চাকরে কয়, 'না অহন না, রাত্রে খাইয়্যা-লাইয়্যা যহন মশারির নিচে ঘুমাইতে যাইব্যা তহন খাইতে কইছে রাইঙ্গের মুখ খুইল্যা।' মাইয়্যা তহন জামাইরে যাইয়্যা কইছে, 'আইজকা কিন্তু তাড়াতাড়ি আইয়্যো মায় লাড়ু পাঠাইছে, হেই লাড়ু মশারির ভিতরে বইয়্যা খাইতে কইছে, আমরা খামু।' জামাই কইছে, 'আইচ্ছা আইমুনে।' তহন রাত্রিবেলা মশারি টানাইয়া জামাই, পোলাপান লইয়্যা বইছে। যখনি রাইঙ্গের মুখ খুলছে তখনই দ্যাহে দিদিমায় কী সুন্দর ক্ষীরার লাড়ু কইর‍্যা দিছে! কি স্বাদের লাড়ু! তারা কোনোদিন এই রকম লাড়ু খায় নাই। জামাই কয়, 'ইস! তোমার মায় কি লাড়ু পাঠাইছে গো, কোনোদিন খাই নাই।' নাতি-পুতিরাও খাইয়্যা খুশি হইছে। হ্যাষে জামাই কয়কি, 'তোমার মায় এমন লাড়ু কইর‍্যা পাঠাইছে, লও আমরা তোমাগো বাড়ি যামু, চলো যাইয়্যা মারে কই, এই লাড়ু বানাইতে।' ওতো বাড়ির কিনারে বইয়্যা রইছে, চাকরে খবর লইয়্যা আহে নি। সব সাপগুলি নাতি-পুতিরে কামরাইয়্যা খাইছে, হেই কথা শোনা যায়নি। দ্যাখে কিএর কী? কি এর নাতি-পুতিরে খাইবো, মাইয়্যা দেখি জামাই, নাতি-পুতি সবাইরে লইয়্যা হাজির। মায় প্রথমে জিগায়, 'কিরে তরা লাড়ু খাস নাই।' মাইয়্যা কয়, 'হ খাইছি। হেই লাড়ু খাইয়্যাইতো দৌড়াইয়া আইলাম। তোমগো জামাই কয় এমন অমৃত লাড়ু আর কোনোদিন খায় নাই। অহন মা তুমি লাড়ু বানাইয়া আমাগো আবার খাওয়াও।' ও কয়, 'আইচ্ছা আমি দেখতাছি।' ও আর কি করবে, তহন ও দৌড়াইয়্যা আবার গ্যাছে সইয়ের বাড়িতে। 'তুই কি কইয়্যা দিলি আর কি অইলো। ওরা তো মরে নাই। জামাই লইয়্যা নাইওর আইছে।' কয়, 'তুই অহনো বুঝস না, কে করে এইগুলি।' ও তো তহন পাগল হইয়্যা কয়, 'না সই আমারে কান্দনের ব্যবস্থা কইর‍্যা দে, ক্যামনে কান্দুম তাই ক?' তহন সই কইতেছে, 'এবার কিন্তু শ্যাষ। তুই করবি কি বাইদ্যারে ডাইক্যা একটা সাপ ধরাইয়্যা লবণের রাইঙ্গের মধ্যে থুইয়্যা দিবি। সক্কালবেলা ঘর যহন অন্ধকার থাকবো তহন তুই বৌগো কবি কি বউরাগো আমি আজগা নাতি-পুতি খাওইয়্যা থুইয়্যা যামু। আমি সইয়ের বাড়ি যামু। আর খাইতে বহাইয়্যা নাতি-পুতিরে কবি যা লবণ লইয়্যা আয়। চৌকির নিচে লবণের রাইঙ্গ আছে এখান থিকা লইয়্যা আয়। তহন সাপ নাতি-পুতির হাতের মধ্যে ঠোকর দিব। আর মরব, তহন কানবি।' হেরপর তো বাড়িতে আইছে। সকাল অইছে। ও নাতি-পুতিরে কয়, 'তাড়াতাড়ি ওঠ। তগো খাওয়াইয়্যা থুইয়্যা আমি সইয়ের বাড়িতে যামু।'

তখন নাতি-পুতিরা সবাই উঠছে। সবাইরে ভাত দিছে। হের পর কয়, 'যা চৌকির নিচে লবণ আছে গিয়া লইয়্যা আয়।' ঐটার মইধ্যে তো গোখরা সাপ ভইর‍্যা থুইছে। নাতি-পুতিরে কয়, 'যা লবণ আন।' ঠাকুরমায় যহন লবণ আনতে কইছে তহন লবণ আনতে গিয়া দ্যাখে হাড়িতে লবণ নাই; নাতি-পুতিরা একেকটা মণি-মুক্তি লইয়্যা

www.pathagar.com

আইতাছে। অন্ধকার ঘর আলো অইয়্যা যায়। নাতিরা কয়, 'ওগো ঠাকুমা কী কও? ঐটাতে তো লবণ নাই।' ঠাকুমা কয়, 'তরা কী লইয়্যা আইতাছস।' ওতো নাতি-পুতি গো রাইখ্যা সইয়ের বাড়িতে দিছে দৌড়। 'সইগো সই আমি তো কানতে পারলাম না। অগো আমি কই লবণ আনতে, ওরা আনে মণি-মুক্তা। তহন সই কয়, 'ওলো তুই অহনো বুঝস না। কে করে এগুলে।' তহন ও কয়, 'না গো সই আমার কান্দনই লাগবো।' তহন সই কয়, 'তর কান্দনের ব্যবস্থা করতাছি তয় আমার লগে আর যোগাযোগ রাখতে পারবি না।' তহন সই কয়, 'তুই যে আমার লগে পূজা করস, হেইটা তুই বাড়িতে নিয়া যা। বাড়িতে নিয়া পা দিয়া উষ্ঠা দিয়া ফালাইয়্যা দিবি, দিতে পারবি? ' ও কয়, 'হ পারমু।' তহন কয়, 'হেরপর তুই দেখিস কান্দন কারে কয়।' হেরপরে সইতো ব্রতের ঘট আলাদা কইর‍্যা দিছে। হেরপর সইয়ে যেমনভাবে কইয়্যা দিছে হেইভাবে ঘটটা ফালাইয়্যা দিছে। ঘটটা ফ্যালাইয়্যা দেওয়নের লগে লগে পোলাপাইন, নাতি-পুতি যে যেখানে আছিলো সব মইর‍্যা রইছে। বুইড়্যায় মরছে। অহন বুড়ি কারে থুইয়্যা, কারে লইয়্যা কানবো; দিশা পায় না। কানতে কানতে অনেক দিন যায়। অহন তো আর কানতে পারে না। চোখের জল পড়তে পড়তে আর চোখেও দ্যাখে না। ওর এখন ঘর দুয়ার বলতে কিছু নাই; সব আগুন লাইগ্যা পুইড়্যা গ্যাছে। নানা সময়ে ভিক্ষুকেরা আহে, আর দেইখ্যা কয়, 'অমুকের বাড়ি, ঐ গেরস্তের বাড়ি আছিলো, আহ! গো সব ক্যামনে ছারখার হইয়্যা গেল।' ও অগো কথা শুইন্যা কয়, 'আমার অমুক খানে এক সই আছে। সইরে একটু আইতে কয়েন গো, অনেক বছর অর লগে কথা কই না, আমি তো চোখে-মুখে দেখিনা যে যামু অর কাছে।' ঐ বেটিরা সইরে গিয়া কইছে। এ সই কয়, 'ওরে দূরঃ ঐ পোড়াকপালির কাছে আমি যামু না। কত ভাল আছিলো, খালি কান্দন কান্দন করছে। অহন কান্ পোড়াকপালি, দ্যাখ কত কানতে পারছ। কত সুবুদ্ধি দিছি শোনে নাই।' এরপর অনেক খবর দিতে দিতে সই আইছে। ও তখন কয়, 'সই আমিতো একেবারেই শ্যাষ। তুই কত কানতে না করছস, অহন আমি খাওনও পাই না। সইগো যদি তর কাছে বিহিত থাকে তবে ক।'

'তর অহন শিক্ষা হইছে। তুই এক কাম কর মঙ্গলচণ্ডীর ঘটের জল আছে আমার বাড়িতে। হেই জল আইন্যা সবকিছুর উপর ছিটা। তুই আবার পূজা শুরু কর।' তারপর সই অরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘটের জল দিয়া গেছে। সব জায়গায় ছিটাইছে। যে যেখানে ছিল সব জাইগ্যা উঠছে। নাতি-পুতিরা সব দৌড়াইয়া ঠাকুমার কাছে গেছে। বুইড়ায় কয়, 'খাইতে দেও ক্ষিদা লাগছে।' 'তোমরা বহ আগে আমি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কইরা লই।' পোলাপাইনরে বহাইয়া থুইয়া আগইল ভরা সোনা নিয়া গেছে কামার বাড়িতে। কামাররে কয়, 'আমারে একটা সোনার মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি বানাইয়া দেও। এইটা দিয়া আমি ব্রত করুম। তারপর সব খাওয়া-লওয়া।' যেই কর্মকারের কাছে নিছে হেয় কয়, 'আমিতো মঙ্গলচণ্ডীর মুখ চিনি না কীভাবে বানামু?' তহন ও কয়, 'এক কাজ কর, সোনা গলাইয়্যা সাজে ঢাল, যে রকম অয় সেই আমার মা মঙ্গলচণ্ডী।' কামার সোনা গলাইয়্যা সাজে ঢাইল্যা দিছে। সাজ তুইল্যা দ্যাহে, এতো মা দুর্গা। এই মঙ্গলচণ্ডী। ও সোনার মূর্তি বাড়িতে আইন্যা পূজা দিল। যে যেহানে আছে সবারে খাইতে দিল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তার সবদিন ফিরা গেল।

www.pathagar.com

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করলে নির্ধনের ধন অয়, অপুত্রের পুত্র অয়, সবার মনোস্কামনা পূর্ণ অয়।

মুন্সিগঞ্জে আরও কিছু ব্রত আছে কালের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। এর অনেকগুলি আচারই আর বর্তমানে করা হয় না।

৩. মাঘমণ্ডলের ব্রত

সারা মাঘ মাস এই ব্রত (বর্ত্ত) করবার নিয়ম। পাঁচ বছর কাল এই ব্রত করতে হয়। ইট, চাল, অঙ্গার, বিষপাত্র, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া করে যথাক্রমে পাঁচ বছর পাঁচটি মণ্ডপ অঙ্কিত করে মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে। মণ্ডপের উপরাংশে সূর্য, সর্বনিম্নে অর্ধচন্দ্র এবং মধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত করতে হয়। শেষ বছর অর্থাৎ পাঁচ বছরের পর ব্রত শেষ হয়। তখন বালিকাগণ ঘাট হতে ছড়া পড়ে পড়ে বাড়িতে এসে মণ্ডল মধ্যে লাড়ু, মধু, ঘৃত প্রভৃতি অর্পণ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করে:

মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা ঘি,
বড় মাইন্ষের পুতের ঝি।
সোনার কুন্তলে ঢাইলা মৌ
বড় মাইনষের পুতের বৌ।
সোনার কুন্তলে ঢাইলা লাড়ু,
শাখায় আগে সোনার খাড়ু।
চন্দন কাষ্ঠে রাধি,
জিরা তুষ ফিকি,
দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই
আঁকে বইসা দইভাত খাই।
চন্দ্র সূর্যে দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক তিন কুল।

ব্রতিনীর কামনা এই মন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রয়েছে। সে কি চায়? একান্নবর্তী পরিবারের পুত্রবধূ হতে ।

এখানে সূর্য উঠবার ছড়াও উদ্ধৃত করা হল :

সূর্য উঠবার ছড়া

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাইগা,
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া,
সূর্য্য উঠবেন কোনখান দিয়া?
বামুন বাড়ির ঘাটা দিয়া।
বামুনদের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
পৈতা যোগায় বেহান বেহান
ওঠ ওঠ সূর্য্যরে ঝিকিমিজিক দিয়া।

www.pathagar.com

***
সূর্য্য ওঠবেন কোনখান দিয়া?
বটগাছটির আগা দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া,
কামরাঙা সিন্দুর কপালে দিয়া,
লাল গামছা কাঁধে কইরা
ওঠ ওঠ সূর্য্যরে ঝিকিমিকি দিয়া।
***
সূর্য্য ওঠবেন কোনখান দিয়া?
বৈদ্য বাড়ির ঘাটা দিয়া।
বৈদ্যের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
সন্ধ্যা পূজা করে বেহান বেহান।
তার গোতলাইনা জল পুষ্করিনিতে ভাসে,
তাহা দেইখা মাইলানি ঝি খটখটাইয়া হাসে।
হাসচ্ কেনগো মাইলানি ঝি তুইত আমার সই,
মাঘমণ্ডলের বর্ত্ত করতে ঘাট পাইমু কই?
আছে আছেলো ঘাট শূদ্রবাড়ির ঘাট।
***
আমের বউল আসেরে লোচা লোচা
বাপ ভাইরে দিমু আমরা তসরের কোচা
দে দে আম গাছটা ঝলুই দে,
দুকুড়ি ছয়টা আম লেইখ্খা দে,
লেখতে পড়তে গোটা হইল উনা
কাইটা কুইটা ফালালো সিপাইর কানের সোনা,
সিপাইর কানের সোনা না লো, লড়িয়ার পিত্তল,
এই বর্ত্ত করি আমরা মাঘের শীতল।
মাঘের জল ফুটি টলমল করে,
উইড়া যাইতে পইখটা পুইড়া পুইড়া মরে।
হাতে লইলে ফটিক জলে।
***
বট গাছটি মেললো পাত,
সূর্য্য ঠাকুর জগন্নাথ।

মাঘের দারুণ শীতের প্রভাতে পল্লিবাসিনী বালিকাগণের মুখে সুরের ঝঙ্কারের সাথে এটি যখন উচ্চারিত হতে থাকে, তখন আবৃত্তির মাধুর্য্যে আপনা হতেই শ্রোতার মন মুগ্ধ করে ফেলে।

৪. থুয়া ব্রত

সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্রত করার নিয়ম এবং চার বছরে এর সমাপ্তি হয়। প্রতিদিন ভোরে কিছু না খেয়ে মাটির মধ্যে একটি গোলাকার গর্ত খনন করে তার চার পারে

www.pathagar.com

চারটি ও মধ্যে একটি 'থুয়া' (মাটির স্তূপ) বসিয়ে ছড়া বা মন্ত্র পড়তে হয়। ছড়া এই যে—

থুয়া পুজে থুয়ানি
আগণ মাসের বৌয়ানি
হাতে ঝাড়ু কাখে কলসি।
থুয়া পুইজা ঘরে গেলেন, মাকে নমস্কার করতে, –মা কি আশীর্বাদ করেন?
আকালে ভাতন্তি হইও,
সকালে পুতন্তি হইও,
রণে আইয়ো হইও
জনে সায়তি হইও
ভাদ্রমাসের গঙ্গাজল যেমন ভরপুর থাকে,
তুমি তেমন ভরপুর থাইকো।

৫. তুষতুষালি

সমগ্র পৌষমাস এই ব্রত করার নিয়ম। বর্তমানে এর প্রচলন নেই বললেই চলে। থুয়া ব্রতের মতো এই ব্রতেও ব্রতিনীরা প্রাতে কিছু না রেখে তুষ ও গোবর দ্বারা একএকটি পিণ্ড নির্মাণ করে মন্ত্র পাঠ করে তার পূজা করেন। মন্ত্র এইরূপ :

তুষ তুষালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাতিপাতি
ভাইর ধন লাসপাশ,
সোয়ামির ধন টগর বগর
পুতের ধন অতি ঝগর
অষ্টবর্ণের গোবর,
নবান্নের তুষ,
বিয়া কর স্বর্গের উপর,
গাই বিয়ন্ত,
আখা জলন্ত,
ঢেঁকি পড়ন্ত
সন্ধি বিলাস
পাট কাপড়খানা রাত্রিবাস।

স্ত্রীলোকের পক্ষে চিরদিনই পিতৃধন, ভ্রাতৃধন ও পুত্রধন অপেক্ষা স্বামীর ধন আদরণীয় ও তাতেই স্ত্রীলোকের অধিকার বেশি।

৬. তারাব্রত

মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করতে হয়। প্রতিদিন একএকটি মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি করার নিয়ম। প্রথম বছর চারটি, দ্বিতীয় বছর আরও চারটি, তৃতীয় বছরে আরও চারটি। সরা, খই, গুড় মোয়া ক্ষীরের লাড়ু ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করে

www.pathagar.com

মণ্ডলের চারধারে রাখতে হয়। এই ব্রতও চারবর্ষে শেষ হয়। সংক্রান্তি দিবসে অন্নের পরিবর্তে দই ও খই ভোজন করতে হয়। মন্ত্র বা ছড়া এই রূপে বলা হয়ে থাকে–

এক তারা দুই তারা ... ষোলতারা পূজি।
ষোল ষোল তারা তোমরা হইয়ো সাক্ষী।
ঘৃত দিয়া করি পঞ্চগ্রাসী (পঞ্চগ্রাস ভোজন করা)।
সাগর আন কাগর আন
ষোল ঘরের ভুজ্যি (ভোজ্য) আন,
ষোল ঘরের ষোল বর্তি
আমি তাদের অধিপতি।
শঙ্কর জিজ্ঞাসেন– গৌরী তারা পূজি কি কি ফল পায়?
শঙ্কর হেন স্বামী পায়,
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া,
আমি যাই ইন্দ্রপুরে নাটুয়া (নর্তকী) হইয়া।

ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখা করা রয়েছে।

৭. যমপুকুরের ব্রত

বিক্রমপুরে যমপুকুরের ব্রতের প্রচলন খুব বেশি। কার্তিক মাস এই ব্রতের সময়। ঘরের বাইরে একটি ছোটো পুকুর কেটে তার চারপাশে ধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করে ভোরে কিছু না খেয়ে একমাস কাল এই ব্রত করার নিয়ম। মাটি দিয়ে কাক, চিল, কুমির, যমরাজার মা ইত্যাদি নির্মাণ করে খনিত পুকুরের জলে স্নান করাতে হয়। ব্রতকথা এইরূপ– এক শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে এই ব্রত করতে না দেয়ার পাপে, মৃত্যুর পরে তার প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না। পরে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, বধূকে এ ব্রত করতে না দেয়ায় তার প্রেতাত্মার উদ্ধার হচ্ছে না। পুত্র স্বপ্ন দেখে স্ত্রীকে ঐ ব্রত করতে অনুরোধ করে। কিন্তু বধূ এখন সুযোগ বুঝে বলে যে, সোনার পুতুল ও দুধের পুকুর না হলে সে ব্রত করবে না। মাতৃমুক্তি প্রয়াসী সন্তান অবশেষে স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়। তারপরে বধূ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ব্রত করে। মন্ত্র এই–

ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাঁই,
ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, মানতলা না দিলি ঠাঁই,
ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, কলাতলা না দিলি ঠাঁই,
ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, হলুদতলা না দিলি ঠাঁই ইত্যাদি।

জীবিতকালে শাশুড়ি বধূকে ব্রত করতে দেয় নি, কাজেই শাশুড়ি বধূকর্তৃক তুচ্ছার্থে "ক্ষুদিরা ধাই" প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে সম্বোধিত হয়েছেন।

ব্রতের ফল : শাশুড়ির সদ্গতি লাভ।

www.pathagar.com

৮. নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে এই ব্রত করতে হয় এবং ব্রত শেষে পিঠা খাওয়া হয়। এই ব্রতকথা কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীনামক বিখ্যাত গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে। ব্রতের ফল চণ্ডীর অনুগ্রহ লাভ।

৯. মনসা ব্রত

শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করার নিয়ম। চার বছরে এর সমাপ্তি হয়। ব্রতকথা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ প্রণীত লখীন্দর বেহুলার কাহিনী হতে গৃহীত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণা পঞ্চমী এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করতে হয়। সর্পভয় নিবারণের নিমিত্তই এই ব্রত করা হয়ে থাকে।

১০. ত্রিভুবন চতুর্থী

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে এই ব্রত করতে হয়। এটিও চার বছর করার নিয়ম। কাঁঠালের পাতার উপর নিম্নলিখিত রূপ লিখতে হয়—

আগুনের চাউল, পৌষের সরাটোপা মাঘের পানি,
অমুকে যে বর্ত্ত করে ত্রিভুবনে জানি।

কোনো কোনো স্থানে একে বরদা চতুর্থীও বলে। বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ জামাই ষষ্ঠি, শীতলা নিস্তারিনী, জরাজরি প্রভৃতি করে থাকেন। এটি ছাড়া আশ্বিন কিংবা কার্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অগ্রহায়ণ মাসে ইয়াতলি, চৈত্রমাসে ঝলকা ব্রত করা হয়ে থাকে। শীতলা বসন্ত রোগের, ঝলকা ওলা উঠার, ইয়াতলি ফোটপাঁচড়া ইত্যাদির প্রতিষেধকস্বরূপ করা হয়। পৌরাণিক ব্রতসকলের মধ্যে জলদান, ফলদান, অনন্তব্রত, ললিতা সপ্তমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী-এগুলি সধবা ও বিধবা উভয়েরই করণীয়; আর সাবিত্রীব্রত, অক্ষয়সিন্দুর পঞ্চমীব্রত, দধিসংক্রান্তি, ত্রয়োসংক্রান্তি ব্রত সধবাগণ করে থাকেন।

নিরাকুল পরমেশ্বরী, মুস্কিলআসান প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রত বিক্রমপুরের স্থানবিশেষে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্রত দুটির কথা অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুন্দর।

দিন দিন এই বারব্রতগুলি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অর্থহীন এ সকল ছড়াপাঁচালিকে তুচ্ছজ্ঞানে পরিহার করে আসছেন এবং নিজ নিজ কন্যা-ভগিনীকে যত্নপূর্বক এদের নিকট হতে দূরে রাখছেন। যা এতদিন বংশ পরম্পরায় শত বাধাবিঘ্ন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও আপনার অস্তিত্ব কোনোওরূপে রক্ষা করে আসছে তা কোনো প্রকারেই উপেক্ষণীয় নয়। নিজ দেশকে ও মাতৃভূমিকে ভাল করে জানতে হলে, তার প্রত্যেক বিষয়কেই তুচ্ছ না করে সাদরে গ্রহণ করে এর ভাল-মন্দ বিচারপূর্বক যত্নের সাথে গ্রন্থিত করে রাখা কর্তব্য।

১১. কাঁটা খেলা

চড়কের একটি প্রধান আনুষ্ঠানিকতা 'কাঁটা খেলা'। এটিও একটি মানত। কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে এর আয়োজন করে থাকেন। কাঁটা খেলার সাথে জাদু, মন্ত্র, ইন্দ্রজাল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে লোকের পিঠে লোহার শিক গেঁথে কাঠের সঙ্গে

www.pathagar.com

রশিতে ঝুলিয়ে ঘোরানো হয়, তার পিঠে এক সপ্তাহ যাবত শুধু তেল, ঘি, মালিশ করে নরম করাই হয় না, প্রধান পুরোহিত বা পূজারি রীতিসিদ্ধ মন্ত্রপাঠ করে তার শুভ কামনা করেন এবং প্রতিপক্ষ কোনো গুণীন বা মাহাতোর পাল্টা মন্ত্রশক্তি থেকে তাকে রক্ষা করে থাকেন। চড়কের রশি ছিঁড়ে কোনো পূজারির মৃত্যু হলে লোকে ধারণা করে- এটি প্রতিপক্ষ কোন মাহাতোর কারসাজির কারণে ঘটেছে। চড়ক হলো একটি ডালপালা বিবর্জিত শিমুলের গাছ। গাছের উপরিভাগে কাঠের চারকোণা একটি কাঠামো তৈরি করে মাঝখানে গাছের মাথায় বসানোর উপযোগী একটি গোল বড় ছিদ্র রাখা হয়। ঐ ছিদ্রে গাছের উপরের অংশ ঢোকানোর পর চারটি বাঁশ শক্ত করে বেঁধে দুই পাশে ক্রমশ সরু করে দুই দিকের প্রান্তে রশি বাঁধা হয়। ঐ রশির একদিকে কাঁটাবেঁধা ব্যক্তি ঝুলে থাকে এবং অপর প্রান্তের রশি ধরে একজন বা দু'জন তাকে পাঁচ বা সাত পাক ঘোরায়। কাঁটা খেলার জন্য প্রয়োজন পড়ে কলা, কবুতর, পাঁচটি সূচ, সিঁদুর, একটা গামছা, নারিকেল, ফুল ইত্যাদি। যে চড়কে উঠবে, তার কোমরে বাঁধা হয় ১০৮ প্রকার

কাঁটা বিদ্ধ করা হচ্ছে

শেকড়। যেমন সাদা দূর্বা, ঈশ্বরমূল, চান্দ-ভাদো, নাগনতি, বিষকুণ্ডলী, চটচটিয়া, বিছাতু, সোয়াশিং, ডুমুরের ফল, বাঁশের মূল, চুল ইত্যাদি। এখন অবশ্য এতো শেকড় পাওয়া যায় না। কাঁটা বিদ্ধ করার আগে লোকটিকে উপুড় করে শোয়ানো হয়। দুটি হাত থাকে দুই দিকে। মূল গুণীন বা মাহাত অনবরত মন্ত্র পাঠ করে কয়েক পাক ঘুরে তার পিঠে পানি ছিটায়। পূজারি চড়কগাছের গোড়ায় পূজা দেন। চূড়ান্তভাবে কাঁটা পিঠের চামড়ায় ঢোকানোর পূর্বে ঐ ব্যক্তির দুই কানে মাহাত ফুঁ দিয়ে তাকে মন্ত্রপূত করেন। এরপর কাঁটা ফোড়ানোর স্থানে সিঁদুরের চারটি ফোঁটা দেওয়া হয়; তার কপালেও সিঁদুর পরানো হয়। এবার পিঠের চামড়া আলগা করে ধরে কাঁটা ফোড়ানো

www.pathagar.com

হয়- প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে। ডান দিকের কাঁটাকে শিবের প্রতীক, বাঁ দিকের কাঁটাকে পার্বতীর প্রতীক বলে মনে করা হয়। কাঁটা ফোড়ানোর পর পূজারি ব্যক্তি কাঁটাসহ দর্শকদের কাছে ঘুরে বেড়ায় এবং সাহায্য গ্রহণ করে। সূর্যাস্তের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বা সূর্যাস্তের পরপরই চড়কের রশির সাথে তার কাঁটার রশি বেঁধে দেওয়া হয়। ঝুলন্ত অবস্থায় সে মুখে এক কাঁদি কলা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, এর মুখের কলা দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেয় দর্শকদের মাঝে। দর্শকেরা ঐ কলা অর্ঘ্য হিসেবে কাড়াকাড়ি করে সংগ্রহ করে। ঐ কলা নানা অসুখ নিরাময়ে কাজ করে। সাত পাক ঘোরার পর তাকে চড়ক থেকে নামানো হয়। চড়ক ঘোরার মধ্যে শিব-পার্বতীর বিশ্ব পরিভ্রমণের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। আর কলা ছড়ানোর মধ্যে শিব-পার্বতীর আশীর্বাদ প্রদানের দৃশ্য কল্পনা করা হয়।

১২. গারু হারকাইন

এ জেলায় এক সময় ঘরে ঘরে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত ভাবে এ উৎসব পালন করতো। আধুনিক সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এর আনুষ্ঠানিকতা কমে এসেছে। তবে ঐতিহ্যগত ভাবে এখনো সিরাজদিখানের অনেক বাড়িতেই এ গারু হারকাইন বা গারু সংক্রান্তি পালন হয়ে থাকে। এ উৎসব দুদিন হয়। আশ্বিন মাসের শেষ দিন ও কার্তিক মাসের প্রথম দিন।

আশ্বিন মাসের শেষ দিন উৎসবের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। বাড়ির উঠানে যেখানে এ উৎসবের আয়োজন হবে সেখানটা আগেই গোবর দিয়ে পরিস্কার করে লেপে দিতে হয়। তারপর নতুন একটি ঘটে পরিস্কার জলের মধ্যে সরিষার তেল এবং নতুন আমের ডাল যাতে পাঁচটি পাতা আছে ঐ পানি ভরা ঘটের মধ্যে রাখতে হবে। পাতা এবং ঘট-এ সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হবে। এই আম পাতা ও ঘটকে আমসরা বলা হয়। এ দিন ভাত ও ডাল রান্না করে রাখা হয় এবং পরদিন ভোরে গোসল করে সেই ভাত দিয়ে খাওয়া হয়। বিশেষ উপকরণ দিয়ে এ ডাল রান্না করা হয়। যেমন- শাপলা, শালুক, ঘেচু, গাছ আলু, চমইফলউস্যি (বড়সীম) ইত্যাদি। আমের সরার সাথে রাখতে হয় কাঁচা হলুদ বাটা, কাঁচা তেঁতুল পোড়া, ডেপের খৈ, তালের আঁটির শাস, সিদ্ধ শালুক, সরবি কলা ও গাছ আলু। সলতা দিয়ে বাতি বানিয়ে তা দিয়ে কলার ডাঁটে কাজল তৈরি করে রাখা হয়।

পরদিন সকাল বেলা গোসল করে ঘটের তেল শরীরে মাখতে হয় এবং ঐ কাজল চোখে দিতে হয়। গোসলের আগে গায়ে কাঁচা হলুদ মাখতে হয়। লোকবিশ্বাস, এখানে গোসল করে গারুর ডাল দিয়ে সকাল বেলা ভাত খেলে সমস্ত বছর শরীরে কোনো খোঁস-পাঁচরা হবে না এবং চোখেরও কোনো অসুখ হবে না। এ কারণে গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সবাই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। অনুষ্ঠান শেষে সবাই মিলে ছড়া কাটে।

আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়
যেই বর মাঙ্গে সেই বর পায়।
আশ্বিনে রান্ধি বাড়ি কার্তিকে খাই
দূর হয়ে যাবে সবার রোগ বালাই।

www.pathagar.com

১৩. কুলামানত

জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, রোগবালাই থেকে মুক্ত হতে চাইলে অথবা বহুদিন যদি বৃষ্টি না হয় তবে কুলা নামানো বা কুলা মানত করতে হয়। এ কুলা নামানোর জন্য প্রয়োজন হয় একটি নতুন কুলা। যিনি কুলা নামাবেন তিনি একটি নতুন কুলা কিনে আনবেন। কুলাটি এক দামে কিনতে হবে। তারপর নিজে কিছু নগদ টাকা, চাউল এবং কাঁচা মরিচ তাতে রাখবে। একটি মেয়ে নতুন কাপড় পরে কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে। সাথে আরো ছেলে মেয়েরা থাকে। গৃহস্থ বাড়ির উঠানে গিয়ে যদি বৃষ্টি নামানোর জন্য ব্রত হয় তবে তারা উঠানে পানি দিতে বলবে। গৃহস্থ রমণীরা উঠানে পানি ঢেলে দিলে তারা পানি দেয়া জায়গায় "আল্লা মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে, তুই আল্লা, মেঘ দে" শরীরে কাঁদা মেখে এই গান গাইবে। গান শেষ হলে কৃষক রমণী তাদের কুলায় চাল-ডাল তরি-তরকারি টাকা দেবে সাধ্যমতো যে যা পারে। আর অন্য ব্রত হলে পানি দেবে না। যেমন— বসন্ত রোগ দূর করার জন্য শীতলা দেবীর কুলা নামানো হয়। হিন্দুরা এটি বেশী করে। কখনো কখনো মুসলমানদেরও এটা করতে দেখা যায়। কলেরা, বসন্ত দূর করার জন্য মুসলমানের মধ্যে আরো একটি প্রথা আছে। তারা কোনো পাড়ায় ওলাওঠা দেখা দিলে পাড়ার মুরুব্বি ও ধর্মপ্রাণ লোকেরা দল বেঁধে হযরত আলী (রা:) এর দোহাই দিয়ে রোগ বালাইকে ভয় দেখায়। তারা ছড়া কেটে বলে—

আলী আলী জুলফিকার
আলীর হাতে তীর।
যেই পথে আইছ বালাই
সেই পথে ফির।

এ ছড়া বলে তারা পাড়ার এধার থেকে ঐ ধার পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। আশা যে, হযরত আলীর দোহাই দিলে রোগের অপদেবতা বাড়িতে উঠতে সাহস পাবে না। লোকের ধারণা অপদেবতা এসে যাকে খুশি তাকে এ রোগটা দিয়ে যায় এবং এর ফলে সে মারা যায়। কাজেই তার নামে চাল-ডাল তুলে সিন্নি দিলে সে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে। এলাকায় আর কোনো রোগ বালাই আসবে না। এ কারণে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল ডাল তুলে বা মেগে এনে সিন্নি দেয়। কুলায় করে আনে বলে একে কুলা মানত বা কুলা নামানো বলে।

১৪. বেরা বা ভেলা ভাসানি

কলা গাছের বেরা বা ভেলা ভাসানি অনুষ্ঠান আগে প্রতি পাড়ায় হতো। ভাদ্র মাসের যে কোন বৃহস্পতিবার হয় এ অনুষ্ঠান। তবে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারই বেশি জায়গায় হয়ে থাকে। ভেলাকে বিক্রমপুরের ভাষায় "বেরা ভাসানি" বলে থাকে হিন্দুদের পানির দেবতার নাম বরুণ। তারা বরুণের নামে ভেলা ভাসায়। মুসলমানদের পানির পীর খোয়াজ খিজির। তাই তারা খোয়াজ খিজিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার নামে ভেলা ভাষায়। জনমানুষের বিশ্বাস যে, খোয়াজ খিজির খুশী হলে পানির দ্বারা লোকসমাজের কোনো অমঙ্গল হবে না। খোয়াজ খিজির এক পীরের মাধ্যমে পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করান। তার নাম বদর পীর। তাই এলাকার লোকেরা বদর পীরের নাম

www.pathagar.com

নিয়ে পানিতে ভেলা ও নৌকা ভাসায়। ভেলা ভাসানো অথবা নৌকা ছাড়ার সময় হিন্দু-মুসলমান সকলেই বদর পীরের নাম নিয়েই নৌকা ছাড়ে নদীতে। আমাদের বাংলা লোক সংগীতেও এ বদর পীরের নাম উঠে এসেছে- "বদর বদর বলি নদী দিত পাড়ি"।

ভেলা বানানোর বিশেষ কৌশল আছে। এটা সবাই করতে পারে না। এর জন্য ভালো ছৈয়াল লাগে। যারা ভালো ঘর তৈরির কাজ করতে পারে এমন কারিগর থাকলে সুন্দর করে সামনে বারান্দা দিয়ে দোতলা টিনের ঘরের মতো চৌচালা একটি ঘর তৈরি করতে হয় কলা গাছের ভেলার উপরে। মাপ মতো কলা গাছ কেটে কঞ্চি দিয়ে গেঁথে সমান করে তার উপর পাট খড়ি দিয়ে সুন্দর করে একটি চৌচালা ঘরের আদলে ফ্রেম তৈরি করতে হয়। তারপর ঘরের চাল ও বেড়া রঙিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। ঘর তৈরি করে সেখানে পীরের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ফলফলাদি এবং মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো হয়। সকাল থেকে এ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং বিকালের আগেই শেষ করতে হয়। সন্ধ্যার পর হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ সবাই আসতে শুরু করে। ভেলা সামনে রেখে উঠানে সবাই বসে পড়ে। ভেলার মধ্যে টাকা-পয়সা, খাদ্য, ফলমূল দেয়ার জন্য অনেকে মানত করে। মানতের টাকা-পয়সা ও ফলমূল খোয়াজ খিজিরের নাম নিয়ে ভেলায় দেয়া হয়। আর চাল-ডাল ও মোরগ পেলে তা দিয়ে সিন্নি করা হয়। কেউ কেউ মোরগ রেখে দেয়। সারারাত চলে পীর বন্দনার গান-বাজনা। লোকেরা গান গেয়ে, জিকির করে রাত পার করে দেয়। শেষ রাতের দিকে উঠান থেকে ধরাধরি করে হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জন দেয়ার মতো ভেলা, পানিতে নামানো হয়। পার্থক্য হলো, প্রতিমা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয় আর ভেলা ভাসিয়ে রাখা হয়। একজন লোক বিশেষ কায়দায় ডুব দিয়ে ভেলা ভাসানোর কাজ সম্পন্ন করে। এরপর লম্বা একটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় পুকুরের কোনো গাছের সাথে। কেউ কেউ আবার নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। বর্তমানে এ ভেলা ভাসানো অনেকটাই কমে গেছে। এখনো দু'চার বাড়ি ভেলা ভাসানি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের চন্দনধুল গ্রামে ওয়াহেদ হাওলাদারের বাড়ি, কুসুমপুরের দুলাল মস্তানের বাড়ি, রসুনিয়ায় সুবল সাধুর বাড়ি, লৌহজং-এ বেলদার পাড়ায় ও খরিয়া গ্রামের মতিমিয়া ফকিরের বাড়িতে ঘটা করে ভেলা ভাসানো হয়।

www.pathagar.com

লোকনৃত্য

আদিম সমাজে নৃত্য ও নাট্যের সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের যোগ ছিল। দেবতা ও প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্যে নৃত্য পরিবেশন করা হতো। লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী মুদ্রা ও চারি নেই। স্থানীয় জনগণের বোধগম্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয় এ নৃত্যে। লোকনৃত্যের শিল্পীরা গুরু পরম্পরায় নাচ শিখে পরিবেশন করে। গুরুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। বিদ্যার্থীরা বিভিন্ন পরিবেশনায় উপস্থিত থেকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ হয়। লোকনৃত্য পরিবেশনায় সঙ্গে গীত সংযুক্ত। বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান থেকে নৃত্য শুরু হলেও গান সহযোগ দলবদ্ধ পরিবেশনা হয়। এর মুদ্রা, চলন, তাল, লয়ের ক্ষেত্রে সাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফলে পরিবেশনার সময় সাধারণ মানুষও স্বত:স্ফূর্ত অংশ নেয়।

লোকনৃত্য সাধারণত পরিবেশিত হয় ভূমি সমতল মঞ্চে। এটি সাধারণত উঠোন, মাঠ কিংবা খোলা জায়গা ইত্যাদি স্থানে লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। যেখান পরিবেশনা চলাকালীন সময় লোকসমাগম হতে পারে।

কাছ নাচানি

কাছ নাচানি মূলত কালী পূজাকে কেন্দ্র করে হয়। চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন এ কাছ নাচানি হয়ে থাকে। তাছাড়া এ সময় সন্ন্যাস নাচ, শিব গৌরী নাচ হয়। এ নাচ অবশ্য সাতদিন হয়। যারা এর আয়োজনের সাথে জড়িত থাকবে তারা এ সাতদিন কোনো মাছ বা মাংস খেতে পারবে না। এ কয়দিন শুধু নিরামিষ দিয়ে ভাত খাবে। পূজার শেষ দিন একটা শিংমাছ ও একটা গজার মাছ শ্মশানে দিয়ে রাত বারোটার পর পূজা দিতে হয়। এর পরদিন থেকে মাছ-মাংস খেতে পারবে।

সিরাজদিখান উপজেলার রসুনিয়া ইউনিয়নের চোরমর্দন গ্রামের মুনি পাড়ায় কালী মন্দিরে তিন-চার পুরুষ ধরে এ পূজা চলে আসছে। আগের মতো এখন আর তারা কাছ নাচানি করে না। মুনি পাড়ার প্রবীণ লোক হরিদাস বলেন, "এইটা করতে অনেক টাকা লাগে তাছাড়া ঐ কমিক করার লোকজনও এখন আর পাওয়া যায় না।" কাছ নাচানি তামশিক নাচ। তামশিক অর্থ তামাশা করা। লোকজনদের হাসানোর জন্যই মূলত: অনুষ্ঠানটি করা হয়। এটি গ্রাম বাংলার লোক ঐতিহ্য। কাছ নাচানির প্রধান আকর্ষণ একজন মানুষ ঘোড়া সেজে নাচে। কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয় ঘোড়া। ঘোড়ার মাঝখানে একজন সং সেজে অভিনয় করে। এদের সাথে আবার আরো অনেকে মুখোশ পরে থাকে। বাকি লোকদের মুখ কালি দিয়ে নানা প্রকার নক্সা করা থাকে। দল বেঁধে তারা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যায় ঢোল বাদ্য বাজাতে বাজাতে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সব সেখানে জড়ো হয়। তখন কাছ নাচানির লোকেরা নানা প্রকার রং-ঢং-তামাশা শুরু করে। কখনো তারা কমিক গান করে, কখনো কোনো খণ্ড চিত্রের অভিনয় করে দেখায়। এক এক সময় তারা এক এক রূপ ধারণ করে। যেমন— গ্রামের মাতবর বলে,

www.pathagar.com

"আমি বাইর বাড়ির উল্‌কা মাদবর। আমি মাতবরি করি আর জুতার বাড়ি খাই। তবু আমার মান ইজ্জত যায় না। একটা দুইটা জুতার বাড়িতে কী মান ইজ্জত যায়?"

তারপর হয়তো ছড়া কেটে বলে,

"ছেরি ধান তোল, ধান তোল মেঘে ভিজ্জা যায়। সেই ধান ভিজ্জা গেলে মারবোনে তর মায়"।

অথবা

"আমি বন্দনা করি মাছ ধরার ওচা, তোর বইনে মুত্‌তে বইছে বেঙ্গে দিছে খোচা"

এই ধরনের হাস্যরসাত্মক কথা বলে লোকজনকে নিছক আনন্দ দান করাই কাছ নাচানির মূল উদ্দেশ্য। যে যত আদি রসাত্মক কথা বলতে পারে, তার কথায় লোক তত বেশি হাসে। সিরাজদিখান উপজেলার কুসুমপুর, চোরমর্দন গ্রামের মুনিপাড়ায় কাছ নাচানির দল আছে। শান্তি মনি দাস এবং তার দল কাছ নাচানিতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

তথ্য : রবি দাস, কুসুমপুর, হরিদাস- চোরমর্দন।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়া প্রচলনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিচার্য, অংশগ্রহণকারীদের শরীরচর্চা আর দর্শকদের আনন্দ প্রাপ্তি। এই ক্রীড়াসমূহের স্থান নির্বাচনেও পরিবেশন অঞ্চলের পরিবেশ গুরুত্ব বহন করে। খেলাধূলা সমূহের ক্ষেত্রে নানা আয়োজনও দেখা যায়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোকসমাগম ঘটে, এই উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃজিত হয়। এই ক্রীড়ায় অনুসঙ্গে লোকসাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষত ছড়ার প্রচলন দেখা যায় কোনো কোনো লোকক্রীড়ায় সময়। বিভিন্ন লোকক্রীড়া স্থানীয় অঞ্চল অতিক্রম করে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নৌকা বাইজ, গোল্লাছুট, হাডুডু, বৌচি, বরফ পানি ইত্যাদি খেলা সমূহ কম-বেশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মুন্সিগঞ্জেও বেশ কিছু চমকপ্রদ লোক-ক্রীড়া প্রচলিত আছে। নিচে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হল :

১. তিন গুটি

ষোলগুটির মতো তিন গুটিও একটি লোকজ খেলা। এই খেলাটির জন্যেও নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। সাধারণত পাকা জায়গায়, মাটির উপরে এবং অনেক সময় কাগজে ছক কেটে এই খেলা হয়।

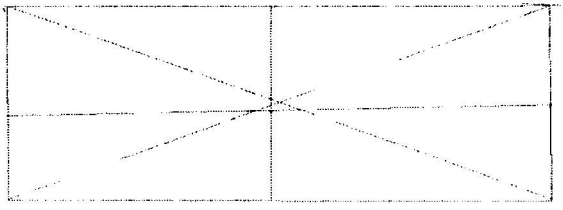

তিন গুটি খেলার ছক

অবসর সময়ে, বৃষ্টির দিনে বা বিকেল বেলা অনেক মানুষ একসঙ্গে জমায়েত হয়ে এ খেলা খেলে থাকে। সাধারণত দুইজন খেলোয়াড় থাকলেও অনেক সময় কৌতূহলবশত কেউ কেউ সহযোগী খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

২. ইচিং-বিচিং

এই খেলায় অনেক খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। তবে খেলাটি শুরু করার জন্যে সর্বনিম্ন চারজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। সকল খেলোয়াড় পরস্পরের মধ্যে বেটে নেয়। যে

www.pathagar.com

দুই জন বাটে উত্তীর্ণ হতে পারে না তারা চোর হয়। তারা মাটিতে বসে প্রথমে দুই পায়ের পাতা গোড়ালির উপর ভর দিয়ে উঁচু করে ধরবে। সকল খেলোয়াড়কে তা ডিঙিয়ে যেতে হবে। এরপর একে একে এক পায়ের ওপর অন্য পায়ের পাতা, তার উপর প্রথমে এক হাতের পাঞ্জা এবং সেটা পার হতে পারলে দুই হাতের পাঞ্জা উঁচু করে রাখা হয় এবং সকল খেলোয়াড়কে তা অতিক্রম করতে হয়। যদি সকলে চোরদের শরীরে কোনোরূপ স্পর্শ না করে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে তবেই খেলার পরবর্তী ধাপ শুরু হবে।

পরবর্তী ধাপে এই চোরকে পা ছড়িয়ে বসতে হবে এবং প্রতিজন খেলোয়াড় প্রথমে একদিকে এসে লাফ দেবে আর বলবে—

ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
ইশ বিশ ধানের শীষ
অতিথ আইলে বইতে দিস্।

এই ছড়াটি সঠিকভাবে বলা ও লাফ দেয়ার পর খেলাটি শেষ হয়। তখন যদি খেলোয়াড়রা চায় তবে পুনরায় আবার বাটন-বাটি করে তারা খেলতে পারে; নইলে যারা চোর হয়েছে তাদেরই আবার চোর হয়ে খেলা শুরু হয়। যদি খেলার মাঝখানে কারো বা একজনের চোরদের শরীরের কোথাও স্পর্শ লাগে তবে সে বসে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আরেকজনের স্পর্শ লেগে খেলা থেকে বাতিল হচ্ছে। তখন ঐ দু'জনে মিলে চোর হবে।

৩. পাতা পাতা - সাত পাতা

এই খেলায় কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় নেই। অনেকেই মিলে খেলাটি খেলে থাকে। নির্দিষ্ট নিয়মে বাটাবাটির পর একজন উত্তীর্ণ হতে পারে না। সেই এই খেলার চোর বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্দিষ্ট ঘর থাকে। ঘর থেকে খেলোয়াড়রা চোরকে জিজ্ঞাসা করে– পাতা পাতা কী পাতা? চোর তখন উত্তর দেয়- পাতা পাতা আম পাতা। তখন প্রতিটি খেলোয়াড়কে গিয়ে ঐ নির্দিষ্ট পাতাটি গাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হয়। একদমের মধ্যে পাতাটি সংগ্রহ করতে হবে। যদি চোর টের পায় কেউ দম চুরি করেছে তবে সে ঐ খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিয়ে যদি দৌড়ে আগে ঘরে আসতে পারে তাহলে যাকে ছুঁয়ে দিল সে চোর হয়ে যাবে। আর যদি চোর কাউকেই ধরতে না পারে তবে সাত পাতা আনার পর সবাই নির্দিষ্ট জায়গায় পাতাগুলো লুকিয়ে রাখে। চোর সেগুলো খুঁজতে থাকে। যদি কারোটা পাওয়া যায় তবে সে চোর হয়। আর যদি না পাওয়া যায় তবে আবার পুনরায় বেটে নিয়ে খেলা শুরু হয়।

৪. ফুল টোক্কা

এ ধরনের খেলায় ৬ জন বা তার চেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন। এখানে একজন নিরপেক্ষ খেলোয়াড় থাকে যে 'চোরের' চোখ ধরে রাখে। আর অন্যরা চুপচাপ সামনের দিকে বসে থাকে। নিরপেক্ষ খেলোয়াড় সবাইকে একটা করে নাম দেবে। তারপর সে চোরের চোখ চেপে ধরে একজন ঐ নির্দিষ্ট নাম থেকে ডাকবে। যেমন— "আয়রে আমার শিউলী ফুল" একজন খেলোয়াড় এসে চোরের কপালে টোকা দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে এবং সকল খেলোয়াড় সমস্বরে বলতে শুরু করবে 'ক খ ঘোড়ার

www.pathagar.com

ডিম' -এর মাঝখান থেকে চোরকে শনাক্ত করতে হবে কে তার কপালে টোক্কা দিয়েছে। যদি শনাক্ত করতে পারে তবে যে টোক্কা দিয়েছে সে চোর হবে আর যদি না পারে তবে তাকে আবার চোর হতে হবে।

৫. দাপ্পা খেলা

দাপ্পা খেলার জন্য ইট বা পাথরের পাঁচটি আবার কখনো সাতটি গুটি প্রয়োজন। এই খেলার পদ্ধতি অনেকটা বিচিত্র ও জটিল। খেলোয়াড়ের দক্ষতা ও নিপুণতা এই খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। এই খেলার গুটিগুলোর মধ্যে একটি সামান্য বড় হয়। কখনো ছোড়াছুড়ি করে করতে হয়। এই লোফালুফির সময় কোনো গুটি মাটিতে পড়ে গেলে, সে খেলোয়াড় দান হারাবে। অন্য একজন খেলা শুরু করবে। সাধারণত এই খেলাটি একক, দ্বৈত ও দলগতভাবে খেলার সুযোগ রয়েছে। প্রথমে একটি একটি করে সবগুলো গুটি হাতের উপরে নেয়া হবে তারপর একটি গুটির সব সময় হাতে রেখে বাকিগুলো লুফে নিতে হয়। এভাবে সবগুলো গুটি লুফে নেয়া হয়ে গেলে খেলার সবচেয়ে কঠিন সময়ে খেলোয়াড় উপস্থিত হন। একে বলে 'উল্টা দাপ্পা'। এই সময় হাত উল্টে সবগুলো গুটি লোফালুফি করতে হয় এবং খেয়াল রাখতে হয় একটাও যেন মাটিতে না পড়ে। উল্টা দাপ্পা শেষ করে খেলোয়াড় একটা দাগ কেটে এক গুটি সব সময় হাতে রেখে অন্যগুলো পার করতে হয়। একই দাগকে 'কুত্তা' বলে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ইচ্ছেমতো ছাড়া কুত্তা বা বান্ধা কুত্তা দিতে পারে। ছাড়া কুত্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র একটা দাগ কেটে গুটিগুলো পার করে নেয়া যায় আর বান্ধা কুত্তায় অন্যহাত দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করতে হয়। এইটি খেলার শেষ ধাপ। এই ধাপ পেরোনোর পরে পয়েন্ট নিশ্চিত করার জন্যে সবগুলো গুটি আলাদা করে একবার লোফালুফি করতে হয়।

৬. টিলু-এস্পারাইট

টিলু-এস্পারাইট এক ধরনের লুকোচুরি খেলা। এই খেলাটি 'পলানটি' নামেও পরিচিত। পরস্পরের কাটাকাটির মাধ্যমে একজন চোর হয়। আর সবাই লুকিয়ে পড়ে। চোর চোখ বন্ধ করে ১০০ পর্যন্ত গুণে থাকে। বাকিরা সবাই এই সময়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লে চোর সবাইকে খোঁজা শুরু করে। এক পর্যায়ে চোর যদি কাউকে দেখতে পায় তবে টিলু বলতে হয়। টিলু বলার আগ পর্যন্ত দেখলেও কিছু যায় আসে না। আর প্রতিপক্ষের কেউ যদি চোরকে স্পর্শ করে এস্পেরাইট বলতে পারে তবে চোরকে পুনরায় চোর সাজতে হয়। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

৭. বরফ পানি

এই খেলায় অনেকজন খেলোয়াড় থাকে। বিভিন্নভাবে কাটাকাটি করে একজন 'চোর' হিসেবে নির্বাচিত হয়। সে সকলের পিছে ধাওয়া করে এবং কাউকে ছুঁয়ে বরফ বললেই সে বরফের মতো জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে পানি না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে খেলা চলতে

www.pathagar.com

থাকবে। আবার 'চোর' কাউকে বরফ বলে ছুঁয়ে দিয়ে সে যদি নড়ে যায় তবে সাথে সাথে ঐ খেলোয়াড় চোর হিসেবে নির্বাচিত হবে।

৮. অভি অভি

এই খেলাটি খেলার জন্য কয়েকজন খেলোয়াড় প্রয়োজন। খেলার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। যেমন কোনো বাড়ির উঠানের এক পাশ থেকে আরেক পাশ। এভাবে সীমানা নির্দিষ্ট হওয়ার পর খেলা শুরু হয়। পরস্পরের মধ্যে বাটাবাটি শেষ করে একজন চোর হিসেবে নির্বাচিত হবে। এরপর সে অন্যদের বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে সীমানার অন্যপাশে যেতে বলবে। যেমন, প্রথম কৌশলটি হল 'খড়ম'। খড়ম বললে স্বাভাবিকভাবে না হেঁটে বৃদ্ধ আঙ্গুল মাটির সাথে ঘষে ঘষে এগিয়ে যেতে হবে। কেউ একজন এই কৌশল থেকে সরে গেলে সে 'মারা' পড়বে অর্থাৎ তাকে চোর হতে হবে। এরকম আরও কিছু কৌশল হল - মরা মানুষ; এই কৌশলে সকলে একজনকে মরা মানুষ সাজিয়ে চার হাত-পা ধরে অপর প্রান্তের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যদি সাজানো খেলোয়াড় হেসে ফেলে তবে খেলা সেখানেই শেষ হয়ে আবার নতুন করে শুরু হবে। তবে যে আগের খেলায় চোর ছিল সে আর নতুন করে বাটাবাটিতে থাকবে না। সে সরাসরি খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এই খেলায় ব্যবহৃত আরও কয়েকটি কৌশলের নাম হল ছোট বোয়াল মাছ; এই কৌশলে শুধু হাত দিয়ে একটি বোয়াল মাছের আকৃতি দেখাতে হবে আর মুখে বলতে হবে ছোট বোয়াল মাছ বড় বোয়াল মাছ; এই পদ্ধতিতে একজন হাতের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ির মতো করে এগুতে থাকবে আর একজন পেছন দিক থেকে পা দুটো উঁচু করে ধরে বড় বোয়াল মাছ বলতে থাকবে।

৯. হা-ডু-ডু

হা-ডু-ডু বা কাবাডি খেলা বাংলার সব অঞ্চলের মত বিক্রমপুরেও প্রচলিত। এটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। বর্তমানে কাবাডি খেলা বাংলাদেশের 'জাতীয় খেলা' বলে পরিগণিত। খেলার উপলক্ষ শরীরচর্চা। প্রতিযোগিতামূলক এই খেলায় জয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের বেদনা আছে। উঠতি বালক থেকে তরুণ ও যুবক দলগতভাবে এ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাড়ির বহিরাঙ্গনে অথবা খোলা মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক হা-ডু-ডু খেলায় ঘরের সীমানা নির্ধারিত থাকে। সাধারণত পঁচিশ হাত দৈর্ঘ্য ও পনের হাত প্রস্থের ঘরের মাঝ বরাবর একটি রেখা টেনে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'গাঙ' বলে। প্রতিযোগী দুই দল দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। প্রতিযোগিতা না হলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রতিদলে পাঁচ-ছয় জন থেকে দশ-এগার জন হতে পারে। কোনো দল আগে 'ডাক' বা 'বোল' দিবে, টসের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা হয়। একজন খেলোয়াড় বোল দিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ছুঁতে যায়। বোল দেওয়ার সময় দম ধরে রাখতে হয়। তার বোলকে শ্রুতিগ্রাহ্য করার জন্য মুখে 'হা-ডু-ডু', 'কাবাডি কাবাডি' ইত্যাদি ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। অনেক সময়

www.pathagar.com

ছড়া কেটেও বোল দিয়ে থাকে। ঢাকা থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি বোল : "চি চটকা আমের বোল/গাছে উঠি মারি শোল॥ শোলের কপালে ফোঁটা/খেড়ু মারি গোটা গোটা॥" যদি সে ছুঁয়ে মাঝখানের রেখা গাঙ অতিক্রম করতে পারে তাহলে

হা-ডু-ডু খেলা

স্পর্শকারী খেলোয়াড় 'মারা' পড়ে অর্থাৎ 'আউট' হয়। আর যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের হাতে বন্দি হয় ও দম ছেড়ে দেয়, তবে সেই মারা পড়ে। দ্বিতীয়বার বোল দিতে আসে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়। ছোঁয়াছুয়ি, ধরাপড়া এই রকম। তবে এই খেলায় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে মেরে নিজ দলের মরা খেলোয়াড়কে জীবিত করা যায়। এভাবে খেলতে খেলতে যাদের দলের সব খেলোয়াড় 'মারা' পড়ে, তাদের পরাজয় হয়। যারা জয়ী হয়, তারা এক 'গোল্লা' বা পয়েন্ট পায়। এই ভাবে যারা বেশি গোল্লা পায়, তারা চূড়ান্ত বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় আয়োজকদের পক্ষ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। এতে অনেক দর্শকের সমাগম হয়। বস্তুত হা-ডু-ডু শক্তির খেলা। এতে দৈহিক শক্তির সাথে বিভিন্ন কলাকৌশল ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করতে হয়। হা-ডু-ডু পুরুষের খেলা। সমবয়সের বালক, তরুণ-যুবক হা-ডু-ডু খেলায় অংশগ্রহণ করে। তারা পরনে আঁট-সাঁট পোশাক পরে; গা খালি থাকে।

১০. গোল্লাছুট

গোল্লাছুট দলগত খেলা; উপলক্ষ বিনোদন ও শারীরিক ব্যায়াম। বাংলাদেশের সর্বত্র খেলাটি প্রচলিত আছে। সাধারণত সমতল ভূমিতে মাঠে বা ফসল-তোলা জমিতে ৮-১০ জন বালক অথবা বালিকা এ খেলায় অংশগ্রহণ করে। তারা দুইজন দলনেতার অধীনে সমান সংখ্যায় ভাগ হয়ে যায়। এরূপে ভাগ হওয়ার নিয়ম আছে- খেলোয়াড়রা

www.pathagar.com

জোড়ায় জোড়ায় মিলে ফুল-ফল, লতা-পাতার ছদ্মনাম নিয়ে দলপতিদ্বয়ের কাছে যায়। দলপতির একজন ছদ্মনাম বলে একজনকে বেছে নেবে। স্বাভাবিকভাবে অন্যজন অপর দলপতির কাছে যাবে। একে 'ডাক' নেওয়া বলে। দলপতিদ্বয় পালাক্রমে এভাবে ডাক দিয়ে খেলোয়াড় বণ্টন শেষ করে। কোন দল আগে দান পাবে, সেটাও টসের মাধ্যমে স্থির করা হয়। খেলার মাঠের এক জায়গায় ছোট একটি বৃত্ত বা গর্ত থাকে। গর্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাইরের সীমানা থাকে। টসে বিজয়ী দলের একজন বালক গর্ত ছুঁয়ে দাঁড়ায়। তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'গোল্লা' বলে। গোল্লাসহ অন্য খেলোয়াড়রা হাত ধরাধরি করে শৃঙ্খল রচনা করে ঘুরতে থাকে এবং সুযোগ মতো হাত ছেড়ে সীমানার দিকে দৌড় দেয়, লক্ষ্য সীমানা-রেখা স্পর্শ করা।

অন্যদিকে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা তাদের ছোঁয়ার জন্য তৎপর থাকে। তাদের কেউ যদি প্রতিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নির্ধারিত সীমানা স্পর্শ করতে পারে, তবে সে 'পাকা' হয়। আর যদি প্রতিপক্ষের কেউ হাত-ছাড়া অবস্থায় তাকে ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে সে 'মারা' পড়ে। পাকা খেলোয়াড় গোল্লা থেকে লাফ দেয় বা শুয়ে শুয়ে একজন আগের জনকে স্পর্শ করে সীমানার দিকে অগ্রসর হয়। যদি এইভাবে সীমানা স্পর্শ করা যায়, তা হলে এক 'গোল্লা' বা পয়েন্ট হয়। যদি 'গোল্লা' স্বয়ং বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিয়ে সীমানা ছুঁতে পারে, তাহলেও সরাসরি গোল্লা হয়। আবার বিপরীতভাবে গোল্লাকে কোনো রকমে ছুঁয়ে দিতে পারলে দলের সব খেলোয়াড় 'মারা' পড়ে। তখন প্রতিপক্ষ খেলা শুরু করার সুযোগ পায়। সাত গোল্লা মিলে এক 'গজ' হয়। যে দল বেশি 'গোল্লা' বা 'গজ' পায়, সেই দলের জয় হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানা ছুঁতে হয় বলে এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে। গোল্লা খেলা ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা, এতে দম ধরে রাখা, ছি বা বোল দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে দৌড়ের ক্ষিপ্রতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের উপর খেলার কৃতিত্ব নির্ভর করে।

১১. বৌছি

বৌছি খেলা দলগত। এটি 'ছি' বা 'বুড়ির চি' খেলা নামেও পরিচিত। তবে এর ভদ্র নাম 'বৌ-বাসন্তী খেলা'। খেলার উপলক্ষ শরীরচর্চা ও চিত্তবিনোদন। বৌছি খেলা সর্বাঞ্চলীয়। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বৌছি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এক এক দলে ৭-৮ জন করে খেলোয়াড় থাকে। সাধারণত খোলামেলা জায়গায় সমতল ভূমিতে ২০-২২ হাত ব্যবধানে দুটো ঘর করা হয়। একটি ঘর বৃত্তাকার ও আকারে ছোট; একে 'বৌ-ঘর' বা 'বুড়ির ঘর' বলে। অন্য ঘরটি আয়তাকার, আকারে বড় হয়। এই ঘরে বৌ-পক্ষের অন্য খেলোয়াড়রা থাকে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা উভয় ঘরের প্রতি লক্ষ রেখে বাইরে চারপাশে সুবিধা মতো অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের মূল লক্ষ থাকে বৌ-এর গতি-বিধির প্রতি, আর যে 'ছি' দিতে বাইরে আসে, তার প্রতি। যে 'ছি' দেয়, তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে বৌ-কে পাহারা দেয় তারা, যাতে সে কোনো ফাঁক-ফোকরে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে প্রতিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বড় ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। যদি সে সফল হয়, তবে প্রথম দলের এক 'পাল্টি' বা 'গেম' হয়। ঘরে ফেরার সময় যদি বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বৌ-কে ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে বৌ-পক্ষের সব খেলোয়াড় মারা পড়ে। তখন দ্বিতীয় পক্ষ অনুরূপভাবে খেলা শুরু করে। এভাবে বৌছি খেলা চলতে থাকে। যে

www.pathagar.com

দল বেশি পট্টি পায়, সে দলের জয় হয়। 'ছি' দেওয়ার সময় শ্বাস রেখে শ্রুতিগ্রাহ্য কিছু ধ্বনি বা ছড়া আবৃত্তি করতে হয়, যাতে প্রতিপক্ষ বুঝতে পারে, সে শ্বাস ধরে রেখেছে। যেমন, "কাঁচা কলা পাকা আম,/বউ ছুঁইতে গেছিলাম।"।

"চুক গাব না, চৌরী গাব,/পাতিনেবুর মাতি খাব।"

"কচুপাতা লতকন/ তোরে ছুঁইতে কতক্ষণ"। 'ছি' দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারলে সে 'মারা' যায়, অর্থাৎ খেলার অধিকার হারায়। আবার ঘরের বাইরে থাকার সময় যদি তার দম ফুরিয়ে যায়, অর্থাৎ সে শ্বাস ছেড়ে দেয়, তবে সে নিজেই মারা পড়ে। বিপক্ষের যত খেলোয়াড় মারা যায়, বৌ-এর পক্ষে ঘরে ফেরার পথ তত নিষ্কণ্টক হয়। আর স্বপক্ষের খেলোয়াড় বেশি মারা গেলে তার সে পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। দৌড়-ঝাঁপের এই খেলায় শরীরচর্চার পাশাপাশি আনন্দের উৎস নিহিত আছে।

১২. দাড়িয়াবান্ধা

দাড়িয়াবান্ধা বিক্রমপুরের একটি জনপ্রিয় খেলা। কুমিল্লায় এটি 'রেডি খেলা' নামে প্রচলিত আছে। খেলাটি দলগত; উপলক্ষ অবসর বিনোদন ও শরীরচর্চা। খোলা জায়গায় ঘর কেটে দাড়িয়াবান্ধা খেলা হয়। বালকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এটি খেলে থাকে। তবে মাঝে মধ্যে বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করে। দলে চার-ছয় থেকে আট-দশ জন পর্যন্ত সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। এতে ছক-বাঁধা ঘর বা কোট থাকে। মাটির উপর দাগ কেটে কোটের সীমানা নির্দেশ করা হয়। আয়তাকার এই কোটের দৈর্ঘ্য খেলোয়াড়ের সংখ্যানুপাতে ছোট-বড় হয়। তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত

দাড়িয়াবান্ধা খেলা

সীমানা মেনে নিতে হয়। কোটটি লম্বালম্বিভাবে এক হাত ব্যবধানের দুটি সমান্তরাল রেখা দ্বারা বিভক্ত করা হয়। এই রেখাকে 'খাড়া কোট' বলে। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী তিন, চার, পাঁচটি সমপরিমাণ দৈর্ঘ্য-প্রস্থযুক্ত ঘর আড়াআড়িভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখা দিয়ে কাটা হয়। এর মাঝের দূরত্বও এক হাতের মতো হয়। একে 'পাথাল

www.pathagar.com

কোট' বলে। সমান্তরাল এসব রেখার উপর দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়গণ দৌড়াদৌড়ি করতে পারে।

দাড়িয়াবান্ধার ছকটি নিম্নরূপ :

দাড়িয়াবান্ধা খেলার ছক

ছকে ৫ জন করে মোট ১০ জন খেলোয়াড় খেলতে পারবে। এক দল 'দাইড়া' চেয়ে অনুমতি পেলে 'গাদিঘর' থেকে বেরিয়ে পড়ে। লক্ষ সব ঘর প্রদক্ষিণ করা। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় নিজ নিজ ঘরের সীমানার মধ্যে থেকে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে কোনো খেলোয়াড় যদি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের ছোঁয়া থেকে বেঁচে সব ঘর অতিক্রম করে গাদিঘরে ফিরে আসে, তবে ঐ দল এক 'গোল্লা' বা পয়েন্ট পায়। তবে কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ফেললে অথবা সীমানার বাইরে চলে গেলে অথবা কাঁচাপাকা ডাইল; হলে তখন সব খেলোয়াড় 'মারা' পড়ে। অতঃপর বিপক্ষ দল খেলার অধিকার পায়। যে দল বেশি 'গোল্লা' পায়, সেই দল জয়ী হয়। সীমানার বাধ্যবাধকতা থাকায় দৌড়ের চেয়ে কৌশলের উপর এই খেলার সফলতা নির্ভর করে। দাড়িয়াবান্ধা খেলায় সবার সমান দায়িত্ব রয়েছে। একজনের ভুলের জন্য পুরো দলকেই মাশুল দিতে হয়।

১৩. কুত-কুত

একক, দ্বৈত অথবা দলগত বিনোদনমূলক খেলা এটি। খেলায় ব্যবহৃত উপাদান ভাঙা মৃৎপাত্রের এক টুকরো চাড়া। এটি মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। সাধারণত ছেলেরা এতে অংশগ্রহণ করে না। মাটির উপর দাগ কেটে কুতকুত খেলার ঘর তৈরি করা হয়। এই খেলার ঘরটি নিচের ছকে দেখানো হলো:

ছক্কা
পাঁচকা
চাইরকা
তিনকা
দোক্কা
এক্কা

কুতকুত খেলার ছক

www.pathagar.com

এক এক অঞ্চলে ঘরগুলির এক এক রকম নাম আছে। বিক্রমপুরে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত ঘরগুলির নাম যথাক্রমে 'এক্কা', 'দোক্কা', 'তিনকা', 'চাইরকা', 'পাঁচকা', ও 'ছক্কা'। খেলায় মৃৎপাত্রের একটা টুকরা লাগে; একে 'চাড়া' বা 'চিক' বলা হয়। প্রথমে একজন খেলোয়াড় ১নং ঘরে 'চিক' ছুঁড়ে দেয়। পরে এটিকে পায়ের পাতার উপর রেখে লাফাতে লাফাতে সামনের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে 'ছক্কা'র ঘরে পৌঁছবে। আবার সে চিকটাকে নিয়ে ফেরত আসবে। সে এভাবে চিক নিয়ে নিরাপদ অবস্থায় এক পাক দিতে পারলে দ্বিতীয় ঘরে চিক মারার অধিকার পায়। চিক ছুঁড়তে গিয়ে যদি ঘরের দাগে, বা অন্য ঘরে, বা ঘরের বাইরে চিকটি ছিটকে পড়ে, অথবা খেলার সময় কোনো ঘরে দুই পা মাটি স্পর্শ করে, তা হলে সে 'দান' হারাবে। এই খেলায় ঘর কেনার নিয়ম আছে। যদি কোনো খেলোয়াড় ছয়টি ঘর চক্রাকারে পাক দিতে পারে তখন সে 'ছক্কা' ঘরের বাইরে গিয়ে পেছনের দিকে না তাকিয়ে চিক ছুঁড়ে মারবে। যে ঘরের চিক ঠিকমতো পড়ে, সে ঘর কেনা হয়। সে এই কেনা ঘরে অন্য খেলোয়াড়দের চলাচলের জন্য রাস্তা দিতে পারে, নাও দিতে পারে। রাস্তা না দিলে তাদের লাফ দিয়ে ঘরটি পার হতে হয়। এই খেলায় যে বেশি ঘর কিনতে পারে তারই জয় হয়। নিঃশ্বাস ধরে আছে তা প্রমাণ করার জন্য এই খেলায় 'কুত্ কুত্' বা 'কিত্ কিত্' বলে 'ছি' দিতে হয়।

১৪. কানামাছি

দলগত এ খেলার ব্যবহৃত উপাদান গামছা বা এক টুকরা কাপড়। শারীরিক ব্যায়াম ও বিনোদন এ খেলার প্রধান উপলক্ষ। এটি ছেলেমেয়ের দলবদ্ধ খেলা। বাড়ির আঙিনায় বা একটু খোলামেলা জায়গায় এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে টসের মাধ্যমে একজনকে নির্বাচন করে তার চোখ বেঁধে সামনে আঙুল ধরে বলা হয়- এখানে কটি আঙুল? কানামাছি সঠিক জবাব দিতে না পারলে মনে করা হয়, চোখ বাঁধা ঠিক আছে। অন্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়, "কানামাছি ভোঁ ভোঁ/যাকে পাবি তাকে ছোঁ।" বলে ছড়া কাটে, আর তার গায়ে টোকা মেরে উত্যক্ত করে। কানামাছি দুই হাত প্রসারিত করে ঘুরে ফিরে তাদের কাউকে ধরার চেষ্টা করে। সে যদি একজনকে ধরে ফেলে তার নাম বলে দিতে পারে, তাহলে তার অন্ধত্ব দূর হয় এবং যে ধরা পড়ে, সে পরবর্তী খেলার কানামাছি হয়।

কানামাছি

www.pathagar.com

খেলার এ রকম পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে 'কানামাছি' নামকরণ হয়েছে। এটি বিক্রমপুরের বহুল প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খেলা।

১৫. দড়িলাফ

দড়িলাফ মুন্সিগঞ্জে প্রচলিত জনপ্রিয় খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি পরিশ্রমী খেলা। এটি স্কিপিং খেলার সম্পূর্ণ নকল। এরজন্য বাজারে বিশেষ রশি পাওয়া যায়। এর দু'প্রান্তে কাঠের টুকরো সংযুক্ত করা থাকে, যাতে হাত থেকে দড়ি ছুটে না যায়। গ্রামে সাধারণ মানের পাকানো দড়িও ব্যবহৃত হয়। এ খেলায় যে কোনো সংখ্যক কিশোরী অংশ নিতে পারে। দড়িলাফ খেলায় হারজিত নির্ধারিত হয় সংখ্যা দিয়ে। যে যত বেশি বার লাফ দিতে পারে, সেই বিজয়ী হয়। তবে লাফের সময় যদি দড়ি পায়ে লেগে জড়িয়ে যায়, তবে সে খেলা থেকে বাদ পড়ে; তখন অন্যজন সুযোগ পায়। দড়ি লাফ খেলার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—প্রথমে দড়ি পিছনের দিকে মাটিতে ছুঁইয়ে রেখে লাফানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। এরপর পিছন থেকে মাথার উপর দিয়ে সামনে এনে পায়ের তলা দিয়ে আবার পিছনে নিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় খেলাটি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। সাধারণত সামনে থেকে পিছনে দড়ি নেওয়া নিয়ম থাকলেও অনেক সময় দক্ষ খেলোয়াড়রা নৈপুণ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে ডান থেকে বামে দড়ি নেওয়ার কৌশল রপ্ত করে। এমন কি, কেউ কেউ দড়ির ভেতর দুই-তিন জন নিয়েও লাফায়। স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় খেলাটি অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে গণ্য হয়।

১৬. ষোলগুটি

ষোলগুটি দ্বৈত খেলা। মাটির উপর দাগ কেটে ঘর বা ছক এঁকে ছোট ছোট কাঠি, ফলের বিচি, মাটির ঢিল অথবা পাথরকুচি- হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই গুটি হিসেবে ব্যবহার করে এটি খেলা হয়। খেলোয়াড়দ্বয় মুখোমুখি বসে নিজ নিজ দিকে ষোলটি ঘরে ষোলটি গুটি বসায়। খেলার সুবিধার জন্য গুটির আকার দুই রকম হয়। উপলক্ষ অবসরযাপন ও বুদ্ধিচর্চা। দুই জন ষোলটি করে গুটি খেলা বলে এর 'ষোলগুটি' নামকরণ হয়েছে। যেহেতু সরঞ্জাম অতি সামান্য, সেহেতু দু'জনের উপস্থিতি ও তাৎক্ষণিক সম্মতিতে খেলা শুরু হতে পারে। এর জন্য কোনোরূপ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না।

ষোলো গুটি খেলা

www.pathagar.com

ষোলগুটির ছকে উভয় পক্ষের ষোলটি করে গুটি বসানো হয়। উভয়ের মাঝে একটি রেখা খালি থাকে। যে কোনো এক পক্ষ খালি জায়গায় গুটির চাল দিয়ে খেলার সূচনা করে। লক্ষ থাকে প্রতিপক্ষকে চালের মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে তার গুটি মারা। গুটি মারার নিয়ম হলো : প্রতিপক্ষের গুটির বিপরীতে শূন্য ঘর পেলে লাফ দিয়ে তা মারতে পারে। এভাবে যখন এক পক্ষের সকল গুটি মারা যায়, তখন তার পরাজয় হয়। আবার কৌশলে কোনো এক পক্ষ যদি বিপক্ষের গুটির চালের পথ বন্ধ করে দেয়, তাহলেও তার পরাজয় হয়। বলা বাহুল্য, এটি একটি বুদ্ধির খেলা। এতে সতর্কতা, দূরদর্শিতা ও কুশলতার আবশ্যক হয়। একে দাবা খেলার গ্রামীণ সংস্করণ বলা যায়। দাবার গুটির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও নাম আছে- হাতি, ঘোড়া, নৌকা, সৈন্য, মন্ত্রী, রাণী ইত্যাদি। ষোলগুটির কারো নামে কোনো পার্থক্য নেই। ষোলগুটি খেলার অপর নাম 'মোঘল-পাঠান' খেলা। এটি একটি যুদ্ধের কৌশলগত খেলা, তা এরূপ নামকরণ থেকে অনুমিত হয়। বাংলার মাটিতে মোঘল-পাঠান যুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল আছে। ষোল-সতেরো শতকে বাংলার মাটিতে মোঘল-পাঠানে একাধিক বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরূপ যুদ্ধের স্মৃতি ও যুদ্ধবিদ্যার কৌশল অবলম্বন করে খেলাটি উদ্ভাবিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায় এবং তা সত্য হলে এর প্রচলনের একটি নিশ্চিত সময় পাওয়া যায়। রংপুরে খেলাটির নাম 'চৌপাতি খেলা'। জনশ্রুতি আছে যে, কালো ও সাদা কচুর বোঁটা দিয়ে চৌপাতি খেললে বৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতামূলক এ খেলায় বিজয়ীকে অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এই খেলার একটি নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। সেই ছকটি কাগজে এঁকে বা মাটিতে এঁকে খেলা হয়। এই খেলায় দুই জন প্রতিপক্ষ থাকে। পরস্পরের গুটি চালাচালির মাধ্যমে খেলাটি সম্পন্ন হয়। দুই জন খেলোয়াড় দুই রকমের গুটি দিয়ে খেলে। অনেকটা দাবা খেলার মতো এই খেলায় গুটির চাল রয়েছে। এটি খেলার জন্য এক একজন খেলোয়াড়ের ১৬টি করে মোট ৩২টি গুটির প্রয়োজন হয়।

১৭. নলডুব বা হৌলডুবানি

এটি পানির খেলা, উপলক্ষ বিনোদন ও শরীরচর্চা। সাধারণত ১০-১২ বছরের কিশোর বালকেরা পুকুর, নদী বা কোনো জলাশয়ে অল্প পানিতে এ খেলা করে থাকে। বর্ষা মৌসুমে এ খেলা ভাল জমে, কারণ তখন সর্বত্র পানি থৈ থৈ করে। দলগত এ খেলায় প্রথমে একজনকে 'চোর' নির্বাচন করা হয়। সে ডুব সাঁতার কেটে পালাবে, অন্যরা তাকে ধরার চেষ্টা করবে। দলের মধ্যে থেকে যে কেউ তার মাথা ছুঁয়ে দিতে পারলে সে বিজয়ী হয়। এরপর সে আবার ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে পালাবে। তারপর সবাই ক্লান্ত হলে গোসল সেরে বাড়ি ফেরে।

১৮. লাটিম খেলা

এই খেলাটি গ্রাম অঞ্চলের বালকপ্রিয় খেলা। লাটিম খেলার জন্য শক্ত ও পরিষ্কার মাটির প্রয়োজন। এটি বালকদের একটি দলবদ্ধ খেলা তবে একাও খেলা যায়। এই খেলার শুরুতে নির্দিষ্ট স্থানে একটি বৃত্ত আঁকা হয়। এরপর খেলোয়াড়েরা সবাই মিলে লাটিম ঘোরানোর সরু দড়ি দিয়ে লাটিমটি পেঁচিয়ে বৃত্তের মধ্যে ছুঁড়ে মারে। খেলা

www.pathagar.com

চলাকালীন সময়ে বৃত্তবন্দি লাটিম যদি কোনো খেলোয়াড়ের লাটিমের আঘাতে বাইরে বেরিয়ে আসে, তাহলে খেলাটি নতুন করে শুরু হয়।

১৯. মার্বেল খেলা

মার্বেল খেলা বালক ও কিশোরদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। দুইয়ের অধিক খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে এটি খেলা হয়। মার্বেল খেলাটি বিভিন্নভাবে খেলা যায়। মার্বেল খেলার শুরুতে খেলোয়াড়েরা সমতল জায়গায় কোনো এক স্থানে একটি ছোট গর্ত করে। গর্তের এক থেকে দেড় হাত দূরে একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগ থেকে তিন চার হাত দূরে আরও একটি দাগ কেটে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। প্রথমে একজন খেলোয়াড় পিছনের দাগ থেকে গর্তটি লক্ষ করে একটি মার্বেল ছোড়ে; এভাবে বাকি খেলোয়াড়েরা একটি করে মার্বেল ছোড়ে, যার মার্বেল গর্তের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করে সে প্রথমে সবার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মার্বেল সংগ্রহ করে পেছনের দাগ থেকে মার্বেলগুলো ছুড়ে মারে যাতে সবগুলো মার্বেল সামনের দাগকে অতিক্রম করে।

যদি কোনো একটি মার্বেল সামনের দাগকে অতিক্রম না করে তাহলে সে দান হারায়। গর্তের কাছের মার্বেলের পরের জন দান পায়। যদি সামনের দাগ পার হয়।। তাহলে সেগুলোর যে কোনো একটি মার্বেলকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা নির্দেশ করে এবং যদি সে সেই মাবেলটিকে একটি মার্বেল দিয়ে আঘাত করতে পারে তবে সে সফল হয় এবং সবগুলো মার্বেল তার অধিকারে আসে। আর যদি অন্য মার্বেলকে স্পর্শ করে তাহলে শাস্তিস্বরূপ তাকে একটি মার্বেল দিতে হয়। আর যদি আঘাত করতে না পারে তবে গর্তের কাছাকাছি মার্বেলে অবস্থানকারী খেলোয়াড় পর্যায়ক্রমে খেলতে থাকে। গুলি ছোড়ায় ও আঘাত করায় যে যত দক্ষ এ খেলায় সে তত জয়লাভ করে।

২০. ঘুড়ি ওড়ানো

ঘুড়ি ওড়ানো জেলার লোকখেলাধুলার মধ্যে অন্যতম খেলা। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের প্রায় সবসময়েই ঘুড়ি ওড়ানো হয়। বিভিন্ন রং ও নকশায় ঘুড়ি তৈরি করা হয়। অত্যন্ত পাতলা কাগজ বাঁশের চিকন কাঠি ও আঠা দিয়ে তৈরি বাহারি রকমের ঘুড়ি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : চৌরঙ্গী, পঙ্খী, মুখপান, ঢাউস ইত্যাদি তৈরি হওয়ার পরে অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং শক্ত সুতা দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়।

সুতা সাধারণত বাঁশ দ্বারা নির্মিত নাটাইয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। মাঝে মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যার ঘুড়ি সবচেয়ে বেশি উঁচুতে ওঠে ও স্থির থাকে সে বিজয়ী হয় এবং তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

২১. কুমির-কুমির খেলা

এই খেলাটি শিশু বালক-বালিকার মধ্যে বেশ প্রিয় খেলা। এই খেলায় কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না। শুকনো মৌসুমে মাটি ফেটে গেছে এমন কিছু জায়গাকে

www.pathagar.com

নদী হিসেবে এবং বাকি অংশ নদীর পাড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খেলার শুরুতে খেলোয়াড়েরা একত্র হয়ে একজনকে কুমির নির্বাচন করে। অতঃপর কুমির নদীর চিহ্নিত কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকার ভান করে। এ সময়ে অন্য খেলোয়াড়রা–

"এই নদীতে কুমির নাই
ঝাপুর ঝুপুর নাইয়া যাই—"

ইত্যাদি ছড়া বলতে বলতে গোসল করার ভান করে। লুকিয়ে থাকা কুমির তখন গোসল করা কাউকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যদি লাফিয়ে বা দৌড় দিয়ে নদীর পাড়ে উঠে যায় তাকে ধরা যাবে না। কুমির তখন আবার লুকিয়ে পড়ে অন্য কাউকে ধরার চেষ্টা করে। যে ধরা পরবে সে নতুন কুমির হবে।

২২. পুতুল বিয়ে

পুতুলখেলা একচেটিয়া মেয়েদের খেলা। কোমলমতি মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলে থাকে। কাঠের, মাটির, পাট অথবা কাপড়ের তৈরি নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, বর-কনে, নানা ধরনের পুতুলকে কাপড় ও গয়না দিয়ে সাজানো হয়। রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন, মেয়ে-পুতুলের সঙ্গে ছেলে-পুতুলের বিয়ে, মেয়ে বিদায় ইত্যাদি বিষয়ে অভিনয় করে পুতুল খেলা হয়।

পুতুল খেলার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পুতুলের বিয়ে দেয়াটাই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। সত্যিকারের বিয়ে অনুষ্ঠানের অনুকরণে এই বিয়েতে বরাগমন এবং খাওয়া দাওয়া সহ সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতার ভান করা হয়। কোনো কোনো অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের বালিকার পুতুলের বিয়েতে সত্যি সত্যি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়।

২৩. সাত চারা মেলা

দুই দলে বিভক্ত সমান সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে সাত চারা খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সাত চারা খেলায় ছোট একটা বল এবং একই আকৃতির ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসির কিংবা বাসন-কোসনের কয়েকটি টুকরার প্রয়োজন হয়। টুকরাগুলি নিচ থেকে উপরের দিকে পরপর সাজানো হয়। শুরুতে প্রথম পক্ষের একজন সাজানো চারাগুলিতে বল দ্বারা আঘাত করার চেষ্টা করে। সে সফল হলে পক্ষের প্রতিযোগীরা অতি দ্রুত সেটি পুনরায় সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করে। বিপক্ষের আঘাত বাঁচিয়ে এই কাজটি করতে পারলে তারা খেলার দান পাবে। আর তার আগেই যার বল লাগবে সে মারা পড়বে। এভাবে সবাই মারা পড়লে এক পয়েন্ট লাভ হয়। খেলা শেষে যাদের নম্বর বেশি থাকে তাদেরকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

২৪. বলি খেলা

বলি এক প্রকার শক্তি পরীক্ষার খেলা। এই খেলায় দুই জন করে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষকে শক্তি ও কৌশল দ্বারা পরাভূত করতে পারবে সে জয়ী বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

২৫. নৌকা-বাইচ খেলা

নৌকা-বাইচ একটি প্রতিযোগিতামূলক উত্তেজনাকর খেলা। এই খেলাটি জেলার সর্বত্র বিশেষ করে গজারিয়া এলাকার লোকদের কাছ খুবই পরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী একটি খেলা। সাধারণত বর্ষাকালে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। নৌকা বাইচের নৌকাগুলির আকৃতি লম্বাটে ও অন্যান্য নৌকার চেয়ে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই খেলায় গ্রামের বলিষ্ঠ যুবকরা নৌকায় দুইপাশে জোড়ায় জোড়ায় বসে বৈঠা দ্বারা বাইচ দেয়। এ কারণে তারা বাইচাল নামে পরিচিত। মাঝি হাল ধরে। গান বাজনার মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কয়েকজন সারিদার থাকে। বিজয়ী নৌকাটি পুরস্কৃত হয়। কয়েক বছর যাবত মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুক্তারপুর ব্রিজের নিচে ধলেশ্বরী নদীতে সাড়ম্বরে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২৬. গরু-দৌড়

গজারিয়া উপজেলার এক জনপ্রিয় লোক-ক্রীড়ার নাম গরু-দৌড়। শীতকালে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এই খেলায় দুইটি গরু একটি জোয়াল ও একটি মই-এর প্রয়োজন হয়। পতিত সমতল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গরুর মালিক বা অপর একজন মইয়ের উপর দাঁড়ায়। এভাবে কয়েক জোড়া গরুরদৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী গরুর মালিক পুরস্কৃত হয়।

২৭. গাইয়া গুছিং

গাইয়া গুছিং দুরন্ত কিশোদের একটি খেলার নাম। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বর্ষার পানি নেমে গেলে যখন মাঠের মাটি নরম থাকে তখন গাছের ডাল দিয়ে এ খেলা খেলতে হয়। ডালগুলোর এক দিক কেটে সরু করা হয় যাতে সহজেই নরম মাটিতে প্রবেশ করানো যায়। যে কয়জন খেলবে প্রত্যেকে স্ব-স্ব দায়িত্বে নিজের লাঠিটাকে খেলার উপযুক্ত করে নেবে। প্রথমে একজন তার লাঠিটাকে ছুড়ে মাটিতে গাড়বে। এভাবে সবাই প্রচেষ্টা করবে। লাঠি খাড়াভাবে গাড়াতেই এ খেলার কৃতিত্ব হেলে পড়ায় কৃতিত্ব নেই। উল্লেখ্য যে, একজনের খাড়া লাঠিটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকজনের চেষ্টা থাকে। এভাবেই খেলা চলতে থাকে।

২৮. ডাংগুলি খেলা

জেলার বিভিন্ন এলাকার রাখালদের মাঝে এই খেলাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে বর্তমান সময়ে রাখালও নেই, এই খেলার প্রচলনও নেই। স্থানীয় ভাষায় নড়ি নামে পরিচিত লাঠি। যা গরু-মহিষ তাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। খেলার সময় নড়িটি হয় ডাংগুলি। আর ২-৩ ইঞ্চির দৈর্ঘ্যের গাছের শক্ত ডাল যা গুটি হিসেবে পরিচিত। সাধারণত দুই বা ততোধিক খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে ফসল শেষের উন্মুক্ত প্রান্তরে বসত বাড়ির পাশের পতিত জমিতে ডাংগুলি খেলা হয়। প্রথমে খেলার মাঠে একটি ছোট গর্ত করা হয়, যারা দান পায়, তাদের একজন মাটিতে ছোট একটা গর্ত করে তার উপর গুটিটি আড়াআড়ি করে রাখে এবং ডাণ্ডা মেরে সেটিকে দূরে ফেলার

www.pathagar.com

চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা সেটিকে লুফে নিতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে এবং শূন্যে থাকাকালীন সময়ে যদি গুটিটি ধরে ফেলতে পারে তবে ঐ খেলোয়াড় আউট হয়। আর ধরতে না পারলে গর্তের উপর রাখা ডাংগুলি লক্ষ করে ছুড়ে মারতে হয়। গর্তে আড়াআড়ি ভাবে রাখা ডাংগুলি যদি গুটি দিয়ে লাগাতে পারে তবে ঐ খেলোয়ার খেলার অধিকার হারায় বা আউট হয়। আর না লাগাতে পারলে সে ডাণ্ডা বা ডাং তুলে গুটিকে আবার দূরে পাঠায়, তারপর গুটি থেকে গর্ত পর্যন্ত ডাং দিয়ে মাপতে থাকে। সাত পর্যন্ত মাপের আঞ্চলিক নাম হল—বাড়ি, দুড়ি, তেরি, চাখল, চম্পা, দেক, মেক। এরূপ সাত মাপে এক ফুল এবং সাত ফুলে এক দুল হয়। আউট না হওয়া পর্যন্ত এক খেলোয়াড় খেলতে পারে; আউট হলে দ্বিতীয় জন এই প্রক্রিয়ায় খেলা শুরু করে। খেলা শেষে যার পয়েন্ট বেশি হয়, সে বিজয়ী হয়।

২৯. রুমাল চুরি

অতি সামান্য উপকরণে দলবদ্ধ এই খেলাটি দেশীয় সংস্কৃতির অন্যতম অংশ। এই খেলার শুরুতে একজনকে চোর সাব্যস্ত করা হয় তারপরে বাকি খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট স্থানের কেন্দ্রের দিকে গোল হয়ে বসে পড়ে। এই সময় চোর হাতে একটি রুমাল বা ছোট কাপড়ের টুকরা নিয়ে বসে থাকা খেলোয়াড়দের পেছনে ঘুরতে থাকে। কোনো একজনের পেছনে তার অলক্ষ্যে রুমালটি ফেলে দিয়ে আগের মতই ঘুরতে থাকে। যার পেছনে রুমাল ফেলে দেওয়া হয়েছে সে যদি রুমালের ব্যাপারটা না বুঝতে পারে তবে চোর সকল খেলোয়াড়কে প্রদক্ষিণ করে ঐ খেলোয়াড়ের পিঠে কিল দিতে থাকে। চোরের মার থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঐ খেলোয়ার চোর হয়ে উঠে পড়ে এবং তার শূন্যস্থানে পূর্বেকার চোর বসে পড়ে। এভাবেই খেলা চলতে থাকে।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী

জীবন-জীবিকার দরকারে মানুষ একটি পোশাকে বেছে নেয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুগ যুগ ধয়ে একই পেশায় জীবন কাটিয়ে দিত সম্প্রদায়ের মানুষ। সে সময়ে নিজের পছন্দমতো পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছিল না। জন্মগতভাবেই বিভিন্ন গোত্রের যা সম্প্রদায়ের জন্য পেশা নির্ধারিত থাকত। সেই সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রদায়গত পেশায় বাইরে যেতে পারত না। সভ্যতার বিকালে নতুন নতুন পেশাজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ মেকার, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক, টোকাই, হেলপার, ড্রাইভার ইত্যাদি পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ কৃষি সমাজে ধান, পাট, আখ, তুলা, সবজি ইত্যাদি চাষ হচ্ছে। কৃষিজীবী সমাজ নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে। বাংলাদেশের বিরাট অঞ্চল চাষ উপযোগী ফলে প্রায় সব অঞ্চলেই কৃষিজীবী সমাজ লভ্য। মুন্সিগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী।

১. বেদে সম্প্রদায়

আবহমান কাল থেকে বৃহত্তর ঢাকা তথা মুন্সিগঞ্জ জেলায় বেদে সম্প্রদায়ের বসবাস। মুন্সিগঞ্জ জেলায় বেদেরা সুদীর্ঘ কাল ধরে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি লালন করে যাচ্ছে। এরা নৌকায় বাস করে তবে কিছু কিছু নদী ও খালের ধারে ঘর-বাড়ি তৈরি করেও বাস করে। নদী আর নৌকা নিয়েই এদের জীবন। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে এদের বিচরণ।

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর, ষোলঘর, লৌহজং, ঘোড়দৌড়, খরিয়া, গয়ালিমান্দ্রা, বিউন্না বাজার, তালতলা, কমলাঘাট, ডহরী, কাটাখালী, দিঘিরপার, মুন্সিরহাট ও গজারিয়ায় বেদে বহর আছে।

বেদে সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি জাত আছে। এক জাতের সাথে অন্য জাতের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠার নিয়ম আগে ছিল না। এদের মধ্যে বৈদ্য, বৈয়াল, সান্দার প্রধান। এখন আর তেমনটা নেই।

বৈদ্যরা কবিরাজি করে, সাপের খেলা দেখায়, সাপের চাষ করে, নদী থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে মুক্তা আহরণ করে, সাপে কাটা রুগির চিকিৎসাসহ বিভিন্ন তাবিজ-তুমার করে। এদের স্ত্রীরাও স্বামীদের মতো বাড়ি-বাড়ি গাওয়াল করে সাপের খেলা দেখায় ও টোটকা চিকিৎসা করে থাকে। এদেরকে বাইদানি বলা হয়।

বৈয়াল জাতের বেদেরা মাছ ধরে বিক্রি করে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই নৌকায় করে বরশি, জুইত্যা, জাল ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরে। মাছ ধরা ছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে। রস খসাই, বিষ খসাই, বাত কাটি, চুঙ্গি লাগাই ইত্যাদি বলে চিৎকার করে গ্রামে-গ্রামে রুগির খোঁজ করে। অনেকে আবার যাদুর খেলা দেখায়।

www.pathagar.com

সান্দাররা মূলত ব্যবসায়ী। এদের স্ত্রী ও কন্যারা বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ও চুড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মেয়েরা শিশুসন্তান কাপড় দিয়ে পিঠে বেঁধে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ফেরি করে।

বেদের বহরে একজন সর্দার থাকে। বয়স ও বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে সর্দার নির্বাচন করা হয়। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম থাকতে ভালোবাসে। বেদেরা নৌকায় সারাদেশ বিচরণ করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে তারা কয়েক মাসের জন্য থিতু হয়। ঐ স্থানটিকে বাইদ্যার টেক বলা হয়। লৌহজং উপজেলার খরিয়া গ্রামে বিখ্যাত বাইদ্যার টেক ছিল। এখন পদ্মায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বেদেদের সচ্ছল পরিবারের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে নৌকাদান চালু আছে। বেদের বহরে ১০ থেকে ৫০টি নৌকা একসঙ্গে দেখা যায়। এরা প্রায় সবাই মুসলিম। এদের মৃতদেহ নদীর তীরে সমাহিত করা হয়। এরা নিজেদের মধ্যে তেমন একটা ঝগড়া বিবাদ করে না। তবে এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাকের ব্যবস্থা আছে। বেদে পরিবারে এখন বেদে সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকালের অনেক প্রচলিত বাধ্যবাধকতা এখন আর এদের মধ্যে নেই। সময়ের সাথে সাথে তাদের পেশারও পরিবর্তন ঘটছে। খাল ও নদীতে জল হ্রাস পাওয়ায় বেদে বহরের নৌকাও হ্রাস পাচ্ছে। বেদে পরিবারে অনেকেই এখন প্রবাসী হয়ে অন্যান্য পেশা গ্রহণ করেছে। এখন অনেকেই ডাঙায় ঘর-বাড়ি তুলে বসবাস করছে।

২. ঋষি বা মুনি সম্প্রদায়

সিরাজদিখান উপজেলায় ইছামতি নদীর তীরে চোরমর্দন গ্রামে ঋষি সম্প্রদায়ের একটি পল্লি আছে। বর্তমানে এই পল্লিটি মুনিপাড়া নামে পরিচিত। গৃহপালিত পশুর চামড়া সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ ও চামড়ার সামগ্রী মেরামত করা ছিল এদের আদি পেশা। এখন নিজ পেশা ছাড়াও বাঁশ-বেত, বাদ্যবাদন, ইলেকট্রিক, ওয়েলডিং, ঢালাই, গাড়ি চালনা প্রভৃতি কাজ শিখে বিদেশে গিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করছে। এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন শ্রেণির বলে এখন আর ঋষি নামে পরিচিত হতে চায় না। এখন ঋষির আগে মুনি শব্দটি যুক্ত করে মুনিঋষি সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছে। আবার ঋষি শব্দটি পরিহার করে এখন মুনি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হচ্ছে।

মুনি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কালীভক্ত। এদের প্রধান তীর্থ শেখরনগরের মা কালীর মন্দির। মা কালী তাদের নিকট জাগ্রত দেবী। দেবীর কাছেই তাদের যত চাওয়া-পাওয়া মানত। চোরমর্দন গ্রামে মুনি পাড়ায় একটি কালী মন্দির আছে। তিন চার পুরুষ ধরে এখানে জাঁকজমকপূর্ণ কালীপূজা হয়। শ্রীনগরে কয়কীর্তন গ্রামের মুনি সম্প্রদায় জেলার সর্ববৃহৎ মূর্তি নির্মাণ করে মহাসমারোহে মা কালীর পূজা করে থাকে। এক সময়ে কয়কীর্তন গ্রামটি মুনি সম্প্রদায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। পথের পথিককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কই যাইবেন?' সে যদি উত্তর দেয় 'কয়কীর্তন' তবে প্রশ্ন কর্তা অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে, 'তয় অইত্ত'। অর্থাৎ পথিকটিও ঋষি সম্প্রদায়ের। কারণ কয়কীর্তন গ্রামে ঋষি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বসতি ছিল না বললেই চলে।

www.pathagar.com

মুনিদের মধ্যে একটি চমৎকার সামাজিক রীতি চালু আছে। মরা গরুর চামড়া ছাড়ানোর সময়ে যেকয়জন সামনে যাবে সবাই সমান ভাগ পাবে। আর একা সংগ্রহ করলে চামড়ার আয়ের ২৫% কালীপূজার ফাণ্ডে জমা দিতে হবে। চোরমর্দন গ্রামের মুনিপাড়ার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রণজিৎ মুনিদাস, বসন্ত মুনিদাস ও অক্ষয় মুনিদাস। বেতের মোড়া তৈরি, ঢোল বাজনা ও ঘোড়ার নাচের জন্য শান্তি মুনিদাসের দল এলাকায় বিখ্যাত। মুনি সম্প্রদায়ের পেশাগত শ্রেণিবিভাগ : ১. চামড়া ছিলা– চামার, ২. জুতা সেলাই– মুচি, ৩. বেতের কাজ– বেউত্যা, ৪. ঢোল বাদক– বাজন্দার বা বাদ্যকর। এ জেলায় বিভিন্ন স্থানে মুনি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। যেমন– চোরমর্দন, রসুনিয়া, ছাতিয়ানতলি, কান্দনিসার, কুসুমপুর, বালিগাঁও, টঙ্গিবাড়ি, বেতকা, আব্দুল্লাপুর, কমলাঘাট, কেওয়ার, মুন্সিগঞ্জ সদর, সেরাজাবাদ, হাসাইল, মূলচর, মালীর অঙ্ক, লৌহজং, কনকসার, হলদিয়া, গোয়ালিমান্দ্রা, মাওয়া, রাঢ়ীখাল, মাগডাল, বাঘড়া, কয়কীর্তন, শ্যামসিদ্ধি, শেখরনগর, বাড়ৈখালী, খাহ্রা, চুড়াইন, পাউসার, মরিচা, রাধানগর, কুচিয়ামোড়া, বীরতারা প্রভৃতি গ্রামে।

৩. বারুজীবী সম্প্রদায়

মুন্সিগঞ্জ জেলার সর্বত্রই পান চাষ হত। এই পান চাষের সাথে যারা জড়িত তারা বারুজীবী নামে পরিচিত। বারুজীবীরা অধিকাংশই হিন্দু। তারা ধীরে ধীরে দেশত্যাগ করায় এখন আর ব্যাপকভাবে পান চাষ হয় না। মুন্সিগঞ্জ সদর, টঙ্গিবাড়ি ও সিরাজদিখান উপজেলায় এ সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। তাই এ তিন উপজেলায় পানের চাষ হয়। সিরাজদিখান উপজেলার রসুনিয়া ইউনিয়নের প্রায় প্রতি বাড়িতেই পানের চাষ হত।

পান চাষের জন্য প্রয়োজন হয় উঁচুভিটার জমির। একে বলা হয় বরজ। বর্ষার জলে পানের ক্ষতি হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উঁচু ভিটা ২ ফুট গভীর করে কুপিয়ে গোবর সার ও মাসকলাই বীজ ছিটাতে হয়। মাসকলাই গাছ তিন-চার পাতা পর্যন্ত হলে বৈশাখ মাসে পুনরায় জমি কুপিয়ে গাছগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বরজের ঝাঁকা খাড়া করতে হয়। বন বা মাকাল বাঁশের চটি দিয়ে ঝাঁকা এবং বয়রা বাঁশ দিয়ে ঝাঁকার খুঁটি তৈরি করা হয়। আমন ধানের শুকনো নাড়া দিয়ে ঝাঁকাটি ঢেকে দেওয়া হয়। বাঁশের খাড়া চটির বেড়া দিয়ে পুরো বরজটির চারদিক ঘিরে ফেলা হয়। শ্রাবণ মাসে লেচা (আস্ত পোয়া) লাগাতে হয় অথবা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তিন গিঁটযুক্ত কাটা লতা লাগালেই চলে। দেড়-দুই মাস পর পাতা ভাঙ্গা শুরু হয়। বার হতে পনের দিনের মাথায় গাছ প্রতি দুটি পাতা সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত পাতা আঙ্গিনায় রেখে ছোট বড় একত্রে মিশিয়ে পানের গোছ (ভাঁজ) দেওয়া হয়। প্রতি গোছে চল্লিশটি পান থাকে। আশিটি পানে এক বিড়া এবং আশি বিড়ায় এক গাদি (পণ) হয়। পানের পাইকারি দাম হয় গাদি হিসেবে। বর্তমানে বলি (বড়) পানের গাদি আট হাজার, চাপিল পানের গাদি তিন হতে চার হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার বড়

www.pathagar.com

পানের আড়ৎ বেতকা। এছাড়া ধলাগাঁও, মুক্তারপুর ও মুন্সিরহাটে পান কেনা-বেচা হয়।

পানের শ্রেণিবিভাগ আছে। বাংলা পান সবুজ ও মচমচে। সাচি পানের রং কালো। চন্দন সাচি ঘ্রাণযুক্ত।

পানচাষীরা কিছু সংস্কার মেনে চলে। যেমন- তেলা মাথায়, বাসি কাপড়ে, চামড়ার জুতা পায়ে, ন্যাংটা অবস্থায় বরজে ঢুকে না। ঋতুবতী নারীদের বরজে প্রবেশ নিষেধ।

মুন্সিগঞ্জ জেলার বারুজীবী সম্প্রদায় খেয়ে-পরে স্বচ্ছল জীবন যাপন করে। কারণ তারা পাতায় পাতায় টাকা গোনে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে তাদের বাড়ি ঘর বেশ উন্নত। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বারুজীবী সম্প্রদায়কে 'কেউচ্যা কাটা বারৈ' বলে অবজ্ঞা করলেও তাদের জীবনমান নিয়ে প্রশংসা করে। পানচাষের জন্য উঁচু ভিটে বাড়ি কোদাল দিয়ে কোপাতে হয় বলে প্রচুর কেঁচো কাটা পড়ে। এজন্য তাদেরকে কেউচ্যা কাটা বারৈ বলে নিন্দা করা হয়। এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, 'কেউচ্যা কাটা বারৈরা খায় ভাল।' আর একটি প্রবাদ 'বারৈর পচা মুখে হাসে, জাউল্যার পচা নদীতে ভাসে।' অর্থাৎ পান একটু পচে গেলেও খাওয়া চলে কিন্তু মাছ পচে গেলে নদীতে ফেলে দিতে হয়। এ দেশে পান চাষ নিয়ে একটি ছড়া আছে :

ষোল চাষে মুলা
তার অর্ধেকে তুলা
তার অর্ধেকে ধান
বিনা চাষে পান।

এ ছড়াটি সিলেটের খাসিয়া ও পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এজেলায় পান চাষে প্রচুর পরিমাণে খরচ ও পরিশ্রম করতে হয়।

৪. বেরুয়া সম্প্রদায়

বেড় থেকে বেরুয়া শব্দের উৎপত্তি। বেরুয়া সম্প্রদায় মূলত মৎস্যজীবী। এরা বাঁশের শলা, বেত, কাতা অথবা নায়লন রশি দিয়ে বুনট করে বায়না তৈরি করে। বায়নাগুলো ২০-২৫ হাত লম্বা হয়। প্রয়োজনে জোড়া দিয়ে দীর্ঘ করা যায়। মাদুরের মত পেঁচিয়ে রোল করে রাখা যায়। নদীর ধার, বিল, পুকুর ইত্যাদি নিচু জলাশয়ে বায়না পেতে ঘের দিয়ে মাছ ধরাই তাদের কাজ। এ কারণেই এই জেলে সম্প্রদায়কে বেরুয়া বলা হয়। সিরাজদিখানের রাঙামিলা, সন্তোষপাড়া, টেঙ্গোরিয়া পাড়ায় এখনও বেরুয়া সম্প্রদায় বসবাস করে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ি ও সদর উপজেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত। আবহমানকাল ধরে এই জনপদের জেলে সম্প্রদায় পদ্মা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। জেলেদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়। পদ্মায় যখন গভীর জল ছিল, তখন অসংখ্য জেলেপল্লি এর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল। এখন

www.pathagar.com

পদ্মার জল শুকিয়ে গেছে। পদ্মার বুক জুড়ে বিস্তীর্ণ চর জেগে উঠেছে। পদ্মায় এখন আর তেমন ইলিশ ধরা পড়ে না। ইলিশের অভাবে জেলে পল্লিগুলোও উঠে গেছে। জেলেদের অনেকেই ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। তারা এখন করিমন, নছিমন, অটোরিক্সা, সি.এন.জি, বাস-ট্রাকের ড্রাইভার, কর্মকার, স্বর্ণকার, ময়রা, হালুইকর ইত্যাদি পেশায় জীবিকা নির্বাহ করে। মুন্সিগঞ্জ জেলার ইলিশ নির্ভর জেলে পল্লিগুলোর নাম : যশলদিয়া, ভাগ্যকুল, মাওয়া, শিমুলিয়া, ঝাউটিয়া, গাউদিয়া, গৌরগঞ্জ, হাসাইল, দিঘিরপাড় ইত্যাদি।

এছাড়াও তাঁতি (কাপড় বুননকারী), জেলে (মাছ ধরে বিক্রি করে), মাঝি (নৌকা চালায়), ময়রা (মিষ্টি তৈরি করে), কুমোর (নিজ প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র মাটি দিয়ে তৈরি করে), কবিরাজ (পল্লিচিকিৎসব), দর্জি (পরিধেয় বস্ত্র সেলাই করে পোশাক তৈরি করে), কলু (শর্ষে, তিল ও তিসি থেকে তেল উৎপাদক) রিক্সাওয়ালা (রিকশা চালক), স্বর্ণকার (সোনার অলংকার তৈরি করে), মুচি (জুতা তৈরি, সেলাই ও মেরামত করে) ইত্যাদি পেশাজীবী এ জেলায় রয়েছে।

কথিত আছে রাজা বল্লাল সেনের সময়ে বিক্রমপুরে কামারদের হাতে প্রথম ধাতু সংমিশ্রণ শিল্পের সূচনা হয়। তারা লোহা জুড়িয়ে দা, বটি, কুড়াল, কোদাল, শাবল, কাঁচি, ছুরি ইত্যাদি তৈরি করে। মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে এছাড়াও বেশ কিছু লোক পেশাজীবী সম্প্রদায় আছে।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

সুস্থতার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে নিরাময় সন্ধান করেছে মানুষ। নিত্যব্যবহার্য ফল, মাছ, হলুদ ইত্যাদির রস এবং বিভিন্ন গাছের পাতা ও ফলের রসের মিশ্রণে ঔষধ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আদিম মানুষের জাদুবিশ্বাসজাত হয়ে নানা মন্ত্রের প্রচলন কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত। এরই ধারাবাহিকতায় কোথাও কোথাও মন্ত্রপাঠের পাশাপাশি রোগিকে ঘিরে নৃত্য-গীতেরও প্রচলন রয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জেলাও এর বাইরে নয়, এই জেলার তন্ত্রমন্ত্র ও লোকচিকিৎসার বর্ণনা দেওয়া হলো–

ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র দোয়া-তাবিজ

বিপদ উত্তরণের মন্ত্র :

১ পাপ তাপ হর কাশীতে বিশ্বেশ্বর
পীর পয়গম্বর
মুস্কিল আসান কর
কাঙালেরে দয়া কর
ওহে গুরু তুমি বিনে ভবে কেহ নাই।
হরি হর
ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর
মনস্কাম সিদ্ধ কর
বাবা ভোলানাথ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
রক্ষা কর আত্মার জীব।

২ তুলসী তুলসী
লতায় কৃষ্ণ
পাতায় কৃষ্ণ
মন্দিরেতে রাধা-কৃষ্ণ
তুলসী তুলসী গগন তুলসী
যখন তুলসী শিরে ধরি
দণ্ডের পাপ দণ্ডে হরি।

তথ্য দাতা : গোবিন্দ মণ্ডল, বয়স ৫০, পিতা: ভুবন মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়া, রসুনিয়া, উপজেলা- সিরাজদিখান।

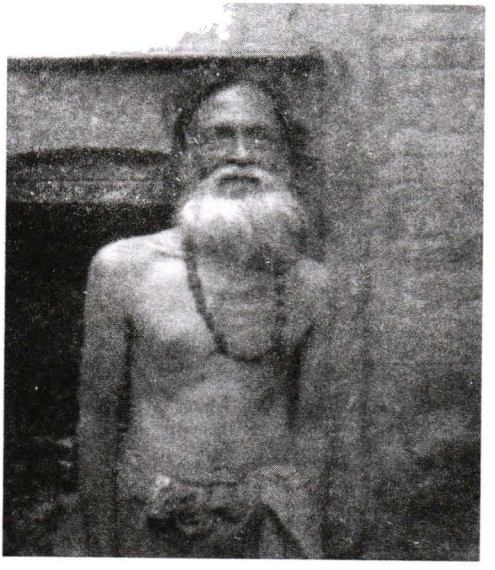

গোবিন্দ মণ্ডল

www.pathagar.com

ক্ষয় রোগ ও নানা রোগের দোয়া :

৩ বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
আদ্দিনালে আসে ধাতু
বিম্বনালে ক্ষয় ।
যেই নালে আসে ধাতু
সেই নালেই ক্ষয় ।
হাড্ডি কাঁচা মাংস কাঁচা, কাঁচা মাথার চুল
এক নালে ঝরে
সহস্র নালে ভরে ।
আমার এই দোয়া যদি লড়ে
দোহাই আল্লাহর ।
অষ্ট ধাতুর অষ্ট সোর
কোন ধাতুর কি কি নাম
আমাল শূল গামাল শূল
রুক্ত পূজাই শূল ।
হযরত আলী কয়
আমার এই দোয়ায় ছত্রিশ রোগ ব্যাধির ক্ষয় ।

শরীর বন্ধের দোয়া (বদ জ্বীন, দেও দানবের আছর হতে রক্ষা) :

কাগজে লিখে তাবিজে ভরে সঙ্গে রাখতে হবে

৪ ঘর বানলাম দুয়ার বানলাম
ঘর করলাম স্থির
(যার শরীরে তাবিজ বাঁধতে হবে তার নাম) শরীর বানলাম
শরীর করলাম স্থির ।
(যার শরীরে তাবিজ বাঁধতে হবে তার নাম) লগে যে বসত করে
তারে মারি বজরখের তীর
(যার শরীরে তাবিজ বাঁধতে হবে তার নাম) উপর যে নজর করে
তারেও মারি বজরখের তীর,
আমার এই কথা যদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়া ।
পার্বতীর পায়ে পড়ে
গোসাই গোসাই গোসাই দরদী ।

২৪ ঘন্টার জন্য শরীর বন্ধের দোয়া :

৫ আল্লা আমার দিকে চাও
আমারে যে খাইতে চায়
তারে তুমি খাও ।
গোসাই গোসাই গোসাই দরদী ।

অর্শ রোগের দোয়া :

৬ (এই দোয়া পড়ে জলের ঘটিতে
৩ বার ফুঁ দিয়ে পানি খরচ করতে হবে)

ফকির মতি মিয়া

www.pathagar.com

আদম আমার বাপ
ছবি আমার মা,
আমার বাপ যে
আমার এই রোগ সারে সে
গোসাই গোসাই গোসাই দরদী ।

তথ্য দাতা: ফকির মতি মিয়া, বয়স ৪৫,
গ্রাম: খরিয়া, মাছের ব্যবসা করেন ।
ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ডেলা ভাসান ।

ভূত ছাড়ানি মন্ত্র :

৭ ডাইনে কাচি, বামে কাচি
দাঁতের তলে খিচমিচি খাই
লোহার জামা গায়ে দিয়া
যেথায় খুশি হেথায় যাই ।
আম গাছে টিকটিকি
নিম গাছে যায়,
এমন ঝাড়া ঝাইর‍্যা দিলাম
ভূতে আর না পায় ।

ভূত প্রেতের মন্ত্র :

স্বর্ণকার নিদারুণ বন্ধ করি ভূত প্রেতের হাটা
যদি এই জ্ঞান নড়ে ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়া
ভূমিতে পড়ে
দোহাই দোহাই দোহাই ওস্তাদের ।

গলার কাঁটা ঝাড়ার মন্ত্র :

৮ প্যাঁচায় হাসে প্যাঁচি কান্দে
আতাইল্যা কাঁটা পাতাইল্যা কাটা
নাইম্যা যা দোহাই ওস্তাদের ।

চোর বন্ধের মন্ত্র :

৯ শিবের হিং বন্ধ করি চোর-ডাকাতের দিন
যদি এই জ্ঞান নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিইর‍্যা
ভূমিতে পরে
দোহাই দোহাই দোহাই ওস্তাদের ।

হাত-পা ভেঙ্গে গেলে বা ব্যাথা পেলে :

১০ আল বিষ তাল বিষ
টাউক্যা পুইর‍্যা গোয়ায় দিস ।
অসকা ধরা মস্কা ধরা

www.pathagar.com

বিলাইতে আগে ছড়া ছড়া
কুত্তায় আগে গু
দিলাম একটা ফুঁ।

তথ্য দাতা : সুবল সাধু, বয়স-৫০, গ্রাম-রসুনিয়া, থানা-সিরাজদিখান।

আধমাথা ধরার মন্ত্র :

১১ উঠিয়া বস সাধু গগনে
আমি যেন তরি তোমার দোয়ায়
আমি যা করি আমার এই কাজ
যেন সত্য হয়।
আর এই কিরা লাগে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিইড়্যা জমিনে পড়ে।

তথ্য দাতা: ফকির ছোবহান বেপারী, বয়স- ৬০, গ্রাম- চোরমর্দন, থানা: সিরাজদিখান। সংগ্রহ– হাজী আলী আকবর।

মাথার ব্যথা :

১২ উঠ উঠ উঠ ঠাকুর
লাল বরণ হৈয়া
উঠ উঠ উঠ ঠাকুর হলুদ বরণ হৈয়া।
নাগ জষ্টির মেয়ের বর
শির-সান্নিক, আধ মাথা
যাও আমার ভস্ম হৈয়া। (৩ বার বলে ফুঁ দিতে হবে)

অর্শ ও গেজ :

১৩ বরুণ বরুণ মনের দরুন
এক নালে ভরুন
৭০ নালে সরুন। (১ বার বলে ফু দিতে হবে)

শিশুর পেট খারাপ :

১৪ শিথানে কাঠি, পৈথানে কাঠি
মইধ্যে শুইলাম আমি
জগন্নাথ স্মরি
আমার এই বন্দনা ভাঙ্গিয়া
যে করিবে ঘা
হজরত আলীর মাথা খা
মহাদের মাথা খা।

রস বাত :

১৫ সমুদ্দুরে হিজল গাছা
(অমুক)এর হাতে ব্যথা
এইসব লক্ষণ
যাও রস বাত অক্ষণ।

www.pathagar.com

সান্নিক :

১৬ অন্ত রসা, দন্ত রসা
রসা গো রসা
এই কথা জাইন্যা যে না কয়
তার চৌদ্দ গুষ্টি নিলাম হইয়া যায়।

তথ্যদাতা : শহর ভানু, বয়স- ৬৫, স্বামী: মৃত বাবু খাঁ, গ্রাম- চোরমর্দন। সংগ্রহ– মো. শাহজাহান মিয়া ও হাজী আলী আকবর।

(খ) গ্রাম্য টোটকা চিকিৎসা

মুখে ঘা - সোহাগা ও ফিটকিরির খই মধু দ্বারা মিশিয়ে লাগালে ভাল হয়।

বাত রোগ - আকন্দের আঠা ও লবণ এক সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করলে আরাম হয়।

দাদ - লোহার কড়াইতে গন্ধক ও কেরোসিন একত্রে ঘষে লাগালে দাদ সারে।

কৃমি - আনারসের পাতার রস তিন দিন খেলে কৃমি মরে যায়।

সুতিকা ও হাঁপানি - টিকটিকির লেজের খসে যাওয়া অংশ কলায় পুরে খেলে এ রোগ সেরে যায়।

ফোঁড়া - পায়রার গরম টাটকা মলের প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফেটে যায়।

রক্তপড়া - কাটা জায়গায় দূর্বা ঘাস চিবিয়ে বেঁধে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে। অথবা গাদাফুলের পাতার রস দিলে রক্ত বন্ধ হবে।

আগুনে পোড়া - নারকেল তেল ও চুন মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ফোস্কা পড়ে না।

বমি - চিনির সরবতের মধ্যে কচি আমের পাতা বাটা মিশিয়ে পান করলে বমি কমে যায়।

আঁচিল - হলুদ পোড়া ও চুন একত্র মিশিয়ে প্রলেপ দিলে আঁচিল খসে যায়।

টাক - পুরাতন সজনে গাছের ছাল ২/৩ দিন টাকে ঘসলে ২/৩ দিনে চুল গজাবে।

প্রসব - প্রসূতিকে তুলসী পাতার রস খাওয়ালে শীঘ্র প্রসব হবে।

কোষ্ঠবদ্ধ - ২/৩ টি হরতকী বেটে গরম জলে মিশিয়ে পান করলে কোষ্ঠ পরিস্কার হয়।

পেট ফাঁপা - আদা ও লবণ একত্র চিবিয়ে খেলে পেট ফাঁপা দূর হয়।

মূর্ছা সুঁইয়ের আগায় গোল মরিচ ঢুকিয়ে প্রদীপের আগুনের ধোয়া নাকে দিলে মূর্ছা ভেঙ্গে যায়।

নাল লাগা - বেগুনের বিচি ফেলে দিয়ে খোলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখলে ৩/৪ দিনে নাল ভাল হয়।

প্রসূতির বুকে দুধ বৃদ্ধি - কাইক্যা মাছ লাউ দিয়ে রান্না করে খেলে প্রসূতির বুকের দুধ বাড়ে।

জলাতঙ্ক - হলুদ বাটা ও বিড়ালের মল একত্র মিশিয়ে লাগালে জলাতঙ্ক হয় না।

সাপে কাটা - বেলের শিকড়ের ছাল বেটে খাওয়াতে হবে ও দংশিত স্থানে লাগাতে হবে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

জন মানুষের জ্ঞান ও চিন্তনের অনুশীলন হয় ধাঁধাঁর মাধ্যমে। ধাঁধাঁয় প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যও থাকে। উপমা, রূপক ও প্রতীকের সাহায্য নিয়ে এই রহস্য তৈরি করা হয়। ফলে মূল বস্তু থেকে যায় আড়ালে, উত্তর সন্ধানকারী এই মূল বস্তুর পরিচয় দিবেন। প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মাঝে মনস্তাত্ত্বিক খেলা ও চিন্তনের অনুশীলন হয়ে থাকে ধাঁধাঁর সহায়তায়।

সংগৃহীত ধাঁধা

কালা কালা ভুইড়া কালা
লেঞ্জায় ধইর‍্যা ফিক্কা ফেলা।

উত্তর : ঝাঁকি জাল/মুঠো জাল।

লাল মিয়া হাটে যায়, নিত্য নতুন থাপ্পর খায়।
উত্তর : মাটির হাড়ি পাতিল।

দিলে ফাঁক করে, না দিলে রাগ করে।
উত্তর : ভিক্ষা।

এক গোত্রের গোত্র ধরি
মরলে অশৌচ পালি,
ভাইয়ের মতো স্নেহ করি
বইন বিয়া দিলে দিতেও পারি।
উত্তর : দেবর-বউদির সম্পর্ক

জলেতে জন্ম যার
জলেতে বাস
মা ছুঁইলে ছেলের মরণ
আহা কী সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ

তিন অক্ষরের নাম যার জলে বাস করে
মইধ্যের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে ওড়ে।
উত্তর : চিতল

চিকন আলী হাটে যায়
প্রতি হাটে চিমটি খায়।
উত্তর : লাউ
কাটলে বাঁচে না কাটলে মরে
এই ফল কোন গাছে ধরে?
উত্তর : সন্তান

www.pathagar.com

গাছটা গজারি
পাতাটা ইলশা
ধরে কামরাঙা
পরে কালিজিরা।
উত্তর : তিল

একটু খানি গাছে টিডি পইখ নাচে।
উত্তর : মরিচ গাছ

এক মহিলা আর এক মহিলার কাছে গিয়ে একটি জিনিস চেয়ে বললো- আমার আছে তাই তোমার কাছে এই জিনিসটা চাইলাম দিবে?
ঐ মহিলা বললো, হ্যাঁ দিব, আমার নাই, সেজন্যে দিলাম। থাকলে দিতাম না। এখন প্রশ্ন হলো জিনিসটা কী?
উত্তর : মাথায় দেয়ার সিঁদুর। ঐ মহিলার স্বামী নেই তাই মাথায় সিঁদুর দিতে হয় না। সেজন্য তার সিঁদুর দিয়ে দিয়েছে। আর যিনি সিঁদুর চাইতে গেছেন তার স্বামী আছে। তার মাথায় সিঁদুর দিতে হয়। এজন্য তিনি সিঁদুর চাইতে গেছেন।

লাঠি ভনভন লাঠি ভনভন, লাঠি নিলো চোরে
ঢাকার শহর আগুন লাগছে কে নিভাইতে পারে?
উত্তর : সূর্য। সূর্য উঠলে তা কেউ বন্ধ করতে পারে না।

মামাগো বাড়ি গেছিলাম রক্ত দিয়া ভাত খাইছিলাম।
উত্তর : লাল শাক দিয়া ভাত খাওয়া।

দুই হাত দিয়া দুই পাও চেগাইয়া
মাঝখান দিয়া দিলাম ভইরা,
মারলাম জাতি, আরাম লাগে।
যদি হয় ভণ্ড দশ টাকা দিমু দণ্ড।
উত্তর : সুপারি কাটার যন্ত্র ।

দুই মহিলা এক রকমের শাড়ি পরে বেড়াতে যাচ্ছে। তাদের দেখে অন্য এক মহিলা বললো, আপনাদের এই শাড়ির দাম কত?
তখন একজন বললো, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক যা শাড়ির দাম তা।
উত্তর : দুই সতীন। অর্থাৎ শাড়ির দাম ২০৩।

কলিকাতায় আগুন লাগছে, কাঠপট্টিতে খবর হইছে, পানির তলা দিয়া ধুয়া বাইর হইছে।
উত্তর : হুক্কায় তামাক খাওয়া।

বিশ্লেষণ : কলিকাতা বলতে হুক্কার কলকে। যাতে আগুন দিয়ে তামাক ধরাতে হয়। কাঠপট্টি বলতে হুক্কার কাঠের নলচে। হুক্কার খোলের মধ্যে পানি ভরা থাকে। তার মধ্যে টান দিলে কাঠের নলচের থেকে ধুয়া পানির ভিতর দিয়ে তা মুখে আসে।

www.pathagar.com

বাঘ নয়, ভালুক নয়, ঘরে ঢুইক্কা যায়
ময়ূরের মতো পেখম ধরে মানুষ ধইয়া খায় ।
উত্তর : মশা

উজি মুজি জঙ্গলে নিয়া গুঁজি ।
উত্তর : মাছ ধরার চাঁই ।

খাইলে ফুরায় না, কাটলে কাটে না ।
উত্তর : পানি

শুইলে দিতে হবে, না দিলে ক্ষতি হবে ।
উত্তর : দরজা ।

ইল শুকাইলো বিল শুকাইলো চাকার তলে পানি রইলো ।
উত্তর : শামুক ।

ইল শুকাইলো বিল শুকাইলো, গাছের আগায় পানি রইলো ।
উত্তর : ডাব ।

ইট্টু খানি পুকুরে বসে বগে আদার খায়, পানিটুকু শুকাইয়া গেলে বগটা মইরা যায় ।
উত্তরঃ কুপি ।

রাজার বাড়ির গাই, এক বিয়ান দিলে নাই ।
উত্তর : কলাগাছ ।

কালা কৃষ্ণ জলে ভাসে, হাড্ডি নাই তার মাংস আছে ।
উত্তর : জোঁক ।

ছয় পাও অরুণা, ঘাস খায় গরু না, উইরা যায় পাখি না ।
উত্তরঃ জিনিসটা হলো ফড়িং ।

এক থাল সুপারি, গুনতে পারে কোন বেপারী ।
উত্তর : আকাশের তারা

তুমি থাক ডালে, আমি থাকি খালে,
তোমার আমার দেখা হবে মরণের কালে ।
উত্তর : মরিচের সাথে মাছের দেখা হবে ।
ভাঙ্গা ঘরে ফকির নাচে, না করলে আরো নাচে ।
উত্তর : জিহ্বা ।

এক হাত গাছটা ফল ধরে পাঁচটা ।
উত্তর : হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ।

দিবার কালে কষা কষি, ভিতরে গেলে খুশি খুশি ।
উত্তর : হাতের চুড়ি ।

বইসা আছি শালের উপর, সত্য কথা রয় না, মিথ্যা যদি বইল্লা থাকি, তা যেন সয় না ।
উত্তরঃ কাঠের নৌকায় শাল কাঠের চারাট ।

www.pathagar.com

এক হাতে ধরে, ছেব দিয়া ভরে
জুয়ানে পারে একবার, বুড়ায় বার বার।
উত্তর : সুঁইয়ে সুতা ঢুকানো।

ঠেইল্লা দিলে মেইল্লা যায়
ভিতরে গেলে আরাম পায়
উত্তর : ছাতা।

এপারে দুইটি, ওপারে দুইটি
দুইটি করে পিটপিটি।
উত্তর : চোখের পাতা।

আমরা এমন জিনিস খুজি
যা খুইজা পাইলে নেই না।
উত্তর : একজন ব্যক্তি যাকে রাস্তা দেখানোর জন্য খোঁজা হয় কিন্তু যখন রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায় তখন ঐ ব্যক্তিকে সাথে নেওয়া হয় না।

বলেন দেখি কোন বেল খাওয়া যায় না?
উত্তর : মার্বেল।

দাদায় দেয় একবার,
বৌদি দেয় বারবার।
উত্তর : সিঁদুর।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদ প্রচলিত। মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাজাত দর্শন প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিফলিত। প্রাত্যহিক জীবনে এর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট। পেশাগত বা গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার এ অঞ্চলে রয়েছে। এই প্রবাদসমূহে জীবনঘনিষ্ঠ সত্যের পাশাপাশি পরিবেশনকারীর রসবোধও লভ্য।

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন

১. সাপ স্বপন পুনা
যে দেইখ্যা না কয়
সে একজনা।
ব্যাখ্যা : সাপ, মাছের পুনা এবং স্বপ্ন এগুলো দেখে কাউকে বলতে হয় না।

২. যদি না করে বৈকালি
সিংহ হয় শৃগালি।
ব্যাখ্যা : রাতের খাবার না খেলে সিংহেরও তেজ কমে যায়। সে শৃগালে পরিণত হয়।

৩. আগের হাল যেদিক যায়
পিছের হালও সেদিক যায়।
ব্যাখ্যা : আগের হালটি অর্থাৎ অগ্রজ যেদিকে বা যেখানে যাবে তার পিছনেরাও অর্থাৎ অনুজরাও সেদিকে যাবে।

৪. আক্কলে খাইছি মাটি
বাপে পুতে কামলা খাটি।
ব্যাখ্যাঃ ভুল করে ভোগান্তি।

৫. সইয়া থাকলে
বইয়া দেখন যায়।
ব্যাখ্যাঃ সহ্য করলে অনেক কিছু দেখা যায়।

৬. বুদ্ধি থাকলে বাপের বিত্ত পরে খায় না।
ব্যাখ্যাঃ বুদ্ধি করে চললে নিজের সম্পদ রক্ষা করা যায়।

৭. অতি বড়ো হইয়ো না ঝড়ে ভাইঙা পড়ব
অতি ছোটো হইয়ো না ছাগলে মুইর‍্যা খাইব।
ব্যাখ্যাঃ বেশি বড়ো বা বেশি ছোটো কোনোটিই হওয়া উচিত না। সবক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ রক্ষা করে চলা প্রয়োজন।

৮. শীতে শীত কাটা
গরমে ঘামাচি
কোন কালে আছিলা গো
তুমি রূপসী।
ব্যাখ্যা : অজুহাত দিয়ে প্রকৃত অবস্থান লুকিয়ে রাখা যায় না।

www.pathagar.com

৯. বিষবৃক্ষ লাগায় যে
ফল ভোগ করে হে।
ব্যাখ্যা: মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

১০. যেমন গুড় তেমন মিষ্টি।
ব্যাখ্যা: কাজ ভাল করলে তার ফলও ভাল হয়।

১১. খাইতে ভাত পায় না
কুত্তা পালে বরগা।
ব্যাখ্যা: নিজেদের খাওয়া জোটে না তার উপরে আবার অতি সৌখিনতা।

১২. দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা
ঘনায়ে বসে কাছে
কথা দিয়া কথা নিব
পরানে মারব শ্যাষে।
ব্যাখ্যা: যে মানুষ অতি মধুর ব্যবহার করে, সে কথা নেয়া-দেয়া করে পরে অনিষ্টের কারণ হয়।

১৩. খাইচলত যায় না ধুইলে
ইজ্জত যায় না মইলে।
ব্যাখ্যা: যাই হোক না কেন মানুষের স্বভাব কখনো পরিবর্তন হয় না।

১৪. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ
পাকলে করে ঠাস ঠাস।
ব্যাখ্যা: ছোটো অবস্থায় ঠিক না করলে তা পরবর্তীকালে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

১৫. থাকতে রাইখ্যা খাও
বেইল থাকতে হাইট্টা যাও।
ব্যাখ্যা: সময়মত সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

১৬. যতদিন থাকে মার দুধ
ততদিন থাকে মার পুত।
ব্যাখ্যা: মায়ের দুধ খাওয়ার প্রয়োজন শেষ হলে ছেলের সাথে মায়ের দূরত্ব তৈরি হয়।

১৭. বইয়া খাইলে রাজার গোলাও ফুরায়।
ব্যাখ্যা: বেহিসেবি হয়ে চললে যত সম্পদই থাকুক না কেন একদিন তা শেষ হবেই।

১৮. যারে না দেখছি সে বড় সুন্দরী
যার রান্ধন না খাইছি
সে বড় রান্ধুনি।
ব্যাখ্যা: যা পরীক্ষিত না তা বিশ্বাস করা ঠিক না।

১৯. বাইর বাড়িতে গিয়া দেখি
সম্ভারের কি ঠাঁট
ভিতর বাড়িত গিয়া দেখি মূলাবাটি ভাত।
ব্যাখ্যা: বাইরে থেকে সবসময় প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না।

www.pathagar.com

২০. আমে দুধে মিইল্যা যায়
ছিটালের আটি ছিটালে যায়।
ব্যাখ্যা: যার যেখানে অবস্থান সেখানে সে যাবেই।

২১. খড়কুটে আগুন দিয়া পেত্নী থাকে আলগোছ হইয়া।
ব্যাখ্যা: ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে ভাল মানুষের মত ব্যবহার করা।

২২. রূপের আদর দুই দিন
গুণের আদর চিরদিন।
ব্যাখ্যা: রূপ ক্ষণস্থায়ী গুণ চিরস্থায়ী।

২৩. খাই পোলার গলা বড়।
ব্যাখ্যা: যে বেশি পায় সে বেশি চায়।

২৪. বাড়ির গরু আতাইলের ঘাস খায় না।
ব্যাখ্যা: যার যা আছে সে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না।

২৫. আদিখ্লা নাপতের ঝি
পান্তা ভাতে ঢালে ঘি।
ব্যাখ্যা: যে জীবনে যা পায় নি সে তার মর্যাদা বোঝে না।

২৬. কী দারুণ বর্ষাকাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল,
শোন রে ছাগল তরে কই
দিন গতিকে সইয়্যা রই।
ব্যাখ্যা: দুর্যোগের সময় অনেক কিছু সহ্য করে নিতে হয়।

২৭. কাক কোকিলও কষ্ঠী
শিয়ালও চন্দ্রমুখী।
যতই ক্যান টিপ টিপাও
বুইজতাছি কলির বাও।
ব্যাখ্যা: যতই ছদ্মবেশ ধরা হোক না কেন, একসময় ঠিক প্রকৃত উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়।

২৮. বেহাইয়ারে মারে পিছা
বেহাইয়া কয় হাছা মিছা।
ব্যাখ্যা : যার লজ্জা নেই তাকে হাজার বার লজ্জা দিলেও শিক্ষা হয় না।

২৯. শিখেছো কোথায়?
ঠেকেছি যেথায়।
ব্যাখ্যা: মানুষ যেখানে ঠেকে সেখান থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩০. চোরের ডরে বউ লেংটা করে রাখা।
ব্যাখ্যা: খারাপ লোকদের ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা।

৩১. চোরে চোরে আলি,
এক চোরে বিয়া করে আরেক চোরের হালি।
ব্যাখ্যা: খারাপ লোকদের সাথে খারাপ লোকদের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

৩২. ছল্লি বল্লি করলি কি মরলি।
ব্যাখ্যা: মানুষ মানুষের সাথে কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিলে সে বিপদে পড়বে।

৩৩. যৌবন কালে সবই ভালো, কিবা সুন্দর, কীবা কালো।
ব্যাখ্যা: তরুণ বয়সে নতুন চোখে যা দেখে সবই ভালো লাগে।

৩৪. জিনিস যায় যার, ঈমান যায় তার।
ব্যাখ্যা: কোন বস্তু হারিয়ে গেলে নিজের আস্থা বেশি দিন টিকে থাকে না।

৩৫. যার লগে যার ভাব,
তার পাছা দেখলেও লাভ।
ব্যাখ্যা: সম্পর্ক ভাল থাকলে তার সব কিছুই ভাল লাগে।

৩৬. যেই গাছ দেখতে পাই,
সোনালতার গোড়া নাই।
ব্যাখ্যা: কোনো কিছুর মূল বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া না গেলে এমন উক্তি করা হয়।

৩৭. যেই দেশের যেই ভাও,
উবুত হইয়া নাও বাও।
ব্যাখ্যা: এক এক সমাজে এক এক নিয়ম থাকে। সে নিয়ম মেনে কাজ করাই উচিত।

৩৮. যেমুনডার ঘরে হেমুনডা,
আগৈলডার ঘরে বউট্টাডা।
ব্যাখ্যা: বাবা-মা স্বাস্থ্যবান হলে বাচ্চা-কাচ্চাও স্বাস্থ্যবান হয়।

৩৯. যেমন গাছ তেমন গোটা।
যেমন বাপ তেমন বেটা।
ব্যাখ্যা: বীজের উপর নির্ভর করে উৎপাদন। স্বাস্থ্যবানের ঘরেই স্বাস্থ্যবান সন্তান হয়।

৪০. জুইতের নাও হুগনা দিয়া বায়।
ব্যাখ্যা: সমঝোতা থাকলে কঠিন কাজও করা যায় যে কোনো অবস্থায়।

৪১. যেমন মা তেমন ঝি,
তেমুন তার নাতিনটি।
ব্যাখ্যা: বংশ পরম্পরায় মানুষের স্বভাব চরিত্রের ধারাবাহিকতা থাকে।

৪২. যেই না কুদ্দুস,
তার লিগা আবার দুধ রোজ।
ব্যাখ্যা: সাধারণ মানুষের জন্যেও ভালো কোনো ব্যবস্থা করা।

৪৩. যার কান্দন হেয় কান্দে না,
কান্দে নিমাই ঢালী।
ব্যাখ্যা: একজনের সমস্যা নিয়া অন্যে যখন মাতব্বরি করে কিন্তু যার সমস্যা সে কোনো মাথা ঘামায় না।

৪৪. যেই লেংটি,
হেই পুটকি।
ব্যাখ্যা: আর্থিক অবস্থা খারাপ বুঝাতে বলা হয়।

www.pathagar.com

৪৫. তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।
ব্যাখ্যা: মাপা মাপা জিনিস দিয়ে সব সময় সব কাজ হয় না। প্রয়োজনে অনেক বেশি খরচ করতে হয়।

৪৬. তালিবালি-গৃহস্থালি।
ব্যাখ্যা: জোড়া তালি দিয়ে সংসার পরিচালনা করা।

৪৭. দাড়ি আছে ঈমান নাই,
বুঝে দেখ সোনা ভাই।
ব্যাখ্যা: লেবাজে বুঝা যাবে না লোকটা ধার্মিক কিনা।

৪৮. ডাইল দিয়া ভাত খামু বিলাইরে চেট দেখামু।
ব্যাখ্যা: অন্যে যেন কোনো সুযোগ-সুবিধা না পায় সেজন্য নিজের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা।

৪৯. ঢুলি ঢোল পিটায় পূজার জানে কি?
ব্যাখ্যা: কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য লোকেরা আয়োজনের খরচ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানে না।

৫০. ডেকরা গরুতে বাঘ চিনে না।
ব্যাখ্যা: যৌবন কালে কোনো কিছুতে পরোয়া না করা।

৫১. নায়ে যাবি হ, তরে যাবি হ,
ব্যাখ্যা: যাদের নিজস্ব কোনো মতামত নেই সে যা বলে তাই করে।

৫২. নাইয়ার এক নাও, নি নাইয়ার শতেক নাও।
ব্যাখ্যা: যার যে জিনিস আছে তা নির্দিষ্ট কিন্তু যার নেই তা নানা প্রকার ও নানা ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৫৩. নতুন নতুন দিন চারি, চিতই পিঠা খান চারি।
ব্যাখ্যা: প্রথম প্রথম নতুন আত্মীয়দের আপ্যায়ন করা হয়। তারপর আর সেই কদর বেশি দিন থাকে না।

৫৪. দাদার নামে গাধা, বাবার নামে আধা, নিজের নামে শাহাজাদা।
ব্যাখ্যা: নিজের পরিচয়ে বড় হওয়াটাই সবার কাছে কাম্য বলে মনে হয়।

৫৫. বোয়ালের আণ্ডা বোয়ালে ভাঙ্গে।
ব্যাখ্যা: নিজেদের গোপন কথা যারা নিজেরা প্রকাশ করে দেয়।

৫৬. বাড়ির গরু কোলার ঘাস খায় না।
ব্যাখ্যা: পরিচিত লোক অনেক সময় নিজেদের জিনিস পছন্দ করে না।

৫৭. মাগনা গরু বামনে খায়।
ব্যাখ্যা: বিনা পয়সায় পাওয়া গেলে মানুষ অনেক কিছু অবৈধ হলেও বৈধ হিসেবে গ্রহণ করে।

৫৮. পরের কাম হরে হরে।
ব্যাখ্যা: অন্যের কাজ-কামে গুরুত্ব না দেওয়া। অথবা অন্যের কাজ হালকা ভাবে করা।

www.pathagar.com

৫৯. পরের ক্ষেতের হাল উচাইয়া ধর,
নিজের ক্ষেতের হাল জাইত্যা ধর।
ব্যাখ্যা: পরের কাজ হালকা ভাবে করা আর নিজের কাজ ভালো করে সমাধা করা।

৬০. পাইলাম হালে, দিলাম গালে,
পাপপূণ্য নাই কোনো কালে।
ব্যাখ্যা: বাছবিচার-হীন খাওয়া দাওয়া।

৬১. পেটে নাই ভাত,
লাংগের উৎপাত।
ব্যাখ্যা: গরিবের দেহের স্বাদ সবাই নিতে চায় কিন্তু সাহায্য কেউ করতে চায় না।

৬২. পান খেয়ে গান গাও, চুন জর্দায় মরতে যাও।
ব্যাখ্যা: সব কিছুরই একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

৬৩. পারে না বাল ফালাইতে উইঠা থাকে রাইত পোয়াইতে।
ব্যাখ্যা: অকাজের লোকেরা আগে এসেও উল্টা কাজ করে।

৬৪. বাপ-দাদার নাম নাই, টেংকুরাইল্লার নাতি।
ব্যাখ্যা: যারা নিজেকে বড় দাবি করে থাকে অথচ বংশের পরিচয় নেই।

৬৫. ভাত পায় না চা খায়,
ঘোড়া দিয়া হাগদে যায়।
ব্যাখ্যা: আলগা ফুটানি যারা দেখায় অথবা যার আর্থিক খরচের সামর্থ্য নেই সে যদি অতিরিক্ত খরচের ভাব দেখায়।

৬৬. মার হোগায় বাল নাই,
পোলার মুখে চাপদাড়ি।
ব্যাখ্যা: পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য যাদের নেই তারা যদি ঐতিহ্য দেখায় হয় তাদের সম্পর্কে এসব বলা হয়।

৬৭. মাল আছে ফাল আছে,
মাল নাই, ফাল নাই।
ব্যাখ্যা: টাকা পেলে অনেকেই কাজ করে। আবার টাকা না পেলে কাজ করে না।

৬৮. পিরিতের পেত্নীও ভালো।
ব্যাখ্যা: যাকে ভালোবাসা যায় তার সৌন্দর্য মূল বিষয় নয়।

৬৯. মাজা উঁচা বুক টান, মা দেইখ্যা ঝি আন।
ব্যাখ্যা: বিয়ে সাদীর ব্যাপারে মেয়ের মায়ের শারীরিক গঠনের দিকে বেশি খেয়াল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৭০. বান্দার শৈল গান্দা।
ব্যাখ্যা: মানুষের স্বাস্থ্য কখন খারাপ হবে তা কেউ বলতে পারে না।

৭১. বিপদে পড়লে বিলাই মান্দার গাছে উঠে।
ব্যাখ্যা: বিপদে পড়লে অনেক সময় অনেক অসহনীয় জিনিস সহ্য করতে হয়।

www.pathagar.com

৭২. লেংরা গরু লড়াইর যম।
ব্যাখ্যা: অঙ্গ হানি লোকের চোটপাট বেশি থাকে।

৭৩. পইরা রইছে চেটের বাল,
ধরতে গেলে কোম্পানির মাল।
ব্যাখ্যা: পড়ে থাকলে কোনো কিছুর মূল্য নেই কিন্তু সেটা ধরতে গেলে বিপদ।

৭৪. সকালের ইস্টি ইস্টি না,
সকালের বৃষ্টি বৃষ্টি না।
ব্যাখ্যা: সকাল বেলায় অবস্থা দেখে সারাদিনের অবস্থা বলা যায় না। বিকেল বেলারটা অনেক সময় নিশ্চিত করে বলা যায়।

৭৫. লাং-খাটানি সইরা পড়ে,
দুয়ার ধরনি পইরা মরে।
ব্যাখ্যা: আসল অপরাধী সরে যায়, সহযোগী ধরা পড়ে।

৭৬. হাতে থাকে লোয়া,
হয়তানে মারে গোয়া।
ব্যাখ্যা: হাতে কোনো যন্ত্রপাতি থাকলে তার দ্বারা ক্ষতি হবেই।

৭৭. হাদা কাঁঠাল খায় না,
বোতা লইয়া টানা টানি।
ব্যাখ্যা: স্বাভাবিকভাবে কিছু জিনিস পেলে নেয় না কিন্তু তা শেষ হয়ে গেলে পাওয়ার জন্য যে আকুতি।

৭৮. হোয়াইয়া দিলে কইন্নাইতে পারে।
ব্যাখ্যা: অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট কাজ যে-কেউ করতে পারে।

৭৯. আ হোগায় ফিনছে কাপড়,
হোগা করে ফাঁপর ফাঁপর।
ব্যাখ্যা: যে যেটার উপযুক্ত না সে সেটা করলে মানুষ এমন উক্তি করে থাকে।

৮০. আহারা নাপিতের ধামা ভরা খুর।
ব্যাখ্যা: অদক্ষ লোকদের যন্ত্রপাতি ও ঠাঁটবাট বেশি থাকে।

৮১. আম তলায় বিয়াইছে গাই,
হেই রিস্তায় খালাত ভাই।
ব্যাখ্যা: সাধারণ সূত্র খুঁজে সম্পর্ক তৈরি করা।

৮২. আইজ বুঝবি না বুঝবি কাইল,
গোয়া থাবরাইয়া পারবি গাইল।
ব্যাখ্যা: সময় মতো সব কিছু বুঝে নিতে না পারলে সময় চলে গেলে শুধু হম্বিতম্বি করা সার হয়। এতে কোন কাজ হয় না।

৮৩. আহাম্মকের গু
নানান যায়গায় লাগে।
ব্যাখ্যা: বেকুবেরা নানা প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

৮৪. এক কালে হরি,
এক কালে বউ।
ব্যাখ্যা: ক্ষমতা কারো চিরদিন থাকে না।

৮৫. এক হাতাইলে জমিচাষ করলে
বুঝা যায় কে কেমন লোক।
ব্যাখ্যা: চরিত্র বিচার করতে হলে নিরপেক্ষতা আছে কি-না দেখতে হয়।

৮৬. এই দোষ না হেই দোষ,
মাগি তুই চিত হইয়া হোস।
ব্যাখ্যা: যারে ভালো জানে না তারে যে কোনো এক অজুহাতে দোষী নির্বাচিত করা।

৮৭. কৃষ্ণের বেলায় লীলা খেলা, আমরা করলে পাপ।
ব্যাখ্যা: ক্ষমতাশীল বা নেতৃস্থানীয় লোকেরা অবৈধ কাজ করলে কোনো বিচার হয় না বা প্রশ্ন তোলে না, সে কাজ সাধারণ লোকে করলে বিচার হয়।

৮৮. কর্তার পাদে গন্ধ নাই,
ব্যাখ্যা: নেতার দোষ ধরা যায় না।

৮৯. কিবা করছে জাতে সবই করছে ভাতে।
ব্যাখ্যা: অভাব থাকলে জাতে কাজ হয় না।

৯০. খুঁটির জোরে মেড়া কোদে।
ব্যাখ্যা: নিজের নয়, অন্যের শক্তির জোরে যারা শক্তি প্রদর্শন করে।

৯১. খাট যত নটা তত।
ব্যাখ্যা: স্বাভাবিক আকারের চেয়ে ছোট হলে তারা বেশি ঝামেলা করে।

৯২. খেতের কোনা বাণিজ্যের দোনা।
ব্যাখ্যা: খেতের এক কোনো যা লাভ হবে বাণিজ্যে ডবল লাভ করলে সে লাভ হবে।

৯৩. গোয়ায় নাই লম (লোম) পুঁথি পড়নের জম।
ব্যাখ্যা: বিত্তহীন লোকের সাহিত্যচর্চার বিষয়ে অবজ্ঞা করে এ উক্তি করা হয়।

৯৪. গাছেরটা খায় তলারটা কুড়ায়।
ব্যাখ্যা: উভয় দিক থেকে যারা সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

৯৫. ঘোড়া চিনে ময়দানে, মানুষ চিনে নিদানে।
ব্যাখ্যা: বিপদে পড়লে বোঝা যায় কে কেমন মানুষ।

৯৬. ঘর পুড়ছে পুড়ছে,
টিকটিকি তো মরছে।
ব্যাখ্যা: নিজের ক্ষতি হলেও যদি যাকে পছন্দ করি না তার ক্ষতি হয় তা মেনে নেয়া।

৯৭. গরজের পোলা আঠার মাসে বিয়ায়।
ব্যাখ্যা: যে জিনিস সহজে পেতে চায় তা সহজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

৯৮. একে চুরি তার উপর সিনাজুরি।
ব্যাখ্যা: যারা চুরি করে তারা আবার বাহাদুরিও দেখাতে চায়।

৯৯. ভাইয়ের শত্রু ভাই, মাছের শত্রু নাই।
ব্যাখ্যা: কোনো মানুষের শত্রু দুরবর্তী কেউ নয় এমন অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

১০০. যার ঝি হের জামাই, হুদা মাইনষের কাম কামাই।
ব্যাখ্যা: অনেক সময় মানুষ নিজের কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে অন্যের জিনিস বা বিষয় নিয়ে মাতামাতি করে।

১০১. খইলা উজায়, পুটি উজায়, লগে দারকানি উজায়।
ব্যাখ্যা: পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা।

১০২. মোল্লার কোনো খবর নাই, শিন্নি নিয়া কুতকুতাই।
ব্যাখ্যা: আসল জিনিস বাদ দিয়ে সামান্য জিনিষ নিয়ে মাতামাতি করা।

১০৩. রাজার বাড়ির তাল খাইবা চিরকাল।
ব্যাখ্যা: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধন সম্পদ পাওয়া।

১০৪. দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ
কমে না বাড়ে বারো মাস।
ব্যাখ্যা : নারিকেল যত দান করা যাবে তত বাড়বে আর বাঁশ যত না কাটা যাবে ততই বাড়বে।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সঙ্গে শুভাশুভবোধের সংযুক্তি আছে। জনগণের লোকবিশ্বাস নির্মিত হয় মঙ্গল তৈরির মাধ্যমে। আর লোকসংস্কার হলো সেইসব পালনীয় বিষয় যা জনগণ কল্যাণ সাধনায় মেনে চলে। লোকবিশ্বাস ক্রিয়া করে মানুষের মস্তিষ্কে, এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানব আপনার ভাবনা সৃজন করে। কিন্তু লোকসংস্কার যুক্ত মানবজীবনের ব্যবহারিক অংশে যেখানে সে তার আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১. ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে।
২. দক্ষিণ দিকে (সমুদ্রের দিকে) মুখ করে গরু বাঁধতে নেই।
৩. যাত্রা কালে 'চুন' না বলে 'সিবইথ' বলতে হয়।
৪. রাত্রে সুঁই, কল্কে, হলুদ বিক্রি নিষেধ।
৫. কলা বা পিঠা খেয়ে যাত্রা করতে নাই। পরীক্ষার দিনে ডিম খেতে নেই।
৬. রাত্রে এক ডাকে উত্তর দিতে নেই।
৭. মাগুর মাছের মাথা পুরুষে খেলে বউ মরে।
৮. বুকে ভাত ঠেকলে বলে - কে যেন নাম নিয়েছে। তালুতে ভাত উঠলে বলে - কে যেন নাম নিয়েছে।
৯. ভেদা মাছ পুরুষে খেলে ল্যাদা হয়।
১০. হলুদ পাখি (কুটুম) গৃহস্থের গাছে ডাকলে কুটুম্ব আসে।
১১. গরু বা ছাগলের দড়ি ডেইয়া (ডিঙাইয়া) যায় না।
১২. ঘাড় ব্যথা হলে বালিশ রৌদ্রে দেয়।
১৩. বাচ্চাদের খাওয়ানোর পর মুখে তেল মাখতে হয়, নইলে ভূতে ধরে।
১৪. বাড়ির সীমানার ভেতরে লিচু গাছ লাগাতে নেই।
১৫. নতুন ডুলা কিনলে মাছও কিনতে হয়।
১৬. স্ত্রীর বাম পাশে শুইতে নাই।
১৭. পোয়াতি দক্ষিণ দিকে মুখ করে সন্তানকে দুধ দেয় না।
১৮. এক ডুব দিতে নেই।
১৯. এক বাড়ির আগুন অন্য বাড়ি দিতে নেই।
২০. বাড়িতে পেঁচায় ডাকলে অমঙ্গল।
২১. মেয়েদের দুপ দাপ করে হাঁটতে নেই।
২২. চাকুম চুকুম শব্দ করে খেতে নেই।
২৩. ভাগ্নে মারলে হাত কাঁপে।
২৪. এক বারা ভাত খেতে নেই- জলে পড়ে।
২৫. 'সাইদ' বা 'বনি' না করে দোকানিরা বাকি দেয় না।
২৬. গরু বা নৌকা বেচে দড়ি দিতে হয় না।

www.pathagar.com

২৭. চাউলের অভাব হলে না বলতে নেই - বলতে হয় বাড়ন্ত।
২৮. অবিবাহিতা মেয়েরা গোপনে অন্যের চুলা ভেঙ্গে দিলে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।
২৯. বরজের পান চুরি করলে কুষ্ঠ হয়।
৩০. যাত্রা কালে পেছন থেকে ডাকতে নেই।
৩১. মেয়েদের জোড়কলা খেতে নেই - যমজ বাচ্চা হয়।
৩২. মাথায় মাথায় ঠোকা লাগলে পুনরায় ঠোকা দিতে হয়।
৩৩. দুধে লবণ মেশাতে নেই।
৩৪. সরস্বতী পূজার দিন ইলিশ মাছ ও বেগুন আনতে হয়।
৩৫. সাপের পা দেখলে রাজা হয়।
৩৬. নৌকার সামনে দিয়ে সাপ গেলে গলুইতে জল দিতে হয়।
৩৭. কেহ কাহারও গায়ে ঘুমিয়ে পড়লে অমঙ্গল হয়।
৩৮. পৌষ মাসে মুলা খায় না।
৩৯. দুঃস্বপ্ন দেখলে গাছের কাছে বলতে হয়।
৪০. যাত্রাকালে হাঁচি দিলে অমঙ্গল।
৪১. যাত্রাকালে শিয়াল দেখলে মঙ্গল হয়।
৪২. পোয়াতি মেয়েরা কিছু চাইলে দিতে হয়। না দিলে চোখে মেউয়া হয়।
৪৩. সন্ধ্যার সময় মেয়েরা ঘরের চান্দরে/ছন্‌হায় (সানসেট) চুল ছেড়ে দাঁড়াইলে ভূতে/জিনপরী/পেত্নীতে ধরে।
৪৪. রোববার বাঁশ ও তিল কাটা নিষেধ।
৪৫. সকাল বেলা বাড়িতে কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়।
৪৬. চন্দ্র গ্রহণের সময় পোয়াতিরা কিছু খেলে সন্তান রাহু হয়। কিছু কাটলে হাত, পা, ঠোঁট কাটা হয়।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

সাধারণ জনগোষ্ঠী আদিমকাল থেকেই নিজ জীবন যাপনকে সহজসাধ্য করতে নানা প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। চারপাশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে জীবনের প্রয়োজনে। কৃষিজীবী, মৎসজীবী, তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণি পেশার মানুষ, লাঙল, জাল, তাঁত, ঢেঁকি প্রভৃতি তৈরি করেছে। মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে নদীর পাশাপাশি প্রচুর খাল, বিল ও পুকুর ছিল। ফলে এখানে নানা ধরণের নৌ-যানের ব্যবহার রয়েছে। সে সূত্রে নৌকাসমূহ নির্মিত হয়।

১. নৌশিল্প

নদীবিধৌত বাংলাদেশে নৌকার ব্যবহার অতি প্রাচীন। বিক্রমপুর প্রাচীনকাল থেকেই নদী-বিধৌত জনপদ। তাই প্রাচীনকাল থেকেই এই জনপদে নৌ-শিল্প উৎকর্ষ লাভ করেছে। নৌকা তৈরির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায়, প্রথমে মানুষ গাছের গুঁড়ি, কাঠের ভেলায় নদী পারাপার করেছে। পরে কাঠের তৈরি 'ডিঙ্গি', 'ডোঙ্গা' ইত্যাদির সাহায্যে জলপথে চলাচল করেছে। ডিঙ্গি, ডোঙ্গা অস্ট্রিক শব্দ। সভ্যতা বিকাশের ধারায় উন্নত থেকে উন্নতমানের নৌকা তৈরি করে জলপথে যাতায়াতের পথ সুগম, সচ্ছল ও নিরাপদ করেছে। নৌকা মুন্সিগঞ্জের প্রায় সব এলাকায়ই তৈরি হয়; সাধারণত স্থানীয় কাঠমিস্ত্রিরা নৌকা তৈরি করে থাকে। এগুলো স্থানীয়ভাবেও 'ডিঙ্গি' বা 'কোষা' হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম নৌশিল্পে উন্নত ছিল, ইতিহাসে এমন নজির-ই পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন রায় রচিত 'ঢাকার ইতিহাস'

নৌকার প্রকারভেদ ও গঠন-প্রকৃতি (দেশীয় নৌকা)

www.pathagar.com

গ্রন্থে আছে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে ঢাকায় নৌশিল্পের সূচনা হয়েছিল। ৩২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি রাষ্ট্রের প্রান্তিক সীমার নিরাপত্তার স্বার্থে নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহর আমলে ঢাকার এগারসিন্ধু, ঘোড়াশাল, কর্তাভূ, খিজিরপুর, শ্রীপুর, ইদ্রাকপুর ও বারদী এলাকায় নৌঘাটি ছিল। মোঘল সৈন্যরা এখান থেকে রণতরীর সাহায্যে শত্রুর মোকাবেলা করত। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ধর্মযাজক ও পর্যটন সেবাস্টিন মানরিক তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে ঢাকার নৌশিল্প ও বিচিত্র নৌযানের বিবরণ দিয়েছেন।

মুন্সিগঞ্জের নিচু অঞ্চল বর্ষা ঋতুতে পানির নিচে ডুবে থাকে। ফলে তখন যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন হয় নৌকা। নৌকা ছাড়া বাড়ি হতে বের হওয়ার উপায় থাকে না। মাঠ-খেত সব পানিতে ডুবে যায়। দিন-মজুরেরা অনেকেই তখন নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ভাড়ায় চালিত এইসব নৌকা 'গুদাড়া' হিসেবে পরিচিত। মুন্সিগঞ্জের প্রতি বাড়িতেই নৌকা দেখা যায়। পূর্বে সম্ভ্রান্ত বাড়ি হিসেবে সেগুলোই গণ্য হতো যেসব বাড়িতে নৌকা ভেড়ার ঘাট থাকতো।

যাত্রীসহ খাল পাড়ি দিচ্ছে নৌকা

নির্মাণ কৌশল : নৌকা নির্মাণের কাঠ দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত হয়। স্থানীয় কাঠমিস্ত্রিগণ দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন নামের ও ছোট-বড় বিচিত্র আকারের নৌকা নির্মাণ করে। কাঠ হিসেবে শাল কাঠ, চাম্বল কাঠ ও লোহা কাঠ নৌকা তৈরির জন্য উত্তম। প্রথমে কাঠ প্রস্তুত করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। নৌকার কাঠ জোড়া দেওয়ার কৌশল অত্যন্ত অভিনব, যা প্রশংসার দাবিদার। দুই কাঠের মাঝে গাবের রস দিয়ে নিশ্ছিদ্র করা হয়, সহজে যাতে ভেতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। দীর্ঘদিন ধরে পানির সংস্রবে থাকায় পচন থেকেও নৌকাকে রক্ষা করে। বর্তমানে আলকাতরা দেওয়া হয় পচন ও ঝিনুক পোকার আক্রমণ থেকে নৌকাকে রক্ষা করার

www.pathagar.com

জন্য। বর্ষাশেষে নৌকা পানির নিচে ডুবিয়ে রাখা হয়। আবার বর্ষার শুরু হওয়ার পূর্বেই নৌকা পানির নিচ থেকে তুলে পরিষ্কার করে আলকাতরা দিয়ে রোদে শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করতে হয়। ব্যবহারভেদে নৌকাগুলির গঠন-প্রকৃতিতে নৌশিল্পীর নান্দনিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষ করে, মনুষ্যবাহী শৌখিন নৌকা দারুশিল্পের উত্তম নিদর্শন রূপে পরিগণিত হতো। টিয়াঠুটি নৌকার সামনের মুখ টিয়ার ঠোঁটের মতো, ময়ূরপঙ্খি নৌকার মুখ ময়ূরের মতো, মকরমুখী নৌকার মুখ মকরের মতো। এছাড়াও নৌকার গায়ে নানা ডিজাইন আঁকা হয়। মানুষ, পাখি, ফুল চিত্রিত পিতলের ফলক নৌকার গায়ে এঁটে শোভাবর্ধন করে। বজরা নামের শৌখিন নৌকার উপরের ছই ফুল ফল লতাপাতার ডিজাইন দ্বারা চিত্রশোভিত করা হয়। তবে এখন কদাচিত এরূপ নৌকা দেখা যায়। ইঞ্জিনচালিত লঞ্চ, স্পিডবোট, ফেরিবোট ইত্যাদির প্রভাবে নৌকার ব্যবহার দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে।

ডিঙ্গি : আকৃতি ও ব্যবহারে দিক দিয়ে নৌকা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথমে মুন্সিগঞ্জে বহুল প্রচলিত হলো ডিঙ্গি নৌকা। এক ধরনের ছোট সুপরিচিত নৌকার নাম ডিঙ্গি। যেহেতু মুন্সিগঞ্জে প্রচুর খাল-বিল রয়েছে তাই ডিঙ্গি নৌকা এধরণের পরিবেশের জন্য বেশ উপযোগী। এর বহনক্ষমতা কম, মাত্র তিন-চার জন লোক এ নৌকায় চড়তে পারে। ছোটো বলে তা চালানো সহজ হয়। একজন লোক একখানা বৈঠা দিয়ে তা চালাতে পারে। এ নৌকায় সাধারণত ছই দেওয়া হয় না। অধিকাংশ কৃষক পরিবারে ডিঙ্গি নৌকা থাকে। গ্রামে-গঞ্জে যাতায়াত, খাল-বিলে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে তা ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ খেয়াঘাটে ডিঙ্গি নৌকার প্রচলন আছে।

বাচাড়ি : বাচাড়ি নৌকা আকারে ডিঙ্গির চেয়ে কিছু বড় হয়। এর আয়তন তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত এবং খোল গভীর হয়ে থাকে, কারণ এতে প্রধানত মালামাল বহন করা হয়। তবে জেলেরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যেও তা ব্যবহার করে থাকে। কোনো কোনো নৌকার পেছনে ছোটো আকারে ছই থাকে। ডিঙ্গির মতো এ নৌকাতেও হাল থাকে না। মাঝি পেছনে বসে বৈঠা ধরে নৌকা চালায় ও এর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। মাল্লারা গলুইতে বসে বৈঠা টানে। নৌকায় মাস্তুলের ব্যবস্থা আছে; প্রয়োজনে পালও ব্যবহার করা হয়।

২. গৃহসামগ্রী

ঢেঁকি: বিক্রমপুরে পূর্বে ঢেকিঁর খুব প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা অনেক কম দেখা যায়। তবুও কিছু বাড়িতে ঢেঁকি এখনও দেখা যায়। ধান-চাল কুটতে ঢেঁকির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিক্রমপুরে সাধারণত বাড়ির পেছনের দিকে ঢেঁকিঘর থাকতো। শীতের শুরুতে বাড়ির মেয়ে-বৌয়েরা ঢেঁকিতে চাল কুটে পিঠার আয়োজন করতো।

যাঁতা : গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে যাঁতা আর একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার, যা শস্যদানা ভেঙে অথবা গুঁড়া করে ডাল, আটা, ছাতু ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পেষণের কাজে এরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রায় তিন হাত ব্যাসার্ধের সমান দুটি পুরু ও ভারি গোলাকার প্রস্তর খণ্ড এর প্রধান উপকরণ। খণ্ড দুটি একটি মাটির কাঠামোর উপর বসানো হয়। মাটির কাঠামোটি অধিকতর প্রশস্ত ও গোলাকার; এর

www.pathagar.com

চারপাশে কিছুটা ফাঁকা রেখে কানা উঁচু করা হয়। যাঁতা ঘোরানোর সময় শস্যদানা চারদিক থেকে বেরিয়ে এই ফাঁকা স্থানে জমা হয়। কাঠামোর ঠিক মাঝখানে একটি শক্ত খুঁটি পোঁতা থাকে; প্রস্তর খণ্ড দুটির মধ্যভাগ গোল ছিদ্র করে এই খুঁটির ভিতর দিয়ে বসানো হয়। উপরের খণ্ডে বৃত্তের প্রান্তভাগে একটা ছোট ছিদ্র থাকে।

যাঁতা

এতে কাঠের একটা সরু কিলক বা মুঠা সংযুক্ত করে তা এক হাতে ধরে ঘুরানো হয়। মুঠার বিপরীত দিকে ঈষৎ বক্র অপর একটি ছিদ্র থাকে; যাঁতা ঘুরাবার সময় মুঠ মুঠ করে শস্যদানা এই ছিদ্রপথে দিলে তা গড়িয়ে যাঁতার ভিতরে যায়। টুলের মতো দু'পাশে দুটি মাটির তৈরি ঢিবি বসানো হয়। এর উপরে একজনে অথবা মুখোমুখি দু'জনে বসে যাঁতা ঘুরিয়ে পেষণের কাজ করে থাকে। ঘর্ষণের ফলে পাথর দুটি ভোঁতা হয়ে গেলে শিল-নোড়ার মতো ধার দিয়ে নিতে হয়। আটা গুঁড়ি করার জন্য মাটির কাঠামো আবশ্যক হয়, কিন্তু ডাল ভাঙার জন্য কাঠামো না হলেও চলে। উঠানে বা বারান্দায় চটের উপর যাঁতা পেতে মুগ, মুসরি, ছোলা ভেঙে ডাল তৈরি করা যায়। এ ধরনের যাঁতা আকারে ছোট ও স্থানান্তরযোগ্য হয়। সাধারণত ঢেঁকিঘরে ঢেঁকি ও যাঁতা বসানো হয়। ঢেঁকিঘর না থাকলে বাড়ির বারান্দার এক পাশে যাঁতা বসানো হয়। দেশজ এ প্রযুক্তি কমবেশি বিশ্বের বহু দেশেই প্রচলিত আছে। ধানকলের মতো আটাকল আমদানির আগে যাঁতার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আটাকল চালু হলে এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পায়। তবে যেখানে আটাকল যায় নি, সেখানে যাঁতার ব্যবহার আগের মতোই বিদ্যমান আছে। লোকে স্থানীয় হাট-বাজার ও মেলা থেকে যাঁতা, পাটা ক্রয় করে থাকে। টেকসই হওয়ায় তারা এগুলি কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবহার করতে পারে।

৩. ছাইন্দা জাল

এই জালের জন্য ২৫/৩০ হাত লম্বা নৌকার প্রয়োজন হয়। ১০০০/১২০০ হাত লম্বা এবং ৮/১০ হাত প্রস্থের জাল মোটা কাছির সঙ্গে বেঁধে নদীতে ফেলা হয়। কাছি ভাসিয়ে রাখার জন্য ২/৩ হাত পর পর মোটা শোলা বেঁধে দেওয়া হয়। জালের নিচে মাটির গোলাকৃতি ভার বেঁধে দেওয়া হয়। নদীর অনেক জায়গা জুড়ে এই জাল পাতা

www.pathagar.com

হয় বলে একে বেড় জাল, অঞ্চল বিশেষে জগৎ বেড় জাল বলা হয়। এই জালের পাহিলে (ফাঁক) অনেক সময় ৪/৫ কাহন পর্যন্ত ইলিশ আটকা পড়ে। জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ইলিশ গণনার হিসাব নিম্নরূপ:

৪ টায় ১ গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় ১ পণ এবং ৮০ পণে ১ কাহন হয়। ইলিশ ধরার জালের পাহিল সাধারণত ৪/৫ আঙ্গুল ফাঁক করে বুনন করা হয়। ছাইন্দা জালের মাছ ধরা ও নৌকা চালানোর জন্য ৮/১০ জন মাঝির প্রয়োজন হয়। মাঝিরা দিনের পর দিন নৌকায় রাঁধে, নৌকায় খায় ও নৌকায় রাত্রিযাপন করে।

৪. হাইংলা জাল

এই জালে মাছ ধরার জন্য ৯/১০ হাত লম্বা নৌকা এবং ৩ জন মাঝি লাগে। বনবাঁশ দিয়ে ১৬ হাত লম্বা ধনুকাকৃতি ২টি হলি (শলাকা) তৈরি করা হয়। অঞ্চল বিশেষে অনেকে হলিকে টইন্যা বলে। নিচের হলির সাথে ৪/৫ সের ওজনের পাথর বেঁধে দেওয়া হয়। উপরের হলির সাথে কাছি উঠানামার জন্য পেয়ারা অথবা তেতুল গাছের ইংরেজি 'ভি' আকৃতি ডালা কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। একে ঘোড়া বলে। নদীর তলদেশের গভীরতা অনুসারে এ জালের কাছির দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়। সচরাচর ৩০/৪০ হাত লম্বা কাছি লাগে। কখনও কখনও ৭০/৮০ হাত লম্বা কাছির দরকার হয়। নদীর তলদেশের মাটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত জালশুদ্ধ হলির কাছি ছেড়ে দিতে হয়। জালের তিন কোণায় গুণ দিয়ে খুঁটনি বাঁধা হয়। খুঁটনি ও কাছির দৈর্ঘ্য একই রকম। খুঁটনির দ্বারাই জালে মাছ পড়ল কি না তা নৌকায় বসে টের পাওয়া যায়। মূল কাছির সাথে ২ হলির মুখ খোলার জন্য ৩/৪ হাত লম্বা আলাদা একটি কাছি বাঁধা হয়। একে বলে ফান (ফাঁদ) কাছি। ফানকাছির সাথে লম্বা মূল কাছিটি বেঁধে দেওয়া হয় এবং বেতের গোলাকৃতি আংটা শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। যেন ২ হলির মুখের ফাঁক সমানভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আংটাটি সবসময় ঘোড়ার সাথে আটকে থাকে। ৩ জন মাঝির মধ্যে ১ জন খুটনি ধরে, ১ জন পিছনের গলুইতে বসে স্রোতের অনুকূলে বৈঠা টেনে জালশুদ্ধ নৌকা চালনা করে। অপরজন বিশ্রাম নেয়। খুটনি ধরার লোককে বলা হয় খুটনিওয়ালা, পেছনের গলুইতে বসে বৈঠা টানার লোককে বলা হয় প্যালাওয়ালা। এই জালে একসাথে ২/৩ টির বেশি মাছ আটকা পড়ে না। হাইংলা জালের মাঝ ধরা সম্পর্কে একটি পদ্য এই রকম :

ইলশা মাছে মারে ঠেলা
চমকে উঠে খুটনি অলা
জাইত্যা টানে পাছের প্যলা।

খুটনিতে মাছের টের পাওয়ার সাথে সাথেই খুটনি ছেড়ে দিয়ে অতি দ্রুত কাছি টান দিয়ে হলির ২ মুখ আটকে দেওয়া হয়। ফলে ইলিশ আর বের হওয়ার সুযোগ পায় না। হাইংলা জাল মূলত নদীর গভীর তলদেশে চলাচলকারী ইলিশ ধরার জাল।

www.pathagar.com

৫. খইরকা

খইরকা জালের উপকরণ হাইংলা জালের মতোই। পার্থক্য এই যে, এই জালে ফান কাছি, লম্বা কাছি বা খুটনির কোনোটারই দরকার হয় না। ২ হলির মুখ খুলে রাখার জন্য ৪/৫ হাত লম্বা ১টি বাঁশ ব্যবহার করা হয়। খইরকা জালে নদীর উপরিভাগ দিয়ে চলাচলকারী ভাসমান ইলিশ ধরা হয়। নৌকার আগায় দাঁড়িয়ে হলিশুদ্ধ জাল নদীতে ফেলে বাঁশ দিয়ে ২ হলির মুখ খুলে রাখা হয়। এখানে বাঁশটি লম্বা কাছি ও ফান কাছির কাজ করে। জালের একটি অংশ হাতে ধরা থাকে। উহাই খুটনির কাজ করে। ভাসমান ইলিশ জালে ঢুকলে খুটনি ছেড়ে দিয়ে অতি দ্রুত বাঁশ টেনে হলির ২ মুখ বন্ধ করে মাছ আটকাতে হয়। তারপর জাল থেকে মাছ তুলে সাথে সাথে এক হাত পরিমাণ লম্বা মুগুর দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাছটি মেরে ফেলতে হয়। মাছের লাফালাফির শব্দে নদীতে ভাসমান ইলিশ যেন টের না পায়। খইরকা জালের হলি হাইংলা জালের চেয়ে লম্বায় ২/৩ হাত বড় রাখা হয়। এই জালে মাছ ধরতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। মাছেরা কোনভাবেই টের না পায় যে এখানে খইরকা জাল পাতা আছে। পদ্মা তীরবর্তী এলাকায় এই তিন শ্রেণীর জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পর্কে ইলিশ মাছেদের দুঃখ বেদনাসূচক একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :

ছাইন্দায় মারে বাইন্দা
কাছি আমার ভাই
হাইংলার ফান্দে আটকা পড়লে
আর রক্ষা নাই।
খইরকা হালায় পিডাইয়া মারে
মনে ব্যাথা পাই।

এই অঞ্চলে ইলিশ মাছ সম্পর্কিত একটি লোকগল্প শোনা যায়: ভগবান যখন সৃষ্টির নেশায় পাগল ছিলেন তখন তিনি সৃষ্টি করলেন ইলিশ মাছ। সৃষ্টির পর মনের সন্তুষ্টি থেকে দেবতাদের ডেকে বললেন, 'খেয়ে দেখ কি জিনিস তৈরি করেছি।'

দেবতারা খেয়ে বললেন, 'ভগবান সাংঘাতিক এক বস্তু তৈরি করেছেন।'

ভগবান বললেন, 'কি রকম?'

দেবতারা বললেন, 'এ বস্তু এতো সুস্বাদু যে, মানুষে খেলে আপনার নাম ভুলে যাবে। আপনাকে জপ না করে তারা ইলিশ ইলিশ জপ করবে।'

ভগবান বললেন, 'তাই না-কি!'

তিনি তখন ইলিশ মাছে কাঁটা দিয়ে দিলেন। ইলিশের কাঁটা গলায় ফুঁটলে পদ্মা পাড়ের মানুষ ভগবানের নাম স্মরণ করে।

তথ্য দাতা : মো. মুছা, পিতা- মহব্বত আলী মুন্সী, বয়স- ৮০, গ্রাম- কলমা, উপজেলা- লৌহজং।

৬. পলো/পলই

বিক্রমপুরে পলই-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। পলো বা পলই হলো খাঁচা জাতীয় এক প্রকার যন্ত্র। পলো দিয়ে মুরগি আটকে রাখা হয়। অনেক সময় মুরগি বাচ্চা দিলে

www.pathagar.com

তা যেন চিলে বা কাকে নিয়ে যেতে না পারে তার কারণে পলো দিয়ে আটকে রাখা হয়। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পরিবারে পলোর বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। পলো দিয়ে মাছ ধরা যায় আবার লাউ, শিম, কুমড়া প্রভৃতির বীজ বপন করে পলো দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, মুরগি বা অন্যান্য গৃহপালিত পশু-পাখির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আঞ্চলিক উচ্চারণে তা পোলো, পলুই ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এর উপরের দিকটা গোলাকার, সরু মুখ; নিচের দিকটা ক্রমশ স্ফীত হয়ে গোলাকার চাকতির আকার ধারণ করে। মুখ ও তলা উভয় অংশ খোলা থাকে। পলই তৈরি করার উপকরণ বাঁশের সরু কাঠি, পাতলা চটা, বেত, দড়ি বা তার। এটি নির্মাণ করতে দা, ছুরি ইত্যাদি হাতিয়ার লাগে। প্রথমে দা দিয়ে পলোর উচ্চতা অনুযায়ী বাঁশ কেটে ফালি ফালি করা হয়। ফালিগুলি চিরে সরু কাঠি বানানো হয়। এগুলি ছুরি দিয়ে চেঁছে গোড়া চ্যাপ্টা, আর আগা গোল করা হয়। পলোর দেহের বিভিন্ন স্থানে বেড় অনুযায়ী মোটা কাঠি দিয়ে ৭-৮টি চাকা তৈরি করা হয়। 'চটা' নামে নিচের চাকার পরিধি বেশি, উপরের চাকার পরিধি ক্রমশ ছোটো হয়; গলার পরিধি সবচেয়ে ছোটো। চাকাগুলি পলোর কাঠির সাথে দড়ি বা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এর মুখের কাঠিগুলি আগা সমান করে কেটে বেত, চামড়া বা সাইকেলের টায়ার দিয়ে মুড়িয়ে বাঁধা হয়, এতে পলো মজবুত ও ধরতে আরামদায়ক হয়। ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা বাণিজ্যিকভাবে পলো তৈরি করে। তবে বর্তমানে গরিব হিন্দু ও মুসলমানরাও পলো তৈরি করে। খাল-বিল, ডোবা-নালা, পুকুর-দিঘির আশেপাশের প্রায় প্রতিটি পরিবারে পলো আছে। পেশাজীবী জেলেরাও পলো তৈরি ও ব্যবহার করে। সাধারণত কোমর অপেক্ষা কম পানিতে পলোর মুখ এক বা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে মাছ শিকার করা হয়। মাছ চাপা পড়লে শিকারী টের পায় এবং মুখ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তা ধরে বের করে আনে। এতে প্রধানত রুই, কাতলা, শোল, বোয়াল, কই, শিং প্রভৃতি ছোটো ও মাঝারি সাইজের মাছ ধরা হয়। মাছ ধরা ছাড়াও গৃহস্থ ঘরে হাঁস-মুরগি ঢেকে রাখার কাজেও পলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

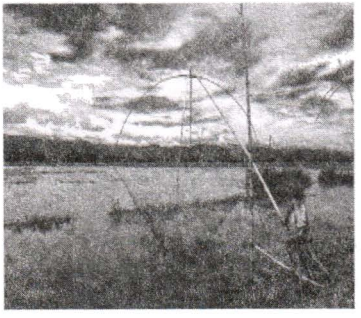

ধর্মজাল

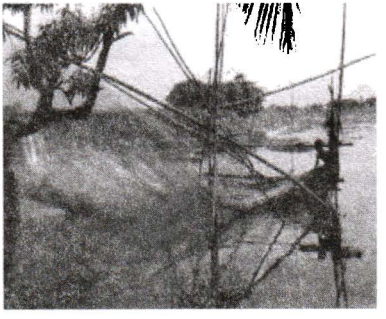

ভেসাল

www.pathagar.com

৭. ভেসাল বা ধর্মজাল

ভেসাল বা ধর্মজালের গঠন-প্রকৃতি কিছুটা ছাতার মতো। ডিজাইন অনুযায়ী জাল বুনে চারটি বংশখণ্ডের অগ্রভাগে বেঁধে দেওয়া হয়। বংশখণ্ড চতুষ্টয়ের উপরিভাগ টেনে একত্রে বাঁধা হয়; মাঝখানের ফাঁকা অংশ ছাতার শলাকার মতো ফাঁপা থাকে। তারপর অগ্রভাগের ভিতর দিয়ে অপর একটি লম্বা বংশদণ্ড বেঁধে ধর্মজাল তৈরি সম্পন্ন হয়। নদী বা জলাশয়ের ধারে একটি লম্বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে ধর্মজাল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মৎস্য শিকারী ডাঙায় থেকে জালের সাথে বাঁধা বংশদণ্ডের সাহায্যে জাল ওঠা-নামা করে মাছ ধরে থাকে। সাধারণত জাল পানিতে ডুবিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। এতে ছোটোখাটো মাছ ধরা পড়ে।

www.pathagar.com

লোকভাষা

লোকভাষা সাধারণত কোনও ভাষার উপভাষাকে বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে উপভাষা বলা হয়, তাকে লোকসংস্কৃতির পরভিাষায় বলা হয় লোকভাষা ।

বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার লোকভাষায় দুইটি উপভাষা রীতি প্রচলিত রয়েছে। ১. ত্রিপুরা বা কুমিল্লারউপভাষাও ২. ঢাকাই উপভাষা। এ দু'টি ভাষার ব্যবহারিক অঞ্চলকে আলোচনার সুবিধার জন্য দু'টি ভৌগোলিক অবস্থানে বিচার করা যায়। ক. চরাঞ্চল ও গজারিয়া এবং খ. মূলভূমি।

গজারিয়া উপজেলা এবং মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরকেওয়ার, আধারা, শিলই, মোল্লাকান্দি ও বাংলাবাজার এই পাঁচটি ইউনিয়ন ভাষাগত দিক থেকে মুন্সীগঞ্জ জেলার মূলভূখন্ড থেকে পৃথক। গজারিয়া কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ছিল বলে তা ত্রিপুরা অঞ্চলের উপভাষা দ্বারা প্রভাবিত ।মেঘনা নদীর উত্তর-পূর্ব পাড়ের গজারিয়ার ভাষারূপ দ্বারা নদীর অপর পারের পূর্ব উল্লিখিত চরাঞ্চলের পাঁচটি ইউনিয়নের অধিবাসীদের মুখের ভাষাও প্রভাবিত। এই উপভাষার কিছু উদাহরণ:

১. অয়কি অর লগে ফারব?

২. বাজানে দোহানে গেছে।

৩. অরে এমনে মারণ চাইব না, অরে মারণ চাইব কল-কৌশলে।

৪. মামুর ফুতেরে কাইট্যা ফালামু।

৫. হমন্দিরে কাউলকা পাইলে ছেইছ্যা ফালামু।

৬. চালাক কইর‍্যা আয়।

৭. বেলেকতারি লাগে শরীলডা।

৮. আইছনি পুতেরা, চৌরারা যে মাইরা গেলো দেখলা না?

৯. কিরে, বাজারে যাবি? না, অনে ফারতাম না।

১০. হালারপুত, তরে উষ্ঠা দিয়া হালাইয়া দিমু।

বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর, লৌহজং, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ি এবং সদর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, পঞ্চসার ইউনিয়ন, রামপাল ইউনিয়ন, বজ্রযোগিনী ইউনিয়ন, মিরকাদিম পৌরসভা এবং মহাকালী ইউনিয়ন ঢাকাই উপভাষা দ্বারা প্রভাবিত। এই উপভাষার কিছু উদাহরণ:

১. আমি তর লগে যামু না, ভাতও খামু না।

২. অই, সইর‍্যা যা, আমি কিন্তুক তর মায়েরে কইয়্যা দিমু।

৩. মাওইমা, তোমার পুতে না হাডত গেছে, আহে নাই।

৪. আমি তেনারে পুতির মালা আনতে কইছিলাম।

www.pathagar.com

৫. তুমি যদি আমারে বালনাবাস আমি তোমারে বালবাসুম কেমুনে?

৬. তুমি তুমার মাইয়ারে হামলাইয়া রাখ, আমি আমার পুতেরে লইয়্যা সইর‍্যা যাই।

৭. কিগো বাউজ, তুমার বইনে না ডাগর অইছে, আমার লগে বিয়া দিবা?

৮. হাউরিরে কইলাম, হালিরে আমার বাইয়ের লগে বিয়া দিতে।

৯. হাউরি কইল, না-গো জামাই, বাইয়ে বাইয়ে বায়রা বইনে বইনে জাল আর অইতে দিমু না।

১০. খাল-বিল বানে বাইস্যা গেল, খেতের ধান পানির তল অইল, এহন বাইচ্যা থাহুম কেমুনে?

প্রকৃতপক্ষে মুন্সীগঞ্জের লোকভাষা মিশ্র এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, উত্তরে ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা এবং পশ্চিমে কালিগঙ্গা এবং আরিয়াল বিল এ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারণে এখানে পৃথক একটি উপভাষা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং পেশাগত প্রয়োজনে অন্যান্য উপভাষা অঞ্চলে এখানকার অধিবাসীদের গমন এবং অন্য উপভাষা অঞ্চলের লোকদের আগমন এবং বসবাসের কারণে ভাষাগত আদান-প্রদান ও ভাষারীতির গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে আজ হয়ে উঠেছে মিশ্র ভাষা। মুন্সিগঞ্জ জেলার লোকভাষা হিসেবে ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও প্রয়োগের উদাহরণ:

পাখাল– পতিত।

বাতা– কিনারা।

বাঐল– মোড় বা মোচড়।

লোন্তা– লোণা।

লোট– যাতে ধানভানা হয়।

চিকনাই– মোতরা নির্মিত চাটাই।

বাঁশি– অপরিচিত ব্যাক্তিকে সম্বোধন। যেমন: বাঁশিরে, আমারে একটু পার করবি?

ছেমড়ি বা ছেড়ি– বালিকা।

কাইলা করা– আকাশে কালো মেঘ সাজা। যেমন : কাইলা করছে রে
উঠানেতে ধান,
ছেমড়ি গেছে বাপের বাড়ি
চুলে ধইর‍্যা আন।

বাওয়ার– বাদাম বা পাল।

কাতলা– ঢেকি চালনার খুঁটি।

কান্তি– খুঁটির উপরিভাগের কাটা স্থান।

আইলান– ঢেঁকি দ্বারা ধান ভানার সময় ধান উলট-পালট করে দেওয়া।

কাঁড়ান– চাল হতে কুঁড়া ছাড়ানো।

খোজ দেওয়া– নৌকা মেরামত করা।

গুয়া- সুপারি।

www.pathagar.com

গইন– গভীর।
তেনা– নেকড়া।
চুন্নী– যে স্ত্রীলোক চুরি করে। যেমন : চুন্নী মাগীর বড় গলা,
আর খায় সে দুধ কলা।
কুত্তা– কুকুর।
চিমটি– কৃশ। যেমন :খায় লয় চিমটি,
নাম পড়ে ডুমকি।
লাড়েচাড়ে– নাড়েচাড়ে। যেমন:হগল হতিনে লাড়েচাড়ে
বইন হতিনে পুইর‍্যা মারে।
লাই– প্রশ্রয় দেওয়া। যেমন : লাই কুত্তার পাতে ভাত।
হেচুর– বসে বসে চলা। যেমন:ভাত বলে মোরে খা,
হেচুর পাইর‍্যা ঘরে যা।
হুইয়া– শোয়া। যেমন: নায় আটে না,
হুইয়া যায়।
আলগোছ– আলগা।
খ্যার– খর। যেমন :খ্যারের কুটায় আগুন দিয়া
পেতনি বইল আলগোছ হৈয়া।
হগল– সকল।
মাইপা– মাপিয়া।
কইচিলি– বলেছিলি। যেমন: বিয়ার রাইতে কইচিলি কতা।
লগ্যি– চিকন বাঁশের নৌকা ঠেলার যন্ত্র।
হরমাইল– পাঠখড়ি।
ঊনান– শোষণ। যেমন : ঘি খায় ঊনায়,
ফেন খায় ফোফায়।
বেলেহাজ– লজ্জাহীন।
লেঙ্গুর– লেজ।
বেবাইজ্জ্যা– অসভ্য।
কুতকুতান– মিটি মিটি তাকানো।
ছালন্– ব্যঞ্জন। যেমন : ভাত নাই ঘরে
ছালন ছালন করে।
গোজা– প্রবেশ করানো।
ফাল– লাফ দেওয়া।
বাইচা– জলজ ঘাস।
গাব্বর– অপরিস্কার।
থাপ্পর– চপেটাঘাত।
বাইন্যা– বণিক।
ধ্ইন্যা– ধনে।

www.pathagar.com

হরি– শাশুড়ি। যেমন : বাইন্যার ঘরে ধইন্যা চুরি,
চাইয়া দেহে জামাই-হরি।
বেনুন– ব্যঞ্জন।
হাচাই– সত্যই।
কাইয়্যায়– অধুনালুপ্ত ধনাঢ্য বাবসায়ী সম্প্রদায়
খানকি– বেশ্যা।
ভাউর‍্যা– বেশ্যা বশীভূত পুরুষ। যেমন : কাইয়্যায়নাচে পাইয়া,
ভাউর‍্যা নাচে শতকে দশ
খানকি নাচে ফচরফচ।
মাইগ্যা– মাগিয়া বা চেয়ে-চিন্তে।
থোকর– কিছুই নয়। যেমন:মাকড় মারলে থোকর হয়।
খওয়া– খসে যাওয়া।
খেন– খান। যেমন : এক খেন বাতাসা।
টইয়া টইয়া– ছোট ছোট।
টোঙ্গর– যে একের কথা অন্যের কাছে বলে।
ভাতার– স্বামী।
মাগ– স্ত্রী।

তথ্যসূত্র : ১. বিক্রমপুর (সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা)– শ্রী যোগেন্দ্রনাথ-গুপ্ত সম্পাদিত, তৃতীয় বর্ষ- ১৩২২
২. আঞ্চলিক উপভাষা : মুন্সীগঞ্জ– কাজী মহম্মদ আশরাফ, ২০১৩

www.pathagar.com

ক্ষেত্র সমীক্ষায় তথ্যদাতার তালিকা

মনোয়ার মাহবুব, বিক্রমপুর, গবেষক
বয়স : ৭৫, গ্রাম- কনকসার, লৌহজং

আবদুস সালাম, সাবেক চেয়ারম্যান, রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স : ৭০

নাম: রণজিৎ রায় কর্মকার, পিতার নাম: গোপী কর্মকার
গ্রাম: কামারখাড়া, পো : কামারখাড়া
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: হাশেম মৃধা, পিতার নাম: আলী হোসেন মৃধা
গ্রাম: বায়হাল, পো. : বাঘিয়া
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম : ইদ্রিস আলী, পিতা : নূর আলী (মৃত)
গ্রাম : কামারখাড়া, পো.: কামারখাড়া
উপজেলা : টংগিবাড়ি, জেলা : মুন্সিগঞ্জ,
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, পেশা : কৃষি

নাম : আমির আলী, পিতা : মন্ডল আলী
গ্রাম : পয়সাগাঁও, পো. : কামারখাড়া
উপজেলা : টংগিবাড়ি, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : মিস্ত্রি
বয়স : ৪৬ বছর

নাম : আক্কাস মিয়া, পিতা : ফজল ঢালী
গ্রাম : নোয়াদ্দা, পো. : নোয়াদ্দা
উপজেলা : মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষক, সবজি বিক্রেতা
বয়স : ৪১ বছর

নাম : চাঁন মিয়া, পিতা : লোকমান ঢালী
গ্রাম : বেহেরকান্দি, পো. : বেহেরকান্দি
উপজেলা : মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষক
বয়স : ৪১ বছর

নাম : খালেক শেখ, পিতা : আলী আকবর শেখ
গ্রাম : বেহেরকান্দি, পো. : বেহেরকান্দি
উপজেলা : মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসায়ী
বয়স : ৫৫ বছর

www.pathagar.com

নাম : আকতার হোসেন গাজী, পিতা : আলী হোসেন গাজী
গ্রাম : পুরা, পো : পুরা, উপজেলা : টংগিবাড়ি, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসায়ী
বয়স : ৫৫ বছর

নাম : চাঁন মিয়া, পিতা : লোকমান ঢালী
গ্রাম : বেহেরকান্দি, পো. : বেহেরকান্দি
উপজেলা : মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষক
বয়স : ৪১ বছর

নাম: হাসি ঘোষ, পিতার নাম: খগেন পাল
গ্রাম: পুরা, পো : পুরা
থানা টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: মালা রানী মালো, পিতার নাম: জগদীশ মালো
গ্রাম: মাকহাটি, পো. : আলদী বাজার
থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: সাবিত্রী কর্মকার , পিতার নাম: বাসুদেব বর্মকার
গ্রাম: কলমা, পো. : পাঁচগাঁও
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: রিনা বণিক, পিতার নাম: গোবিন্দ বণিক
গ্রাম: বাঘিয়া, পো. : বাঘিয়া
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: অভীক, পিতার নাম: অসীম কুমার ঘোষ
গ্রাম: পুরা, পো. : পুরা
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: মৌসুমী রহমান, পিতার নাম: খলিলুর রহমান
গ্রাম: কালীবাড়ি, পো. : কালীবাড়ি
থানা: টংগিবাড়ি, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম: উম্মে কুলসুম, পিতার নাম: আব্দুল গনি ঢালী
গ্রাম: বিয়ানীয়া, পো. : আলদী বাজার
থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

নাম : হাজী আলী আকবর, পিতা: শেখ আবদুল হামিদ
গ্রাম : চোরমর্দন, পো: রসুনিয়া
থানা : সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ ।

নাম : সুভাষচন্দ্র দাস
গ্রাম : চোরমর্দন, পো: রসুনিয়া
থানা : সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ ।

নাম : হারুনুর রশিদ
লাইব্রেরি কর্মী, সরকারি হরগঙ্গা কলেজ গ্রন্থাগার,মুন্সিগঞ্জ ।

নাম : মো. কামাল হোসেন
এম. এ শেষপর্ব, বাংলা
সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

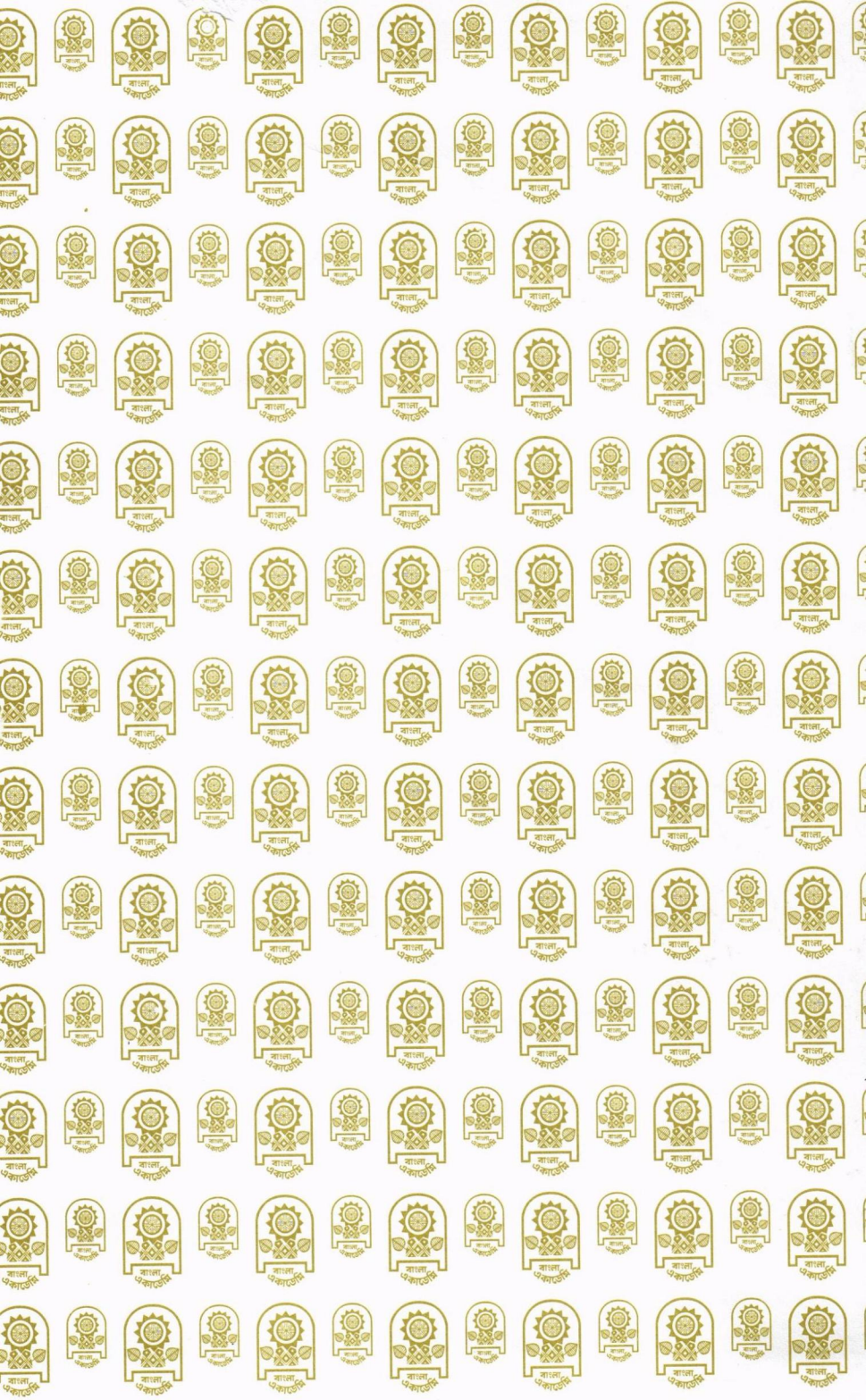
বাংলা একাডেমি